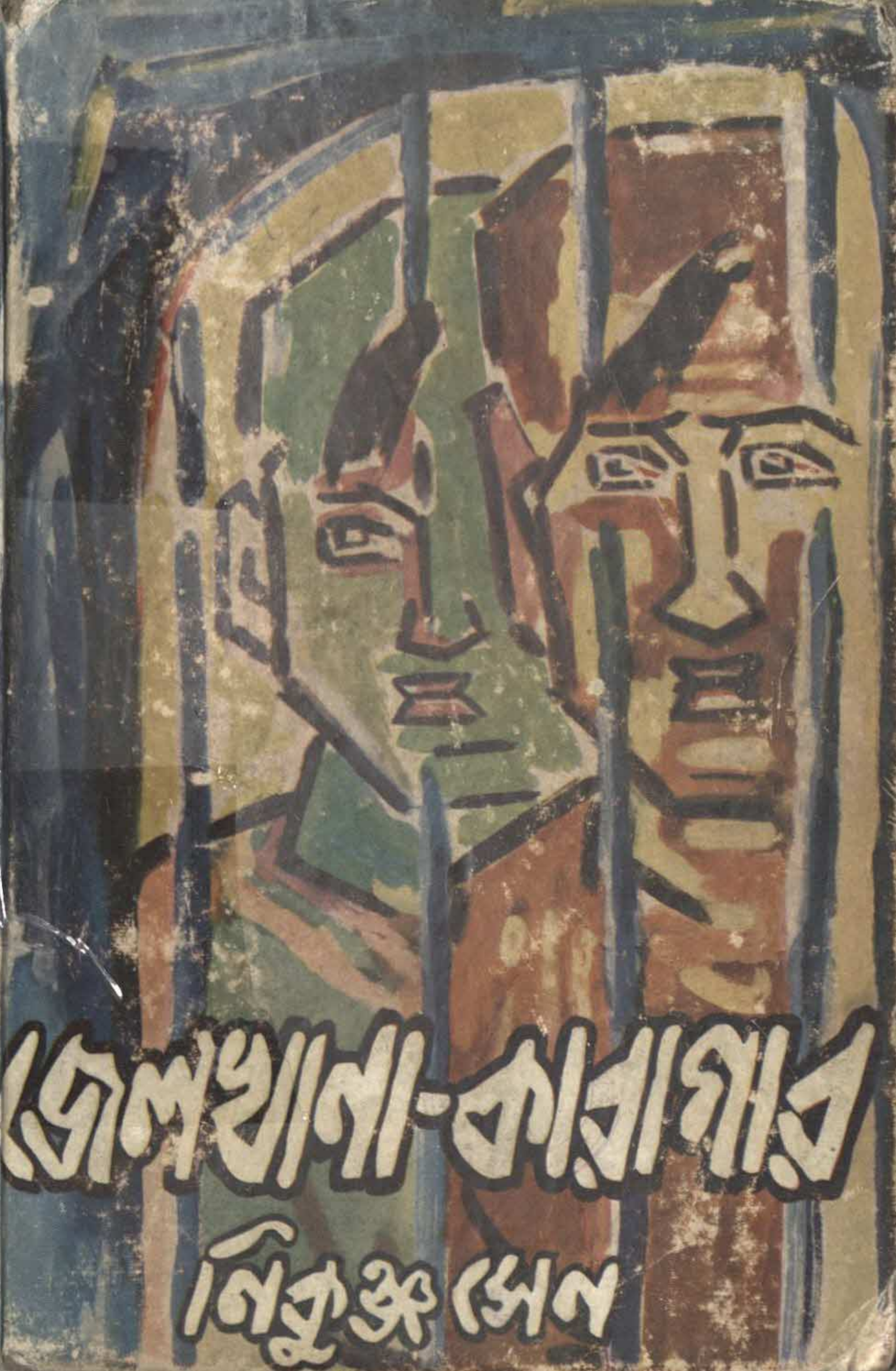

জেলখানা-কারাগার
নিকুঞ্জ সেন

জেলখানা ও কারাগার

চিত্তরঞ্জন ঘোষ

গণ দীপায়ন পাবলিশার্স

প্রথম মুদ্রণ : মাঘ ১৩৫৮

॥ প্রকাশক ॥
অনিলকুমার পাল
গণদীপায়ন
১৭০-এ, আপার সার্কুলার রোড
কলিকাতা—৪

॥ পরিবেশক ॥
এম. সি. সরকার এণ্ড সন্স লিঃ
১৪, কলেজ স্কোয়ার
কলিকাতা—১২

॥ প্রচ্ছদপট পরিকল্পনা ॥
শিল্পী সুনীলমাধব সেনগুপ্ত

॥ লিপিকার ॥
শান্তি রায়

॥ ব্লক ॥
রিপ্রডাক্সন্ সিণ্ডিকেট

॥ প্রচ্ছদমুদ্রক ॥
গসেন এণ্ড কোম্পানি
৭।১, গ্র্যাণ্ট লেন
কলিকাতা

॥ মুদ্রক ॥
পি. বি. টাট
এইচ. এস. প্রেস
বরাহনগর

॥ বাঁধাই ॥
দত্ত বাইণ্ডিং ওয়ার্কস
১০১, বৈঠকখানা রোড

দাম : তিন টাকা

দেশ সেবার মূল্য দিতে গিয়া বন্দিশালায় এবং
বন্দিশালার বাহিরে যে দেশ সেবকের
দল জীবন উৎসর্গ করিয়াছেন
তাঁহাদের উদ্দেশে।

লেখকের কথা

এই বইখানি লেখার প্রেরণা আসে আনন্দবাজার পত্রিকার সহযোগী সম্পাদক বন্ধুবর শ্রীঅমলেন্দু দাসগুপ্তের নিকট হইতে। অমলেন্দু বাবুর সঙ্গে একদিন দেউলী জেলের অতীত দিনগুলির কথা আলোচনা করিতে-ছিলাম, হঠাৎ তিনি বলিলেন, 'বক্‌সার কথা তো আমি কিছু লিখেছি, দেউলীর কথাগুলি আপনি লিখুন না কেন। এখন তো আপনি লেখা নিয়েই আছেন, অনায়াসেই লিখে ফেলতে পারেন।' আমি তখন 'মহাজাতি' পত্রিকা লইয়া ব্যস্ত। তাই অনায়াসে না লিখিতে পারিলেও আয়াসমত যে লিখিতে পারিতাম সে বিষয়ে সন্দেহ ছিল না। লিখিতে সুরু করিলাম। এ প্রসঙ্গে আর একটি বন্ধুর কথা উল্লেখ না করিলে অন্যায় হইবে। তিনি 'মহাজাতি' পত্রিকার সহযোগী সম্পাদক শ্রীসত্যেন্দ্র সরকার। একথা বলিলে অত্যুক্তি হইবে না যে, তাঁহার তাগিদেই 'জেলখানা-কারাগার' নিয়মিত ভাবে 'মহাজাতি' পত্রিকায় প্রকাশিত হইতে সুরু করে।

কয়েক সপ্তাহের মধ্যেই মহাজাতির পাঠকবর্গের নিকট 'জেলখানা-কারাগার' প্রচুর সমাদর লাভ করে এবং পুস্তকাকারে ইহাকে প্রকাশ করিবার জন্য অসংখ্য অনুরোধ আসিতে থাকে। কবি-বন্ধু শ্রীঅজিত দত্ত, শ্রীযুক্তা অন্নপূর্ণা গোস্বামী, নয়াদিল্লীর শ্রীযুক্তা অমিয়া সেন ও শ্রীযুক্ত অমলেন্দু দাসগুপ্ত-ও এব্যাপারে আমাকে প্রচুর উৎসাহ দান করিয়াছেন।

এতদিন নানা কারণে পুস্তকাকারে ইহাকে প্রকাশ করা সম্ভবপর হয় নাই। আজ 'গণদীপায়নের' চেষ্টায় ইহা প্রকাশিত হইল। রাজবন্দী ও সাধারণ কয়েদিদের মিলিত পদক্ষেপে দেউলীর যে দিনগুলি ব্যথা-বেদনায়, হাসি-উল্লাসে মুখর হইয়া উঠিয়াছিল তাহার আংশিক চিত্র পাঠক সমাজের সামনে তুলিয়া ধরিতে চাহিয়াছি; সে চিত্র কতটুকু সফল হইয়াছে পাঠকবর্গই সে বিচার করিবেন।

নিকুঞ্জ সেন

কলিকাতা
শ্রীপঞ্চমী : ১৩৫৮

হারাণ সাধারণ গৃহস্থ। ২৪ পরগণা জেলায় কি একটা গ্রামে ওর বাড়ী। গ্রামে কিছু খেত-খামার ছিল। চাষ-আবাদে যে সামান্য কিছু ফসল ফলিত তাহাতেই ওদের দিন কোন রকমে কাটিয়া যাইত। নির্ঝঞ্ঝাট, সাদাসিধা মানুষ। নিজের মধ্যেও যেমন কিছু ঘোরপ্যাঁচ নাই, অন্যের ঘোরপ্যাঁচও তেমন কিছু বোঝে না।

সেই হারাণকেও যখন দৈবদুর্ব্বিপাকে জেলে আসিতে হইল, মহামুস্কিলে পড়িয়া গেল সে। কারণ, তাহার যাহারা সাথী, তাহাদের কেউবা দাগী চোর, কেউবা নামজাদা ডাকাত, আর কেউবা খুনী। তাহাদের মধ্যে হারাণ, যেন জলের মাছ

ডাঙ্গায় আসিয়া ছিটকাইয়া পড়িয়াছে—কিছুই ওর ভাল লাগে না। ওর কিছু ভাল না লাগিলেও আমাদের কিন্তু ওকে খুবই ভাল লাগিত। জেলখানায় অমন মানুষ পাওয়া সত্যই দুর্লভ।

একদিন ভোরে উঠিয়া দেখি, রান্না ঘরের দাওয়ায় বসিয়া হারাণ কি যেন আকাশ-পাতাল ভাবিতেছে। জিজ্ঞাসা করিলাম,

'অত কি ভাবছ, হারাণ?'

—'না বাবু, ভাবব আর কি ভাবনার আর আছে কি, বলুন।'

বুঝিলাম, হারাণের মনটা আজ নেহাৎই খারাপ। কথার মোড় ঘুরাইয়া দেওয়ার উদ্দেশ্যে বলিলাম ঃ

'জেলখানা তোমার কেমন লাগে, হারাণ?'

উত্তর দিতে দেরি হইল না, চট্ করিয়া ও বলিল, 'জেলখানা কারাগার বাবু, জেলখানা কারাগার! জেলখানায় কি মানুষ থাকে!'

বলিলাম, 'কেন, আমরা কি কেউ মানুষ নই?' এবার সত্যই বিপদে পড়িল হারাণ। প্রকাণ্ড একহাত জিব বাহির করিয়া সে উত্তর করিল, 'ছিঃ, ওকথা বলবেন না বাবু, ওকথা শুনলেও যে পাপ হয়। আপনারা ত দেবতা।' বুঝিতে বিলম্ব হইল না যে, 'জেলখানা—কারাগার'! জেলখানায় মানুষ থাকে না! এখানে থাকে শুধু আমাদের মত 'দেবতা' আর হারাণদের মত 'মানুষ'!

হারাণ তো আমাদের দেবতা বানাইয়া ছাড়িল ; কিন্তু, সরকার যে আমাদের দেবতা মনে করিতেন না, সে কথা ঠিক। তাঁহারা ভাবিতেন, এ যুগে দানবকুলেরই সগোত্র আমরা !

১৯৩০-৩১ সালে বাংলাদেশের উপর বিপ্লবের যে তাণ্ডব নর্ত্তন সুরু হইয়াছিল তাহাতে সত্যই ইংরেজের মাথার ঠিক ছিল না। চট্টগ্রাম অস্ত্রাগার লুণ্ঠনের রাত্রিতে (১৯৩০ সালের ১৮ই এপ্রিল) নাকি ইংরেজ নরনারী প্রাণের ভয়ে এত ভীত হইয়াছিলেন যে, রাত্রির পোষাক পরিবর্তন করিবার সময় পর্য্যন্ত তাঁহারা পান নাই, কোনপ্রকারে ঘর হইতে বাহির হইয়া সহরের অধিকাংশ ইংরেজ নরনারী একটি ষ্টিমারে উঠিয়া কর্ণফুলি নদীর নিরাপদ ব্যবধানে গিয়া বিনিদ্ররজনী যাপন করিতে বাধ্য হইয়াছেন ! কলিকাতা রাইটার্স বিল্ডিং-এর বিখ্যাত 'বারান্দা-যুদ্ধের' সময় নাকি এক দুর্দ্ধর্ষ ইংরেজ-পুঙ্গব উপায়ান্তর না দেখিয়া ঘরের মধ্যে টেবিলের নীচে ঢুকিয়া একটি 'ওয়েষ্ট পেপার বাসকেট' মাথায় গলাইয়া বসিয়াছিলেন ! এমন আরো কত ঘটনা যে ঘটিয়াছিল তাহার অন্ত নাই।

তাহারই প্রতিক্রিয়ার ঢেউ আসিয়া লাগিল বাংলাদেশের রাজবন্দীদের উপর। ইংরেজ সরকার মনে করিল, জেলে থাকিলে কি হইবে, ইহারাই বাংলার এই সব বহ্নি-গর্ভ বিপ্লবায়োজনের জন্য দায়ী। ইংরেজের কোন স্বনামধন্য পত্রিকা তো চিঠিপত্রের স্তম্ভে খোলাখুলি লিখিতেই সুরু করিল, 'না না ইহাদের আবার বিচার আচার কি! ধর আর মার।'

সরকার ঠিক্ অতটা করিলেন না বটে, তবে বাংলার রাজবন্দীদের জন্য নির্ব্বাসন ব্যবস্থা একেবারে পাকা করিয়া ফেলিলেন। বাংলাদেশ হইতে বহুদূরে রাজপুতানার মরুভূমিতে প্রথম দফায় একশত রাজবন্দীদের জন্য বন্দীশালা প্রস্তুত হইয়া গেল। বাহিরের জগতের সঙ্গে যাহাতে কোন যোগাযোগ না থাকে সেই জন্য 'দেউলী' নামক গ্রামটি নির্ব্বাচিত হইল, কারণ দেউলীর ৬০ মাইলের মধ্যে কোন রেল ষ্টেশন ছিল না।

এই পরিকল্পনা অনুসারে ১৯৩২ সালের জুন মাসের মধ্যেই বাংলার বিভিন্ন জেল হইতে একশত রাজবন্দী দেউলীর মরুভূমিতে আসিয়া পৌঁছিল।

যেদিন বক্সা হইতে প্রেসিডেন্সি জেল হইয়া দেউলীর পথে যাত্রা করিলাম সেদিনটির কথা আজও মনে আছে। সে কি কড়াকড়ি! বদ্ধ 'প্রিজন্‌ভ্যান'-এ সশস্ত্র প্রহরীবেষ্টিত অবস্থায় হাওড়া ষ্টেশনে আসিলাম। ভাবিতেছিলাম, হাওড়া ষ্টেশনে ভ্যান হইতে নামিয়া কিছুটা হাঁটিয়া তবে ত গাড়ীতে উঠিতে হইবে। সেই সময়টুকুর মধ্যে কে জানে হয় তো বা কোন চেনা মুখ নজরে পড়িবে, হয় তো বা কোন ব্যাকুল আঁখি দুইটির সঙ্গে দৃষ্টি-বিনিময় হইবে।

কিন্তু মানুষ ভাবে এক, হয় আর। এক্ষেত্রেও তাহার ব্যত্যয় ঘটিল না। বাহিরের লোকজনের সঙ্গে বিন্দুমাত্র যোগাযোগ যাহাতে না ঘটিতে পারে তাহার জন্য সরকার এমন পাকা ব্যবস্থা করিলেন যে,

'প্রিজন্‌ভ্যান'-টিকে একেবারে লইয়া যাওয়া হইল ষ্টেশনের মধ্যে, আমাদের কামরার সামনে। নামিয়া দুই-পা গেলেই গাড়ী। সশস্ত্র পুলিশ এমন ভাবে ষ্টেশনটিকে ঘিরিয়া দাঁড়াইল যে, কাহার সাধ্য গাড়ীটির ত্রিসীমানায় আসে! গাড়ীতে ওঠামাত্র কামরাটিকে একটি ইঞ্জিন টানিয়া লইয়া গেল প্রায় মাইল দু'য়েক দূরে। সেখানে এক খোলামাঠে উহাকে রাখিয়া ইঞ্জিনটি ফিরিয়া আসিল এবং গাড়ী ছাড়িবার কয়েক মিনিট আগে আবার উহাকে গাড়ীর সঙ্গে যুক্ত করিয়া দেওয়া হইল। এমনি কড়াকড়ির বহর! বাঙালী শুধু বুঝিতে পারিল, বাঙালাদেশের একদল দামাল ছেলে ইংরেজদের হেফাজতে বাংলাদেশ ছাড়িয়া কোথায়, কতদিনের জন্য—না জানি চিরতরে নির্ব্বাসনে চলিল। কে গেল, কাহারা গেল, জানিতেও পারিল না। আবার আসিবে কি না, আবার ফিরিবে কি না, তাই বা কে জানে?

দুই রাত্রি এবং তিন দিন ক্রমাগত চলিয়া তিনদিনের দিন সন্ধ্যার পরে আমরা পৌঁছিলাম রাজপুতানার 'কোটা' নামক ষ্টেশনে। এখান হইতে ৭০ মাইল রাস্তা যাইতে হইবে মোটরে। তারপরে দেউলী জেল।

আজমীর-মাড়ওয়ার প্রদেশ হইতে দূরে রাজপুতানার এক জনমানবহীন অঞ্চলে এই দেউলী গ্রামটি। যাওয়ার পথ দুই দিক দিয়াই আছে। একটি নাসিরাবাদ হইয়া, অপরটি কোটা হইয়া। দুইটিই মোটরের পথ, দূরত্ব প্রায় সমানই।

কোটার পথটি প্রায় ৭০ মাইল, নাসিরাবাদেরটি ৬০ মাইল। বাংলাদেশের এই একশত বন্দীকে বাংলায় রাখিয়া ইংরেজ সরকার নিশ্চিন্ত থাকিতে পারিতেছিলেন না বলিয়াই এই ব্যবস্থা! তাঁহারা ঠিক করিলেন, শুধু দূরে নিয়া গেলেই চলিবে না; এমন জায়গায় নিতে হইবে যাহাতে শত চেষ্টা করিয়াও বাহিরের সঙ্গে যোগাযোগ স্থাপন এই সব রাজবন্দীরা না করিতে পারেন। তাই রেল ষ্টেশন হইতে ৬০।৭০ মাইল দূরে এই নির্ব্বাসন-তীর্থ রচিত হইল! মনে আছে কোটা হইতে দেউলী যাওয়ায় সময় উন্মুখ দৃষ্টিতে বাহিরের দিকে চাহিয়াছিলাম। ভাবিয়াছিলাম, কে জানে, এই হয় তো বাহিরের জগতের সঙ্গে শেষ দৃষ্টি-বিনিময়। ভাবিবার অবশ্য কারণও ছিল, কিন্তু সে কথা হইবে পরে। অন্ধকার রাত্রি। পিঁচঢালা রাস্তা দিয়া মোটর দ্রুতবেগে আগাইয়া চলিয়াছে। বাহিরের দিকে চাহিয়া আছি সত্য, কিন্তু মাঝে-মাঝে বিরাট দৈত্যের মত এক আধটা গাছ ছাড়া আর কিছুই দেখা যায় না। শুনিয়াছিলাম, কোটা হইতে বুঁদির কেল্লার মধ্য দিয়া আমাদের যাত্রাপথ। ছোটকালে ভূগোল পড়িতে পড়িতে যখন শুধু মুখস্থ করিয়াছি, "কোটা, বুঁদি, টঙ্ক"---তখন কে ভাবিয়াছিল এই ভাবে 'কোটা-বুঁদি'-র সঙ্গে আমাদের পরিচয় ঘটিবে। দেখিতে-দেখিতে কোটা সীমান্তে যখন আসিয়া পৌঁছিলাম গাড়ীটি ব্রেক কষিয়া অকস্মাৎ থামিয়া গেল। ব্যাপার কি জানিবার জন্য কৌতূহলে জানালা

দিয়া চাহিলাম, দেখিলাম বিরাট এক লোহার গেটের সামনে মোটরটি থামিয়াছে। ভিতর হইতে গেটটি বন্ধ। শুনিলাম বুঁদি ঢুকিবার ইহাই প্রবেশ পথ। অনেক ডাকাডাকি হাঁকাহাঁকির পর গেটটি খুলিল। সামনেই এক প্রহরী সেলাম ঠুকিয়া দাঁড়াইল। অনাবৃত দেহ, পরিধানে ময়লা একটি হাফপ্যান্ট, হাতে ছোট্ট একটি লাঠি। বুঁদির সিপাই। ভাবিলাম স্বাধীন দেশের সিপাই-ই বটে। মনটা একেবারে দমিয়া গেল। বুঁদি পৌঁছিবার পূর্ব্বে কল্পনায় যে বুঁদিকে দেখিতেছিলাম, তাহার সহিত বাস্তবের এই নেংটি-পরা সিপাইওয়ালা বুঁদির কত তফাৎ! বন্ধুবর সন্তোষ গঙ্গোপাধ্যায় পাশেই বসিয়াছিলেন, বলিয়া উঠিলেন—

"জলস্পর্শ ক'রব না আর—
চিতোর রাণার পণ—
বুঁদির কেল্লা মাটির পরে
থাক্‌বে যতক্ষণ।"

বলিয়াই হো-হো করিয়া হাসিয়া ফেলিলেন। প্রশ্ন করিলেন, "নিকুঞ্জবাবু, এই কি আসল বুঁদি না সেই নকল বুঁদিগড় ?" আমারও সেই প্রশ্ন। কিন্তু এই প্রশ্নের উত্তর দিবে কে ?

বহু দিন হইয়া গিয়াছে। এ সব কথা একরকম ভুলিয়াই গিয়াছি ; কিন্তু, বুঁদির সেই কেল্লা, আর কেল্লার সেই বেচারা সিপাইটিকে আজও ভুলিতে পারি নাই! দেউলী

জেলে পৌঁছিয়া দেখিলাম, আমার আগে যাঁহারা আসিয়াছেন তাঁহাদিগকেও ঐ বুঁদির কেল্লা পার হইয়া সেই সিপায়ের নিকট হইতে পরওয়ানা লইয়া তবে আসিতে হইয়াছে।

জেলখানা—কারাগার

দুই

দুপুর রাত্রে দেউলী পৌঁছিলাম। রাত্রি দুপুর হইলেও অসুবিধা বড় একটা হইল না। আগে যাঁহারা আসিয়াছেন তাঁহারা আমাদের অভ্যর্থনার জন্য প্রস্তুত হইয়াই ছিলেন। ভিতরে ঢুকিতেই ফণীবাবু (শ্রীযুক্ত ফণী দত্ত) বলিয়া উঠিলেন ঃ

"আদাব লইয়ে নিকুঞ্জবাবু। আদাব লইয়ে। খালি হিন্দি বাৎ, বাংলা আর নেহি ! দেখিয়ে এর মধ্যেই হিন্দি ক্যায়সা রপ্ত কোরে ফেলেছি।"

কথাটা শুনিয়া বুঝিতে বিলম্ব হইল না যে, ফণীবাবু সত্যই 'হিন্দিবাত ক্যায়সা রপ্ত' করিয়া ফেলিয়াছেন !

কোহিনূর বাবু পাশেই ছিলেন, বলিলেন :

"ফণি, তোমার জুতোর কথাটা নিকুঞ্জবাবুকে বলে দাও।"

"রাস্তায় হঠাৎ পা বড় হোয়ে গেছে, জুতো এবার আর পায়ে ঢুকল না তাই রেখে এসেছি।" এই বলিয়া ফণীবাবু হাসিতে সুরু করিলেন। বলিলেন, "বিশ্বাস করছেন না, না? তবে শুনুন। আগ্রা ষ্টেশনের আগে থাকতেই ভীষণ গরম বোধ করতে লাগলাম। গা থেকে জামা খুলে ফেললাম, জুতো তো খোলাই ছিল, কিন্তু তাতেও কি গরম কমে! সমস্ত গা দিয়ে যেন আগুন বেরুচ্ছে, হাতে-পায়ে-গায়ে-মাথায় শুধু বরফ আর বরফ! বরফও শেষে গরম হোয়ে উঠল। কেমন, সত্যি কিনা?"

হস্তপ্রসারিত করিয়া একটি আঙ্গুল বরাবর আমার চোখের কাছে ধরিয়া ফণীবাবু প্রশ্ন করিলেন। মাথা নাড়িয়া বলিলাম, 'হ্যাঁ সত্যি।'

ফণীবাবু বলিয়া চলিলেন, "কোটা ষ্টেশনে যখন নামবার সময় হোল, জামাটা পরে নিলাম। কিন্তু জুতো পায় দিতে গিয়ে দেখি জুতো আর পায় ঢোকে না। গরমে সব জিনিষই বড় হয়, পা'টাও সেই নিয়ম অনুসারে বড় হোয়ে গিয়েছে। কোহিনুর-দা', আমি, আর, আরো অনেকে মিলে শত টানাহেঁচরা কোরেও যখন কিছু করতে পারিলাম না, তখন ষ্টেশনের প্ল্যাটফর্ম্মেই জুতোজোড়া রেখে চলে এলাম।" জিজ্ঞাসা করিলাম, কিন্তু সঙ্গে নিয়ে এলেন না কেন?

উত্তর এল, 'বোঝা বয়ে এনে কি হবে, দেশে ফেরবার দিন আবার ওখান থেকে নিয়ে গেলেই চলবে!' সমস্যার একেবারে সহজ সমাধান! 'যা কিছু দুর্ব্বোধ ছিল হয়ে গেল জল!' জিজ্ঞাসুনয়নে ফণীবাবুর দিকে চাহিয়া রহিলাম।

ভাবিলাম, বলে কি! প্রথম কথা দেশে ফিরিব কি না তাহারই কোন ঠিক নাই এবং ফিরিলেই বা কতদিনে ফিরিব তাহাই বা কে জানে?

কিন্তু ফণীবাবু সব সন্দেহ ভঞ্জন করিয়া দিলেন, বলিলেন, 'আপনি ভাবছেন এর মধ্যে জুতোজোড়া যদি কেউ নিয়ে যায়? উহুঁ, সে পথ বন্ধ।' ফণীবাবুর আঙ্গুলটি আবার আমার চোখের কাছে আসিল। আঙ্গুল নাচাইয়া যাহা বলিলেন, তাহার মর্ম্ম এই, 'আমার জুতো জোড়া চামড়ার হোলেও আসলে লোহার। সের সাতেক তার ওজন। জুতোয় কালি আমি কোনদিনই দিই না—আপনি তো জানেন! কারণ, কালি দিলেই জুতো নরম হবে, আর নরম হলেই অন্যের নজরে তা পড়বে। কিন্তু আমার জুতোজোড়া নিতে চাইলেও কেউ নিতে পারবে না, পরতে চাইলেও কেউ পরতে পারবে না, এক ফণী দত্ত ছাড়া সে জুতো পরে পৃথিবীতে এমন সাধ্য কার।' এই বলিয়া ফণীবাবু হাসিতে সুরু করিলেন। দমকে-গমকে-মূর্চ্ছনায় অপূর্ব্ব প্রাণখোলা হাসি!

এমনি ভাবে নানা গল্পগুজবের মধ্য দিয়া স্নান-আহার ইত্যাদি সমাধা করিয়া শুইতে যাইব, হঠাৎ মনে হইল যেন গেটের

* জেলখানা—কারাগার

সামনে সন্তোষদা'-র (শ্রীযুক্ত সন্তোষ দত্ত) গর্জ্জন শোনা যাইতেছে। ব্যাপার কি দেখিবার জন্য উঠিতেছি এমন সময় পুষ্পবাবু (শ্রীযুক্ত পুষ্প চট্টোপাধ্যায়) আসিয়া বলিলেন, "আর উঠতে হবে না, গোলমাল চুকে গেছে।" গোলমাল বাঁধিয়াছিল নাকি আমাদের জিনিসপত্র তল্লাসী করিয়া তাহা ভিতরে পাঠানো লইয়া। দেউলী জেল কি না; তাই সবটাতেই কড়াকড়ি। সব জিনিসই তল্লাসীর পর কর্তৃপক্ষ ভিতরে পাঠাইয়া দিলেন, কিন্তু, 'তবলা-তরঙ্গিণী' নামক একটি তবলা-শিক্ষার পুস্তক লইয়াই যত গোল বাঁধিয়া গেল! গেটে সেন্সরের যে অফিসরটি ছিলেন তিনি বলিলেন, সরকার অনুমোদিত বইয়ের যে তালিকা আছে তাহাতে নাকি ঐ বইয়ের নাম নাই। তাঁহাকে অনেক করিয়া বুঝান হইল যে, বইটি 'বই' ছাড়া আর কিছুই নয়; ইহা সঙ্গীত সম্বন্ধীয় একটি বই আর তাহা ছাড়া হিজলী জেলের সেন্সর যে উহা অনুমোদন করিয়াছেন সে ছাপও বইখানিতে আছে। কিন্তু, কে কার কথা শোনে! ইংরেজের সেন্সর কর্ম্মচারী! আইন অমান্য করিবে কি করিয়া! লিষ্টিতে যখন নাম লেখা নাই তখন আইনত বইখানি সে দিতে পারে না! অনেক হুজ্জুতের পর ঠিক্ হইল যে, এই ব্যাপারে দেউলী জেলের উর্দ্ধতন কর্তৃপক্ষ যিনি, তাঁহার কাছে ব্যাপারটা জানানো হইবে, তাহার পরে বইটি দেওয়া অথবা না দেওয়া ঠিক হইবে। রফা একটা হইল বটে, কিন্তু সন্তোষ-দা' ছাড়িবার পাত্র নহেন, তিনি আজ রাত্রেই যা হোক একটা বুঝাপড়া করিয়া লইতে

চাহেন। অনেক কষ্টে সন্তোষ-দাকে বুঝাইবার পর শেষ পর্য্যন্ত তিনি আজ রাত্রিটা সময় দিতে রাজী হইলেন।

পরের দিন ভোরে ঘুম হইতে উঠিতে-না-উঠিতেই শুনি, চারিদিকে হাসির রোল পড়িয়া গিয়াছে। কাছেই ছিলেন শ্রীযুক্ত হরিদাস সেন, তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করিব কি তিনি তো হাসিয়াই খুন! কথা বলিবার আর তাঁহার ফুরস্থৎ নাই। অনেক কষ্টে হাসি সম্বরণ করিয়া তিনি বলিলেন ঃ গত রাত্রির 'তবলা-তরঙ্গিণী' সম্পর্কিত বিচারের রায় সেন্সর অফিসর দিয়া পাঠাইয়াছেন। তাঁহার জুনিয়র অফিসর তাঁহাকে প্রশ্ন করিয়া পাঠাইয়াছিলেন, 'তবলা-তরঙ্গিণী' ভিতরে দেওয়া যায় কি না। তিনি নথি-পত্র ঘাঁটিলেন, কি-কি জিনিস জেলের মধ্যে দেওয়া যায় তাহার তালিকা তন্ন-তন্ন করিয়া দেখিলেন। তালিকায় 'তবলা' পর্য্যন্ত খুঁজিয়া বাহির করিলেন বটে, কিন্তু, 'তরঙ্গিণী' আর পাইলেন না! তাই তিনি হুকুম দিলেন "তবলা is allowed, but তরঙ্গিণী not."

তিন

সেন্সর বিভাগের বেড়াজাল ভেদ করিয়া 'তবলা-তরঙ্গিণী' কতদিনে জেলের মধ্যে ঢুকিয়াছিল, কিংবা আদৌ ঢুকিয়াছিল কি না তাহা ঠিক মনে নাই, তবে 'তবলা-তরঙ্গিণী' যে বাক্‌বিতণ্ডার উত্তাল তরঙ্গ তুলিয়াছিল তাহা বেশ মনে আছে। ইংরেজের জেলখানার সঙ্গে সামান্য পরিচয়ও যাঁহাদের আছে, বিশেষ করিয়া রাজবন্দীদের বন্দীশালার সঙ্গে, তাঁহারা এই সর্ব্ববিদ্যাপারঙ্গম সেন্সর বিভাগের ক্রিয়াকলাপের কথা ভাল করিয়াই জানেন। যেমন তাঁহাদের বুদ্ধি, তেমনি তাঁহাদের পাণ্ডিত্য, আর তেমনি বিচার ক্ষমতা! বাইরের জগতের সঙ্গে

বন্দীদের সম্পর্ক তো শুধু সামান্য কয়েকখানা চিঠিপত্রের মধ্য দিয়া ; কিন্তু এই সেন্সরের কৃপায় চিঠি ভাল করিয়া লিখিবারও যেমন জো ছিল না, ভাল একখানা চিঠি পাইবারও তেমনি উপায় ছিল না। সেন্সরের কাঁচিটি অনুক্ষণ উদ্যত হইয়াই থাকিত। প্রথম দিকটায় সেন্সর-বিভাগ ব্যবহার করিতেন কালি। চিঠির অবাঞ্ছিত অংশটুকুর উপর পড়িত ঘন কালো চাইনিজ্ ইঙ্কের প্রলেপ। কাহার সাধ্য সেই কালিমা ভেদ করিয়া কোন কিছু উদ্ধার করে ? কিন্তু, রাজবন্দীদের মধ্যে এমন এক-একজন ছিলেন যাঁহারা অসাধ্য সাধন করিতে পারিতেন। খেলার মাঠে নামিলে তাঁহারা চার পাঁচজনকে ধরাশায়ী না করিয়া উঠিতেন না, খাওয়ার ঘরে গেলে চার-পাঁচ জনের আহার্য্য অনায়াসেই শেষ করিয়া ফেলিতেন আর পড়িতে আরম্ভ করিলে রাত্রি কখন যে শেষ হইয়া যাইত বুঝিতেও পারিতেন না। এই যাঁহাদের বৈশিষ্ট্য তাঁহারা না করিতে পারেন কি! তাই তাঁহাদের চেষ্টায় সেন্সরের এই কালিমার অন্ধকারেও আলোর রেখা দেখা দিল, কালির প্রলেপের নীচে চিঠির অক্ষরগুলি জ্বল্-জ্বল্ করিয়া উঠিল। কথাটা যেন কি করিয়া রাষ্ট্র হইয়া গেল। সেই হইতে চাইনিজ্ ইঙ্কের বদলে সেন্সরের হাতে দেখা দিল ধারালো কাঁচি। এক-একটি চিঠিকে কাঁচি দিয়া এমন সুন্দরভাবে তাঁহারা ছাঁটিতেন যে, প্রকাণ্ড একটা চিঠির মাত্র কয়েকটি সরু ফালি ভিতরে আসিয়া ঢুকিত। এক-একটি চিঠি এমনও

আসিয়াছে যাহাতে প্রথমে লেখা আছে 'কল্যাণীয়েষু' আর শেষে 'ইতি তোমার মা'—বাকিটুকু সেন্সর-কাঁচির কৃপায় জেল গেটের বাহিরেই রহিয়া গিয়াছে! সেন্সর বিভাগের এমনি কড়া পাহারা। সুতরাং সেই কড়া পাহারার আগল ভেদ করিয়া আমরা আর কতটুকুই বা লিখিতে পাইতাম। সপ্তাহে তিনখানা চিঠি লিখিবার নিয়ম ছিল এবং তাহাতেও শুধু, "আমি ভালই আছি, আপনি কেমন আছেন"—এই ধারার মামুলী কথাবার্ত্তা ছাড়া আর কোন কিছু লেখা চলিত না। ইহাতে আমাদের অবশ্য কোন রকমে চলিয়া যাইত কিন্তু আমরাই তো আর সব নই, জেলখানায় কবি-সাহিত্যিকের অভাব ছিল না। আর তা' ছাড়া বন্দীশালার পরিবেশ এবং আবহাওয়া যত দুঃসহই হউক না কেন, মানুষের পৃথিবীতে থাকিয়াও পৃথিবীর বাহিরে একটি স্বতন্ত্র জগৎ জেলখানার অধিবাসীদিগকে অন্তর্ম্মুখী করিতে বাধ্য করিত। ইচ্ছা থাকিলেও তো বাহিরের জগতের সঙ্গে দৃষ্টি-বিনিময় সে করিতে পারিত না, দৃষ্টি তাহার বন্দীশালার পাষাণ-প্রাচীরে আহত হইয়া শুধু ফিরিয়া-ফিরিয়াই আসিত। তাই ভিতরের দিকে না চাহিয়া উপায় ছিল না। এই জন্যই আমাদের মধ্যে অনেক অ-কবিও কবি হইয়া উঠিয়াছেন এবং তাঁহাদের দৌলতে অনেক 'শুষ্কং কাষ্ঠং'-ই 'নীরস তরুবরে' পরিণত হইয়াছে। এই কবি-সাহিত্যিকদের লইয়াই ছিল সেন্সর বিভাগের বিপদ। তাঁহারা হয় তো চিঠিতে এমন

কিছু লিখিয়া বসিতেন যাহা নিছকই কাব্য, কিন্তু সেন্সর বিভাগের লোকেরা তো আর কাব্য-ধর্ম্মী নন, দুধকে তাঁহারা দুধই বোঝেন; আর জলকে জল। তাই তাঁহাদের দৃষ্টি এড়াইয়া সে কাব্য আর বাহিরের আলো হাওয়ার পরশ পাইত না। এই তো গেল এক দিককার কথা। চিঠির আর একটি যে নিয়ম ছিল তাহা আরো মারাত্মক। প্রত্যেক চিঠির সঙ্গেই এক টুকরা চিরকুট আমাদের আঁটিয়া দিতে হইত, জেলের পরিভাষায় নাম তাহার 'Relation slip'। চিঠি যাহার কাছে লিখিতেছি এবং চিঠির মধ্যে যে সব আত্মীয়-স্বজনের, ভাই-বন্ধুর নামোল্লেখ করিতেছি তাঁহাদের নাম, ধাম, পেশা ঐ কাগজের টুকরায় (Relation slip) লিখিয়া দিতে হইত। তাঁহাদের সঙ্গে আমার সম্পর্কই বা কি আর তাঁহাদের ঠিকানাই বা কি লিখিয়া না দিলে সে চিঠি আর যাইত না। একটি দৃষ্টান্ত দিলেই কথাটা পরিষ্কার হইয়া যাইবে। এটা অবশ্য দেউলী জেলের কথা নয়, ১৯৪৪-এর বক্সা বন্দীশিবিরের কথা। দেউলীর ১০।১২ বছর পরেও সেন্সর বিভাগ 'তবলা-তরঙ্গিণী'-র স্তর পার হইয়া কত দূরে আসিয়াছেন এই ঘটনাটি হইতে সহজেই তাহা বুঝা যাইবে। ঘটনাটি ঘটিয়াছিল মালুবাবুর একটি চিঠি লইয়া। মালুবাবু (শ্রীকালিপদ বন্দ্যোপাধ্যায়) শিল্পী, কিন্তু কবি নহেন। কাব্য যে শুধু তিনি অপছন্দই করিতেন তাহা নহে, কাব্য শব্দটিকেই তিনি তাঁহার অভিধান হইতে নাকচ করিয়া দিয়াছিলেন। বাহিরে তাঁহার

চালচুলা, কথাবার্ত্তা শুনিয়া যখন মনে হইবে যেন এইমাত্র তিনি কুড়াল লইয়া গাছ কাটিয়া আসিলেন তখন খোঁজ লইলে হয়ত দেখা যাইবে যে, হাতে তাঁহার যাহা ছিল তাহা কুড়াল নহে—তুলি, আর যাহা তিনি করিয়া আসিয়াছেন তাহা বৃক্ষছেদন নহে, চিত্রাঙ্কণ! এহেন মালুবাবু আর যাহাই করুন না কেন, কাব্য যে ভুলেও করিবেন না তাহা সহজেই বুঝিতে পারা যায়। একদিন বাড়ী হইতে একটি দুঃসংবাদ পাইলেন মালুবাবু, তাঁহার পিসামহাশয়ের মৃত্যুসংবাদ। পরের দিন বাড়ীতে চিঠি লিখিলেন ঃ

"পিসামহাশয়ের মৃত্যু সংবাদে অতীব দুঃখিত হইলাম। পিসীমাকে কি বলিয়া প্রবোধ দিব ভাবিয়া পাইতেছি না।"

চিঠিখানা আফিস হইতে ফেরৎ আসিল, উপরে লেখা, 'State your relationship and the present address of your Pishamahasaya'—অর্থাৎ 'পিসামহাশয়ের সঙ্গে আপনার সম্পর্ক কি আর তাঁহার বর্ত্তমান ঠিকানাই বা কি?' উত্তর লিখিতে মালুবাবুর বিলম্ব হইল না। তিনি লিখিয়া পাঠাইলেন, 'Pishamahasaya is my father's sister's husband. His present address is :—

'Pishamahasaya',
C/o God, the Almighty.
P. O & Vill.—Heaven'

আর একটি চিঠির কথাও এই সঙ্গে না বলিয়া পারিতেছি না। চিঠিটি লিখিয়াছিলেন জ্যোতিষবাবু। (শ্রীজ্যোতিষচন্দ্র জোয়ারদার)। জ্যোতিষ বাবু সিরিয়স টাইপের লোক। চিঠি বড় একটা তিনি লিখিতেন না ; কিন্তু যদি কোন চিঠি লিখিতেন তাহার নির্গলিতার্থ উদ্ধার করিতে সেন্সর বেচারাদের গলদ্ঘর্ম্ম হইয়া যাইত। জ্যোতিষবাবু লিখিয়াছেন ঃ

"—একদিন কোনমতে বেঁচে থাকার পায় নতি স্বীকার করে যারা মনুষ্যত্বের দাবীকে এড়াতে চেয়েছিলেন, মনুষ্যত্ব তাদের রাহুগ্রস্ত হয়ে গেল। আজ জীবনধারণের অধিকার পর্য্যন্ত তাদের অস্বীকৃত। একটা শুভমুহূর্ত্তে কেউ মরতে চাইলাম না, আজ সবাই মরছি ; মায়ের কোল থেকে মৃত্যু পর্য্যন্ত আমাদের অবমাননা। শান্তি আমাদের শ্মশানের মাটিতে। বিশ্বময় মরণযজ্ঞে পৃথিবীর মানুষ আজ আহুত। জীবনের মূল্য দিয়ে জীবন প্রতিষ্ঠার মহামন্ত্র মানুষকে মরিয়া কোরে তুলেছে। আত্মত্যাগের ঐ রাজপথে কৃপণের ঠাঁই নেই। কল্যাণকরের বেদীমূলে সুখকরকে বলি দিয়ে দিয়েই মনুষ্যত্বের স্রোতকে বেগবতী করেছে মানুষ যুগে-যুগে। আপাতদৃষ্টির সাথে বিশ্বদর্শনের একটু সংঘর্ষ তো আছেই। শেষ পর্য্যন্ত জয় হওয়া চাই বিশ্বদর্শনের। প্রতিদিনকে মুছে না ফেলে, প্রতিদিনের উর্দ্ধে যে চিরকালের দিনটি তাকে অভিনন্দিত করা চাই। সুখকরকে নমস্কার, কল্যাণকরকেও নমস্কার।"

সেন্সর-অফিসারটি ছিলেন মহাধুরন্ধর। তিনি ভাবিলেন, কঠিন কতগুলি কথাবার্ত্তার ফাঁকে জ্যোতিষবাবু বুঝি তাঁর দুই বন্ধুকে নমস্কার জানাইতে চান ! এবং, এই নমস্কার জানাইবার মধ্য দিয়া না জানি কোন গূঢ় সংবাদ জানিতে অথবা জানাইতে

চান! তাই লিখিয়া দিলেন, 'State your relationship with Mr. Sukha Kar and Kalyan Kar. Are they in any way related to Bakul Kar of this Camp?' 'শ্রীযুক্ত সুখকর এবং শ্রীযুক্ত কল্যাণ করের সঙ্গে আপনার সম্পর্কটা কি? তাঁহারা কি এই ক্যাম্পের বকুল করের কোন আত্মীয়?' উত্তরে জ্যোতিষবাবু কি লিখিয়াছিলেন মনে নাই তবে ভীষণ চটিলেও যে শেষ পর্য্যন্ত হাসিয়া ফেলিয়াছিলেন তাহা মনে আছে।

দেউলীর প্রথম রাত্রি কি ভাবে কাটিয়াছে বলিয়াছি। এখন দিন-যাপনের পালা। প্রথম দিনের সর্ব্বপ্রথম কাজই হইল চেনা যাঁহারা তাঁহাদের সকলের সঙ্গে দেখাশুনা করা আর অচেনা যাঁহারা, তাঁহাদের সঙ্গে পরিচয় করিয়া লওয়া। কিন্তু তাহার কি উপায় আছে?

উঠি-উঠি করিতেছি, এমন সময় কে যেন সজোরে ধাক্কা দিয়া বলিল, "উঠ বাবু, চা পিও।" চোখ খুলিয়া দেখি এক জবরদস্ত্ আদমী সামনে দাঁড়াইয়া। হাতে বিরাট এক কেৎলি, মুখে স্তিমিত হাসি।

চায়ের পেয়ালার প্রতি একটু দুর্বলতা বরাবরই ছিল। ঘুম হইতে উঠিতে না উঠিতেই চায়ের পেয়ালা সামনে দেখিয়া খুশিই হইলাম। ভাবিলাম দেউলী সম্পর্কে এতদিন যা-তা ভাবিয়া আসিয়াছি, আসলে দেউলী অত খারাপ নয়! পাশের খাটে শুইয়াছিলেন

কোহিনূর বাবু। ঘুম আমার ভাঙ্গিয়াছে দেখিয়া বলিলেন ঃ

—"কি এত ভাবছেন, নিকুঞ্জ বাবু!'

বললাম, 'ভাবব আর কি, 'তবলা-তরঙ্গিণী"-র কথাই ভাবছি।'

কোহিনূর বাবু উত্তর করিলেন ঃ

'তবলা-তরঙ্গিণী'র ব্যাপার আর এমন কি! তাকেও ছাড়িয়ে গেছে বহরমপুরের শ্রীমান্ অশোকের ছুটির দরখাস্ত।'

জিজ্ঞাসা করিলাম, 'কি রকম?'

কোহিনূর বাবু বলিলেন, 'তবে শুনুন, আমাদের সরকারের কাণ্ড। কুশী রায়ের মা মৃত্যু-শয্যায় এই মর্ম্মে ওর কাছে তার ভাই এক টেলিগ্রাম করল। টেলিগ্রামে লেখা ছিল ঃ *Mother in death-bed, start immediately.* কিন্তু '*start immediately*' লিখলেই তো আর জেলখানা থেকে ষ্টার্ট করা যায় না। কুশী সরকারের কাছে টেলিগ্রামটি পাঠিয়ে দিয়ে এক ছুটির দরখাস্ত করল। দেখতে দেখতে দিন কাটতে লাগল, কিন্তু তবু সরকারেরর উত্তর আর আসে না।

দিন পনের পরে সরকার জবাব দিলেন, 'আপনার দরখাস্ত সরকারের বিবেচনাধীন।'

Your petition for leave is under consideration' সে বেচারা আর কি করে!

রাগে ক্ষোভে ওর শরীর জ্বলে গেল। মা মৃত্যুশয্যায়, আর সরকার কিনা তা জানতে পেরেও জানালেন যে, দরখাস্ত সম্পর্কে বিবেচনা করা হচ্ছে। কিন্তু উপায় কি!

কোন উপায়ান্তর না দেখে কুশী ওর ভাইয়ের কাছে একটি টেলিগ্রাম লিখে সেন্সারের জন্য পাঠিয়ে দিলে। টেলিগ্রামে লিখল—

Postpone mother's death—Govt. considering leave' মায়ের মৃত্যু স্থগিত রাখ, সরকার ছুটি সম্পর্কে বিবেচনা করছেন'—

এই বলিয়া কোহিনূর বাবু হাসিতে সুরু করিলেন।

জেলখানা—কারাগার

চার

বাংলাদেশের জেলে থাকিতে 'দেউলী জেল' সম্পর্কে যে ধারণা করিয়াছিলাম, আসিয়া দেখিলাম তাহা ঠিক নয়। অন্যান্য জেলের মতই ইহার অবস্থা। আলোও যেমন আছে অন্ধকারও আছে তেমনি। বক্সা বন্দীশিবিরে এবং প্রেসিডেন্সি জেলে 'দেউলী' সম্পর্কে নানা কাহিনীই শুনিয়াছিলাম, সংবাদপত্রে ইহার যে বর্ণনা উঠিয়াছিল তাহা তো রীতিমত ভয়াবহ। তা'ছাড়া একথা সকলেই ধরিয়া লইয়াছিলেন যে, দণ্ডিত রাজনৈতিক বন্দীদের জন্য যেমন আন্দামান,—বহুদূরে বঙ্গোপসাগরে মধ্যে একটি বিচ্ছিন্ন নিরালা নির্ব্বাসন দ্বীপ, রাজবন্দীদের জন্য তেমনি দেউলী,—মরুভূমির বালুসায়রে

জনমানবহীন একটি ওয়েসিস্। সেখানে যাওয়া মানেই যে চিরকালের জন্য বাংলাদেশ ছাড়িয়া যাওয়া ; এ ধারণা অনেকের মনেই বদ্ধমূল হইয়া গিয়াছিল। শুধু রাজবন্দীদের মনেই নয়, বাহিরের লোকের মনেও ঠিক এমনিতর ধারণাই জন্মিয়াছিল। বাঙলার ছেলে আজ চিরদিনের জন্য বাঙলার বাহিরে চলিয়া যাইতেছে, হয়তো আর সে ঘরে ফিরিবে না, আর কোনদিন দেখিতে পাইবে না প্রিয়-পরিজনের মুখ—এই ছিল সেদিন সকলের ধারণা। মনে আছে বাঙলার একশত সৈনিকের দেউলী স্থানান্তর সম্পর্কে কলিকাতার একটি প্রথমশ্রেণীর দৈনিক পত্রিকা, '*My Motherland, good-bye!*' নাম দিয়া একটি সম্পাদকীয় প্রবন্ধ প্রকাশ করিয়াছিল। তাহাতে সমগ্র বাঙলা ও বাঙালীর প্রাণের সুরটি যে ভাষায় কথা বলিয়া উঠিয়াছিল ; তাহা মিথ্যা নয়।

কেন, সেই কথাটাই বলিতেছি।

দেউলী জেলে পৌঁছিয়া আনন্দ-কোলাহলের মধ্যে মুহূর্তগুলি কাটিতেছিল সত্য কথাই। ফণীবাবু, কোহিনূরবাবু, সন্তোষ-দা', বীরেন-দা', এঁরা একদিকে আর অন্যদিকে বট্টু, রামসিং, সুধন্য এই সব সাধারণ কয়েদীর দল দেউলী জেলের নীরস মুহূর্তগুলিকে রস-ঘন করিয়া তুলিতেছিল, কিন্তু জেল-জীবনের এই সূচনাই তো ইহার সবখানি নয়। এই আনন্দের পেছনে দুলিতেছিল একটা গভীর নিরানন্দের ছায়া,

আলোর পেছনে ছিল অন্ধকারের একটি কালো যবনিকা। তাহা উদ্ঘাটন না করিলে দেউলী জেলের জীবন-যাত্রার ছন্দটি ধরাই পড়িবে না।

প্রেসিডেন্সি জেল হইতে দেউলী যাত্রার ৩।৪ দিন আগে দেউলী সম্পর্কে যখন সত্য-মিথ্যা অনেক কথাই শুনিতেছিলাম এবং নিজের মনের মধ্যে দেউলী জেলের একটা কাল্পনিক রূপকে প্রায় সম্পূর্ণ করিয়া আনিতেছিলাম ঠিক সেই সময় একদিন ভোরবেলা দৈনিক পত্রগুলি একটা ভয়াবহ সংবাদ বহন করিয়া আনিল। সংবাদটি এই ঃ

'-ই জুন, ১৯৩২, রাত্রি দ্বিপ্রহরে দেউলী জেলে রাজবন্দী মৃণালকান্তি রায়চৌধুরী আত্মহত্যা করিয়াছেন।'

সংবাদটি মর্ম্মান্তিক। শোকে, বিষাদে, অনিশ্চিত আশঙ্কায় রাজবন্দীরা অভিভূত হইয়া পড়িলেন। দেউলী জেলের জীবনযাত্রা সবেমাত্র শুরু হইয়াছে, এখনও সকলে গিয়া সেখানে পৌঁছান নাই। ইহারই মধ্যে এমন কি ঘটিতে পারে যাহার জন্য মৃণালকান্তির মত যুবকও আত্মহত্যার পথ বাছিয়া লইতে পারেন! দেউলী-যাত্রীদের মনে নানা প্রশ্নই উঠিতে লাগিল। মৃণালকান্তির মৃত্যু,—এ কিসের সঙ্কেত? ইহাই কি দেউলী জেলের ভূমিকা? এতই দুঃসহ কি ইহার পরিবেশ, এতই নিষ্ঠুর কি ইহার জীবন-যাত্রা যে, সেই ভয়াবহ আতঙ্কের হাত হইতে মুক্তি পাইতে হইলে মৃত্যু ছাড়া কোন গতি নাই? এমনি সব কথা মনের মধ্যে তোলপাড় করিতে লাগিল।

নানা বন্ধু নানা মত ব্যক্ত করিতে লাগিলেন, কেহ কেহ বলিলেন, 'এ হইতেই পারে না, মৃণালকান্তিকে আমি জানি, আত্মহত্যা করিবার ছেলে সে নয়, এ 'আত্মহত্যা' নয়, হত্যা' আবার কেহ-কেহ বলেন, 'আত্মহত্যা হইতেও তো পারে, প্রেসিডেন্সি জেলে থাকিতেই দেখিয়াছি কিছুদিন যাবৎ মৃণাল একা-একা থাকিতেই ভালবাসিত, কাহারও সঙ্গে বড় একটা মিশিত না।" এমনি নানা বাক্‌বিতণ্ডা, নানা যুক্তিতর্কের মধ্য দিয়া দেউলী যাত্রার শঙ্কিত মুহূর্ত্তটি কাছে আসিতে লাগিল।

দেউলী পৌঁছিয়াই তাই প্রথমেই মৃণালকান্তির কথা মনে হইয়াছিল, কিন্তু, বন্ধুবান্ধবদের কথাবার্ত্তায়, আলাপআলোচনায় প্রসঙ্গটি তুলিতে সাহসী হই নাই। কি জানি, যদি কেউ বলিয়া বসেন, 'মৃণালকান্তি আত্মহত্যা করেন নাই, মৃণালকান্তিকে ওরা হত্যা করিয়াছে!' বন্ধুবান্ধবরাও নিজেরা-নিজেরা বিশেষ কিছু বলিলেন না। ইহাতে যে কিছুটা বিস্মিত না হইয়া ছিলাম এমন নয়, যদিও জানিতাম এই রাজবন্দীরা সুখ-দুঃখ, আলো অন্ধকার, জীবন-মৃত্যু সব কিছুকেই একান্ত সহজ ভাবে গ্রহণ করেন। একাধিকবার দেখিয়াছি যে, সুখকে তাঁহারা যত সহজে বর্জ্জন করিয়াছেন, ঠিক ততটা সহজেই দুঃখকে করিয়াছেন সাথী। জীবনকে স্বাভাবিক ভাবেই গ্রহণ করিয়াছেন বলিয়া মৃত্যুকেও তাঁহারা অস্বীকার করেন নাই। তাই হয় তো, ইহাদের লক্ষ্য করিয়াই রবীন্দ্রনাথ বলিয়াছিলেন,—

"ভৈরবের আনন্দেরে দুঃখেতে জিনিল কে রে
বন্দীর শৃঙ্খলছন্দে মুক্তির কে দিল পরিচয়?"

—তবু যেন একটু আহত হইয়াছিলাম। ভাবিয়াছিলাম এত বড় একটা ঘটনা এই সেদিন ঘটিয়া গেল, তাহার উল্লেখ কেউ করিল না কেন? কিন্তু দিন যত যাইতে লাগিল বেশ বুঝিতে পারিলাম দেউলী জেলের সমস্ত পরিবেশটিকে ঘিরিয়া মৃণালকান্তির মৃত্যু কি গভীর রেখা-পাতই না করিয়াছে!

মৃণালকান্তি কেন যে আত্মহত্যা করিলেন তাহার কারণ সেদিন বড় একটা কেউ খুঁজিয়া পায় নাই। কয়েকদিন পূর্ব্বেই তিনি আসিয়াছিলেন। অসুস্থ তিনি ছিলেন এবং কারো সঙ্গে যে বড় একটা মেলামেশা তিনি করিতেন না ইহা ঠিক। এই অজুহাতেই একদিন জেল কর্ত্তৃপক্ষ তাঁহাকে জেলের অফিসে লইয়া যান এবং তাঁহার জন্য জেল গেটের বাহিরে যে সেলগুলি আছে (*Punishment cell*) তাহারই একটিতে তাঁহার বসবাসের ব্যবস্থা করেন। ভিতরে কর্ত্তৃপক্ষ জানাইয়া দিলেন যে, 'মৃণালকান্তি ডেটিনিউদের সান্নিধ্য পছন্দ করেন না বলিয়াই এই ব্যবস্থা করিতে জেলকর্ত্তৃপক্ষ বাধ্য হইয়াছেন।' তাঁহার পরের ঘটনা খুবই সংক্ষিপ্ত। একদিন রাত্রিতে নাকি পরিধানের বস্ত্রটি লৌহকপাটের আড়ার সঙ্গে বাঁধিয়া মৃণালকান্তি দেহত্যাগ করিলেন।

বন্দীশালার পাষাণপ্রাচীর, সেলের সতর্ক প্রহরী, জেল-

খানার সশস্ত্র সিপাই-সান্ত্রী সকলকেই ফাঁকি দিয়া মৃণালকান্তি চলিয়া গেলেন। আমাদের জন্য শুধু একটি প্রশ্নই রাখিয়া গেলেন, 'সত্যই কি মৃণালকান্তি আত্মহত্যা করিয়াছেন ?'

এ প্রশ্নের উত্তর সেদিন ডেটিনিউদের মধ্যে কেহ দিতে পারেন নাই। দেওয়া সম্ভবও ছিল না। কেবল একটা গভীর সন্দেহ সকলের মনেই সজাগ হইয়া রহিল। হারাণ আসিয়াছিল কিছুদিন পরে। এ প্রশ্নের উত্তর সেই কেবল জানিত।

সে বলিত, 'না বাবু এ হ'তেই পারে না, বাবুরা কি কখনও আত্মহত্যা করে? তাদের দুঃখটা কি? আমি নিশ্চয় জানি, এ ওদেরই কাণ্ড!'

যেমন সহজ মানুষ, তেমনি সরল অথচ দৃঢ় বিশ্বাস। তাহার চোখে-মুখে, তাহার বাচনভঙ্গীতে এমন একটা নিশ্চিত আত্মপ্রত্যয়ের ভাব ফুটিয়া উঠিল যে, কাহার সাধ্য মনে করে যে, হারাণের কথাগুলি মিথ্যা! মৃণালকান্তির মৃত্যুর জন্য কে দায়ী, কাহারা দায়ী এ-প্রশ্ন তখন যেমন মনে উঠিয়াছিল আজও ঠিক তেমনি সকলের মনেই উঠিবে। ইহার উত্তর কাহারও কাছে মিলিবে, কাহারও কাছে হয়তো বা মিলিবেও না। হারাণের মত আত্মপ্রত্যয়শীল লোক ক'জনই বা দুনিয়ায় আছে?

অনেক দিন হইয়া গিয়াছে। মৃণালকান্তির কথা হয়তো অনেকের মনে-ও নাই। ভারতবর্ষের স্বাধীনতা-সংগ্রামের

জেলখানা—কারাগার

ইতিহাসে স্বাধীনতার এই সব সৈনিকদের কথা, আত্মীয়-পরিজনহীন দূর প্রবাসে এমনি সব নির্ম্মম মৃত্যুর কথা হয়তো কোন দিনই লেখা থাকিবে না। কিন্তু তবু রাজপুতানার মরুময় প্রান্তরে, দূরপ্রত্যন্তের নির্জ্জন এক কারাকক্ষে একটি নিষ্ঠুর মৃত্যু,—একটি অসহায় বিদায়মূহূর্ত্ত, রাত্রির অন্ধকারে প্রভাত-আলোর প্রতীক্ষায় প্রহর যাপন করিবে। কেহ হয়তো তাহার খোঁজও করিবে না, শুধু বাঙলাদেশের কোন একটি দুর্ভাগা পরিবারের বুকে এ নির্ম্মম বিয়োগান্ত অধ্যায়টির গভীর শোক ও বিষাদের বহ্নিময় স্মৃতি-রেখা চিরদিনের জন্য দাগ কাটিয়া রাখিয়া যাইবে।

পাঁচ

দেউলীর আলো-আঁধারের এই পটভূমিকার পেছনে জেল-কর্তৃপক্ষের একটি লোককে কিছুতেই ভুলিতে পারা যায় না। তিনি হইতেছেন দেউলীর জেল-সুপার। নাম তাঁর, পি. ই. এস্. ফিণে (*P. E. S. Finney*)—ফিণে সাহেবের চেহারাটি সুন্দর, মেজাজটি ঠাণ্ডা, স্বভাবটি মিষ্টি। মুখের একটি কোণে স্মিত একটু সলজ্জ হাসির ফালি যেন সবসময় লাগিয়াই থাকিত। চেহারা, কায়দাকানুন, চাল-চলতিতে তাঁহার এমন একটি বৈশিষ্ট্য ছিল যে, ভাগ্যের জোরে তিনি যদি মিষ্টার ফিণে (*Mr. Finney*) না হইয়া মিস্ ফিণে (*Miss*

Finney) হইতেন তাহা হইলে ভাগ্যান্বেষণে সুদূর পারে আসিয়া এত কষ্ট তাঁহাকে করিতে হইত না; তবে ইংরেজের বড় ক্ষতি হইত! কারণ তাঁহার মত এমন সুচতুর বিচক্ষণ জেল-সুপার সে-যুগে আর একজনও ছিলেন কিনা সন্দেহ। রাজবন্দীদের জন্য নূতন বন্দীশালার স্থান নির্ব্বাচনে প্রথম তাঁহার বিচক্ষণতা ধরা পড়ে বক্‌সা বন্দীশিবির প্রতিষ্ঠায়। বাংলাদেশের মধ্যে থাকিয়াও বাংলা দেশের বাহিরে, দুর্গম পাহাড়ের বুকে এমন স্থাননির্ব্বাচন সত্যই দূরদর্শিতার পরিচায়ক! বক্‌সার পরে আবার দেউলী। সেখানেও ফিণে সাহেবের প্রয়োজন হইল। নূতন জায়গাটা চালু করিতে হইলে তাঁহার মত মাথাওয়ালা লোকেরই তো প্রয়োজন! এমন একটি লোকের কিছুটা পরিচয় না দিলে এ কাহিনী অসম্পূর্ণ থাকিয়া যাইবে। ফিণে সাহেবের কথা শুনিয়া আপনি মুগ্ধ হইবেন, ব্যবহার দেখিয়া আপনি পুলকিত হইবেন। বুঝিতেও পারিবেন না যে এই সুস্মিত, স্নিগ্ধ আচরণের অন্তরালে আপনার জন্যই একটী তীক্ষ্ণ অস্ত্র শান দেওয়া হইতেছে। সে অস্ত্র যখন আপনার ঘাড়ে পড়িবে তাহার পূর্ব্বমূহূর্ত্ত পর্য্যন্ত আপনি তাঁহার বিন্দুবিসর্গও জানিতে পারিবেন না, এমনি তাঁহার নিঃশব্দ তৎপরতা! শত গালিগালাজেও, শত উত্তেজনায়-ও মেজাজটি তাঁহার একটু গরম হয় না।

এই ফিণে সাহেবকে লইয়াই ছিল গোলমাল। বিশেষ

করিয়া সন্তোষ-দা', সতীন-দা' (শ্রীযুক্ত সতীন সেন) এঁরা তো ফিণেকে মোটেই সহ্য করিতে পারিতেন না। মনের সুখে গালি-গালাজ করিলেও যিনি চটেন না তাঁহাকে লইয়া আর কি করা যায় ! কথা বলিতে গেলে মনে হয় সবই তিনি মানিয়া লইতেছেন অথচ কাজের বেলা কিছুই করেন না। নূতন জেলে প্রথমটায় অসুবিধা থাকে অনেক। দেউলীতেও তাহার ব্যতিক্রম ঘটিল না। প্রথমে গোলমাল বাঁধিল ডাক্তার এবং চিকিৎসার ব্যবস্থা লইয়া। যে দুইটি গোবেচারা আমাদের জন্য নিয়োজিত ছিলেন তাঁহারা তো ডেটিনিউদের কাণ্ড কারখানা দেখিয়া ভড়কাইয়াই গেলেন। ঔষধপত্র তাঁহারা আর কি দিবেন ! কথায় কথায় ডেটিনিউরা বড়-বড় ঔষধের নাম করেন, '*Dr. Roy*'-এর প্রেসক্রিপসনের কথা বলেন ! বেচারারা ভাবেন, "ওরে বাবা ! ডাক্তার রায় যাঁহাদের চিকিৎসা করিয়াছেন তাঁহাদের চিকিৎসা করিবেন ডাঃ মহম্মদ আলী আর ডাঃ জগন্নাথ !" তাই এঁরা অভিনব এক পন্থা অবলম্বন করিলেন। কাহারও অসুস্থতার সংবাদ পাইলেই রোগীর কাছে তাঁহারা যাইতেন এবং কিছুক্ষণ পরে জিজ্ঞাসা করিতেন, "*What medicines do you suggest ?*" 'কি ঔষধ আপনার চাই ?' রোগীর কথামতই প্রেসক্রিপসন লেখা হইয়া যাইত এবং সেই অনুসারেই ঔষধপত্রও আসিত !

একদিনের কথা আজও মনে আছে। জীবন বাবুর (শ্রীযুক্ত জীবন সরকার) ভীষণ পেট ব্যথা সুরু হইল। ডাক্তার আসিলেন,

জেলখানা—কারাগার

ঔষধপত্রও দিলেন, কিন্তু কিছুতেই কিছু হয় না, রোগ বাড়িয়াই যাইতে লাগিল। ডাক্তার মহম্মদ আলী তো মহা মুস্কিলে পড়িলেন। কি করিবেন ভাবিয়া পাইতেছিলেন না। ফণীবাবু কাছেই ছিলেন। তিনি ডাক্তার সাহেবকে বাহিরে ডাকিয়া নিয়া বলিলেন, "আলী সাহেব, তোমার চিকিৎসায় এ ব্যারাম সারিবে না, আমার কথামত ঔষধ দাও।"

আলী সাহেব অকূল সাগরে যেন কূল পাইলেন, বলিলেন, "বলুন কি ওষুধ দিতে হ'বে।" ফণী বাবু বলিলেন, "খাওয়ার ওষুধে কিছু হবে না, ব্যায়রামটাকে বাইরের দিক থেকে তাড়াতে হবে।"

আলী সাহেবকে তিনি বুঝাইয়া দিলেন যে, জীবনবাবু আসলে ছিলেন রোগা লোক, জেলে আসিয়া তাঁহার ভুড়ি বাড়িতে সুরু করিয়াছে এবং ইদানীং শুধু ভুড়ি নয়, পেটে কয়েকটি থাক-ও পড়িয়া গিয়াছে; সেই থাকের মধ্যে মাটি জমিয়া গিয়াছিল। জীবনবাবু জোর করিয়া সেই মাটি পরিষ্কার করিতে যাওয়াতেই এই বিপত্তি! অতএব এখন চিকিৎসা করিতে হইবে ভিন্ন ভাবে। একটি কিউটিকুরা পাউডারের কৌটা এবং একটি কিউটিকুরা সাবান দিলেই আপাততঃ ওই রোগের চিকিৎসা হইতে পারিবে। মহম্মদ আলী বিজ্ঞের মত ঘাড় নাড়িয়া বলিলেন, "হাঁ, হাঁ, অব্ সমঝ্ লিয়া"। ভাবিলেন, 'বাঙালী তো তাই রোগও একটু অদ্ভুত ধরণের!'

যথাক্রমে পাউডার ও সাবান আসিল এবং বলাবাহুল্য সে ব্যথাও সারিয়া গেল!

এ-প্রসঙ্গে আমরা আরো একটি চিকিৎসা-ব্যবস্থার কথা না বলিয়া পারিতেছি না। দেউলীর কথা নয়, বক্সার কথা। কিন্তু রোগ-মুক্তির ধারায় ইহা অভিন্ন। বক্সা জেলে একটা নিয়ম তখন ছিল, চোখ এক-আধটু খারাপ হইলেই সরকারী খরচে চশমা নেওয়া চলিত। এই নিয়ম জারী হওয়া মাত্রই ডেটিনিউ মহলে সাড়া পড়িয়া গেল। অনেকেই মাঝে-মাঝে চোখে ঝাপ্সা দেখিতে লাগিলেন, অনেকের চোখ দিয়াই সময়ে অসময়ে জল ঝরিতে লাগিল! বইয়ের অক্ষরগুলি অনেকের কাছেই কখনও বা বড় কখনও বা ছোট হইতে লাগিল। দ্রুত তালে চক্ষু পরীক্ষার কাজ আগাইয়া চলিল, চশমাও আসিতে সুরু করিল। ব্যাপার দেখিয়া মালুবাবু তো একেবারে হতাশ হইয়া গেলেন। কারণ, তাঁহার চোখ দিয়া জলও পড়ে না, চোখে জ্বালাপোড়াও বড় একটা নাই, অথচ একটা চশমা না লইলেই নয়! উপায়ান্তর না দেখিয়া মালুবাবু সটান গিয়া উপস্থিত হইলেন ডাক্তারের কাছে।

বলিলেন, "ডাক্তারবাবু, চোখ পরীক্ষা করতে হবে।"

ডাক্তারবাবু বলিলেন, 'বেশ তো, কাল, *Dark-room*-এ যাবেন, পরীক্ষা কোরে দেখব।'

পরের দিন নির্দ্ধারিত সময়ে মালুবাবু গিয়া বসিলেন *Dark-room*-এ। কিছুক্ষণ পরে ডাক্তার আসিয়া হাজির হইলেন,

বলিলেন, 'কে?' মালুবাবু চোখ দু'টি উপরের দিকে তুলিলেন, বলিলেন, 'কে আপনি? ডাক্তারবাবু? কৈ আমি তো আপনাকে দেখতে পাচ্ছি না!'

ডাক্তারবাবু মুচকি হাসিলেন, বলিলেন, "মালুবাবু আপনি এত আলোতেও যখন আমাকে দেখতে পাচ্ছেন না, তখন তো আপনার চোখ দস্তুরমত খারাপ হয়েছে। আপনার আর পরীক্ষার দরকার হবে না, চশমা আপনি নিশ্চয়ই পাবেন!"

ছয়

সুখ-দুঃখের মধ্য দিয়া, আলো-অন্ধকারের মধ্য দিয়া, দেউলী জেলের জীবন-যাত্রা সুরু হইয়া গেল। এখন, এতদিন পরে, দূর হইতে যত সহজে বলিতে পারিতেছি যে, 'জীবন-যাত্রা সুরু হইয়া গেল', তখন যে তত সহজে সুরু হয় নাই তা' বেশ মনে আছে।

মৃণালকান্তির মৃত্যুতে যেখানকার যাত্রা সুরু সেখানকার দিনগুলির প্রতিটি মুহূর্ত্ত যে কত বেদনার, কত আশঙ্কার তাহা মর্ম্মে-মর্ম্মে অনুভব করিতেছিলাম।

তাহার উপরে ফিণে সাহেবের কারিগরি, জেলকর্ম্মচারিদের ব্যবহার, ডাঃ মহম্মদ আলী-জগন্নাথের বিদ্যাবুদ্ধি, দেউলী জেলের প্রতিটি দিনের উপর যেন একটা ভারি বোঝার মত ঝুলিতেছিল। কিন্তু, দিন তো আর কাহারও জন্য অপেক্ষা করে না—দিন যাইতে লাগিল।

দেউলী জেলের জীবনযাত্রা অন্য জেল হইতে বিভিন্ন। প্রথম কথা, রাত্রিতে 'লক্-আপ' নামক বিদ্‌ঘুটে ব্যাপারটা এখানে ছিল না। তাই 'লক্ আপ'-এর রাজ্য হইতে যাঁহারা আসিয়াছেন রাত্রির এই স্বাধীনতাটুকু তাঁহাদের কাছে পরম উপভোগ্য।

প্রকাণ্ড মাঠের মধ্যে সারি বাঁধিয়া রাত্রিতে খাট পাতা হয়, সেই খাটের উপরই রাত্রি যাপনের ব্যবস্থা। প্রায় রাত দশটা পর্য্যন্ত গরম হাওয়া চলে। তারপরে রাত্রি যত বাড়িতে থাকে হাওয়া তত ঠাণ্ডা হইতে থাকে। দুপুর রাত্রি হইতে ভোর পর্য্যন্ত সত্যই আরামের। কিন্তু, দিনের বেলাটা একেবারে অসহ্য।

বেলা দশটার পর হইতেই ঘরের দরজা-জানালা সব বন্ধ করিয়া দেওয়া হয়। দুপুর হইতে তো রীতিমত বাহিরে আগুনের হল্কা চলিতে থাকে। ঘরের মধ্যে-ও গরম একেবারে দুঃসহ বলিলেই চলে। বাংলাদেশ হইতে সবে আমরা সেখানে গিয়াছি ; দিনের গরমটার সঙ্গে যেন আর কিছুতেই আঁটিয়া উঠিতে পারিতেছি না। বাংলা দেশের গ্রীষ্মের একটা বিশেষত্ব

ছিল এই যে, সর্ব্বশরীর ঘামে ভিজিয়া যাইত। গেঞ্জি ভিজিত, জামা ভিজিত, এমন কি কাপড় পর্য্যন্ত ভিজিয়া যাইত এবং তাহার পরে তাহাতে এক-আধটু হাওয়া লাগিলে তখনকার মত আরামই পাওয়া যাইত।

কিন্তু মরুভূমির গ্রীষ্মের একটা বিশেষত্ব এই যে, গরমের দিনে শরীরে একটুও ঘাম হয় না, গরম হাওয়ায় শরীরে জ্বালা ধরে। বাঙালী আমরা, এমন শুষ্ক ভয়াবহ গরমের সঙ্গে পরিচিত নই। তাই এক-একটি দিন পার হইয়া গেলে মনে হইত যেন এক-একটা যুগ পার হইয়া গেল।

বহু দুঃখ-বেদনার মধ্যে, বহু আঘাত-সংঘাতের মধ্যে রাজবন্দীদের দেখিয়াছি, কোন কিছুই তাহাদের বড় একটা কাবু করিতে পারে নাই, কিন্তু দেউলীর অগ্নিবাণের এ প্রচণ্ড খরতাপ যেন তাহাদের কাবু করিয়া ফেলিল। পুলিশের লাঠি দেখিয়া যাঁহারা হাসিয়াছে, বন্দুকের গুলিকে যাঁহারা ভয় করে নাই, তাঁহারা যেন এই গ্রীষ্মের দাব-দাহ দেখিয়া ভয় পাইয়া গেল।

ভোর হইতে বেলা প্রায় ১০টা পর্য্যন্ত এক রকম ভালই কাটে। তাহার পরে বেলা যত বাড়িতে থাকে দিবসের উত্তাপ-ও তত বাড়িতে থাকে এবং তখন হইতেই সুরু হয় সংগ্রাম। মধ্যাহ্নের খাওয়া শেষ করিতে হয় আগেই এবং তাহার পরেই সকলে যে যার অভিনব পন্থায় 'সংগ্রাম' সুরু করিয়া দেয়।

প্রকাণ্ড লম্বা একটা ব্যারাকে আমাদের থাকিবার ব্যবস্থা। এদিকে-ওদিকে, আশেপাশে কয়েকটি সেলও যে না ছিল এমন নয়, কিন্তু, অধিকাংশ বন্দীদের ভাগ্যেই ছিল 'ব্যারাক জীবন'। দুপুর বেলা ঐ ব্যারাকের এক প্রান্ত হইতে অপর প্রান্ত পর্য্যন্ত হাঁটিয়া গেলে একদিকে সেই গ্রীষ্মের, অপর দিকে উহার বিরুদ্ধে সংগ্রাম-রত বন্ধুদের পরিচয় পাওয়া যাইত।

একটি দিনের কথা বলিতেছি। রুণুদা' (শ্রীযুক্ত শৈলেন্দ্র দাশগুপ্ত) হলঘরের এক কোণে একটি 'ক্যারম বোর্ড' লইয়া বসিয়া গিয়াছেন, সঙ্গে আছেন তাঁহার একটি সাগরেদ্। দুইজনের মাথায়ই দুইটি জলে ভিজানো ভারী 'মূইর টাওয়েল।' সেই তোয়ালে হইতে সর্ব্বাঙ্গে একটু-একটু করিয়া জল ঝরিতেছে আর তাহারই আস্বাদ গ্রহণ করিয়া রুণুদা মাঝে-মাঝে বলিয়া উঠিতেছেন, 'আঃ কি আরাম !'

রুণুদা' বলেন, 'এই গরমের বিরুদ্ধে আমার থিয়োরী হচ্ছে *Theory of diversion*—অর্থাৎ মনটাকে এমনভাবে মজিয়ে রাখতে হবে ক্যারম বোর্ডের ঐ ঘুঁটিগুলির মধ্যে যা'তে দেহটার অস্তিত্ব এক রকম শূন্যে মিলিয়ে যায়। এক আধটুকু যদিও বা থাকে তারই জন্য ভেজা তোয়ালের ব্যবস্থা।'

আর কয়েক পা' অগ্রসর হইতেই দেখা হইল বীরেনদা'র (শ্রীযুক্ত বীরেন্দ্র চট্টোপাধ্যায়) সঙ্গে। বীরেনদা' বয়সে বৃদ্ধ হইলেও মনের দিক্ দিয়া তরুণ, তাই তরুণদের সঙ্গেই তিনি খেলা-ধূলা করিতে ভালবাসিতেন। কিন্তু, এই গরমে খেলাধূলা করিবেন কি !

দেখিলাম, একটি মগ লইয়া তিনি ধীরে-ধীরে মাথায় অবিরাম জল ঢালিতেছেন আর গান গাহিতেছেন, 'ভেঙ্গেফেলে দিয়ে কারা, এস বন্ধনহীন ধারা—' আমাকে দেখিয়াই বলিলেন, "এ ছাড়া বাঁচবার আর কোন পথ নেই, নিকুঞ্জ! আসলে গরম হয় মাথাটাই। এই মাথাটা ঠাণ্ডা রাখতে পারলেই জগৎ ঠাণ্ডা।"

একটু দূরেই একটা কোণ ঘেঁষিয়া শুইয়াছিলেন ফণীবাবু (ফণী দত্ত নহেন, ইনি শ্রীযুক্ত ফণী চট্টোপাধ্যায়) ওরফে, 'ফণী ভাই।' ফণী ভাইয়ের একটু পরিচয় আবশ্যক, কিন্তু, সেটা পরে হইবে। এখন শুধু এইটুকু জানিলেই যথেষ্ট হইবে যে, তাঁহার বপুটি জেলে আসিয়া অকস্মাৎ এত বাড়িয়া গিয়াছে যে, চিৎ হইয়া তিনি শুইয়া থাকিলে সম্মুখে কিছু দেখিতে পান না, চোখের সামনে একটা বিরাট পাহাড়ের বাধা যেন! একটা পাটির উপরে শরীরখানা কোন রকমে এলাইয়া দিয়া শুইয়া আছেন নগ্নদেহ ফণীবাবু, আর তাঁহারই নাভির উপরে রক্ষিত ঠাণ্ডা জলের একটা প্রকাণ্ড বাটি ধরিয়া বসিয়া আছেন যোগেশ বাবু (শ্রীযোগেশ চক্রবর্ত্তী)। বাটিটা শ্বাস প্রশ্বাসের তালে-তালে এমনভাবে উঠা-নামা করিতেছে যে, বাটি হইতে মাঝে-মাঝে এক এক ঝলক জল উপচাইয়া পড়িতেছে ফণীবাবুর দেহে আর যোগেশ বাবু চিৎকার করিতেছেন, 'সামালকে ভাই, সামালকে।' কিন্তু কে কাহাকে সামলায়! যোগেশ বাবু বলিলেন, 'ফণী ভাই, ওঁর ঐ পেটটি ঠাণ্ডা থাকলেই সব

ঠাণ্ডা। মাথা তো গরম হয় পরে, আগে পেট—তারপর মাথা।'

দাঁড়াইয়া-দাঁড়াইয়া দেখিতেছি এমন সময় হলঘরের ওপারে একটা বিরাট হৈ-চৈ শুনিয়া সচকিত হইয়া উঠিলাম, দেখিলাম একে একে সবাই সেদিকে ছুটিয়াছে। ব্যাপার কি!

হলঘরের অপরপ্রান্তে ছোট্ট একটি *Ante-room* (এ্যান্টি রুম) আছে। সেই রুমের দরজায় সবাই ভিড় করিয়া দাঁড়াইয়াছে। আর তাহারই দুয়ারে দাঁড়াইয়া ফণীবাবু হাঁকিতেছেন, 'দো-দো' আনা টিকেট বাবু, দো-দো আনা, দো-দো আনা।' কোন রকমে ফণীবাবুর অনুমতি লইয়া বিনা টিকেটেই ঘরের মধ্যে ঢুকিয়া পড়িলাম। দেখি এক অভিনব কাণ্ড! সমস্ত ঘরটি জুড়িয়া একটি মশারী টানানো হইয়াছে। সেই মশারীর মধ্যে নিশ্চিন্ত আরামে শুইয়া আছেন, আমাদের 'ক্যাপ্টেন'। আর ক্যাপ্টেনের পরিচর্য্যা করিবার জন্য তাঁহারই একান্ত অনুগত ভক্ত 'নকলী' বালতি হইতে জল লইয়া সমস্ত মশারীটি ভিজাইতেছে। মশারীতে জলসিঞ্চন পর্ব্ব শেষ হইয়া গেলে ভিতর হইতে ক্যাপ্টেনের জলদগম্ভীর কণ্ঠস্বর শোনা গেল, 'অব হাওয়া লাগাও।' আদেশ পাওয়া মাত্র 'নকলী' একটি বিরাট পাখা লইয়া মশারীর চারিপাশে হাওয়া করিতে লাগিল। ভেতর হইতে ক্যাপ্টেন বলিলেন, 'অব ঠিক্ হ্যায়'। নকলী মুচকি-মুচকি হাসিতে লাগিল। সবাই সেদিন এক বাক্যে স্বীকার করিল যে, 'হ্যাঁ, মাথা বটে! দেউলীতে গরম

তাড়াইবার যতগুলি উপায় এ পর্য্যন্ত আবিষ্কৃত হইয়াছিল তাহার সবগুলিকেই নিঃসন্দেহে পরাজিত করিল ক্যাপ্‌টেনের এই নব আবিষ্কার! ফণীবাবু মিথ্যা বলেন নাই, টিকিট কাটিয়া দেখিবার উপযুক্ত ব্যাপারই বটে!

সাত

আমাদের এই ক্যাপটেনের এবং তাঁহার একান্ত অনুগত নকলীর পরিচয় যদি কিছুটা এখন না দেই, তাহা হইলে সত্যই তাঁহাদের প্রতি অবিচার করা হইবে। ক্যাপ্টেনের বাড়ী সিলেটে (শ্রীহট্ট), কিন্তু, জেলে ঢুকিবার পূর্ব্বে কিছুদিন কলিকাতায় ছিলেন বলিয়া তাঁহার কথাবার্ত্তা একেবারে কলিকাতার হইয়া গিয়াছিল! তাই চোরকে 'চূড়' গুড়কে 'গোড়' আর আর সন্তোষদাকে 'সন্তষ দা' বলিলে-ও কথা বলার ঢঙটি কিন্তু একেবারে খাস কলিকাতার করিয়া ফেলিয়াছিলেন! বন্ধু-বান্ধবেরা জিজ্ঞাসা করিলে ক্যাপ্টেন বলিতেন, 'এতদিন কলকাতায়

থাকলোম্ তাই বাসাটা বদলিয়ে গিয়েছে (এতদিন কলকাতায় থাকলাম, তাই ভাষাটা বদলে গেছে।) কিন্তু, ভাষার দিক্‌টা এখন থাক্, ক্যাপ্টেনের আসল দিকটার কথা না বলিলে তাঁহাকে বুঝিতেই পারা যাইবে না।

শ্রীঅন্নদা মজুমদার, তাঁহার নাম। কিন্তু তাঁহার আদিম নামটি সকলের বিস্মৃতির এত অতল তলে তলাইয়া গিয়াছিল যে, হঠাৎ নাম জিজ্ঞাসা করিলে স্বয়ং ক্যাপ্টেনও কেমন যেন হকচকাইয়া যাইতেন। ক্যাপ্টেনের মনের তলা হইতে 'শ্রীঅন্নদা মজুমদার-কে উদ্ধার করিতে তাঁহার নিজেরও রীতিমত বেগ পাইতে হইত।

দুঃসাহসী ও দুর্দ্দমদ বলিয়া ক্যাপ্টেনের খ্যাতি আছে। শুনিয়াছি, 'ইলিসিয়াম রো-'তে ক্যাপ্টেন যতদিন ছিলেন, বেশ আরামেই নাকি ছিলেন। অথচ কলিকাতার এই 'ইলিসিয়াম-রো' ১৯৩০-৩৪ সালে এত কুখ্যাত হইয়া উঠিয়াছিল যে, তাহার নাম শুনিলেও রাজবন্দীদের গায়ে কাঁটা দিয়া উঠিত।

অন্যান্য দেশের রাজনৈতিক বন্দীদের উপর কত অত্যাচার উৎপীড়নের কথাই তো শুনিয়াছি, কত 'থার্ড ডিগ্রি মেথডের' কথা শুনিয়াছি, কিন্তু, এই 'ইলিসিয়াম-রো' সকল দেশের সকল মেথডকেই সেদিন ছাড়াইয়া গিয়াছিল। সে-নরককুণ্ড হইতে সুস্থ দেহ ও সুস্থ মন লইয়া সেদিন যিনি ফিরিতে পারিতেন তিনি যে শুধু শক্তিমান তাই নন, একান্ত ভাগ্যবানও বটেন! এই দলে ছিলেন আমাদের ক্যাপ্টেন-ও। নানারকম ক্রিয়া-

প্রক্রিয়ায় ব্যর্থকাম হইয়া অবশেষে একদিন নাকি 'ইলিসিয়াম-রো'-র একজন আই-বি কর্ম্মচারী এক নূতন পন্থার আশ্রয় লইয়াছিলেন। ক্যাপ্টেনের বামহাতের বৃদ্ধাঙ্গুষ্ঠের নখ ও মাংসের মধ্য দিয়া ধীরে-ধীরে একটি ছুঁচ বিঁধাইয়া দেওয়ার ব্যবস্থা তিনি করিলেন। ছুঁচ আসিয়াছে, লোকও আসিয়াছে। ক্যাপ্টেন তখনও নির্ব্বিকার, নির্ব্বিকল্প।

একটু পরেই অকস্মাৎ বাঁ হাতটি নিজেই লোকটির দিকে বাড়াইয়া দিলেন, বলিলেন, 'কষ্ট যখন করবেনই ঠিক কোরেছেন, তখন দয়া কোরে সব আঙ্গুল গুলিতেই কিন্তু ছুঁচ ঢোকাবেন। অনেক দিন পরে নখগুলি পরিষ্কার হোয়ে যাবে—এতদিনে যা মাটি জমেছে!'

ভদ্রলোক তো একেবারে চটিয়া লাল! তিনি কি নরসুন্দর নাকি! শেষকালে নখের মাটি পরিষ্কার করিবেন! রাগে গর-গর করিতে করিতে প্রহরীকে আদেশ দিলেন, 'কুঠরীমে লে যাও বাবুকো, লেকে কুছ ধোলাই কর।' ক্যাপ্টেন সে যাত্রা ছুঁচের হাত হইতে পরিত্রাণ পাইলেন বটে, কিন্তু 'ধোলাই' বেশ ভাল মতই হইল। ক্যাপ্টেন বলিতেন, ইহাতেও নাকি তাঁহার উপকারই হইয়াছিল, কারণ, কয়েকদিন যাবতই সমস্ত শরীরটা যেন তাঁহার ম্যাজম্যাজ করিতেছিল! ধোলাইয়ের পরে কয়েকদিন তিনি শয্যা গ্রহণ করিতে বাধ্য হইয়াছিলেন সত্য কথাই, কিন্তু, শরীরটা নাকি পরে বেশ ঝরঝরে হইয়া গিয়াছিল!

আর একদিনের আর একটি ঘটনা : ক্যাপ্টেন নিজের মুখেই বলিয়াছেন। ১৯৩১ সালে সে ঘটনাটি ঘটিয়াছিল।

ওয়েলিংটন স্কোয়ারে সুভাষচন্দ্রের নেতৃত্বে একটি জনসভা হওয়ার কথা। নির্দ্দিষ্ট সময়ের পূর্ব্বেই বহু জনসমাগম হইতেছিল। পার্কটির বাহিরে লোকে লোকারণ্য। রাস্তায় ট্রাম-বাস সবই বন্ধ হইয়া গেল—এত লোকের ভীড়। কিন্তু পার্কের ভিতরে কয়েকটি পুলিশ ছাড়া একটি লোকও নাই। ওয়েলিংটন স্কোয়ারের প্রবেশ-পথগুলির মুখে সশস্ত্র পুলিশ পাহারা। সরকারের হুকুম, সভা করিতে দেওয়া হইবে না। কিন্তু সরকারের হুকুম তো সরকারের কাছে; সুভাষচন্দ্রের কাছে তাহার মূল্য কতটুকু! তিনি বলিয়া পাঠাইলেন, নির্দ্দিষ্ট সময়ে আসিয়া তিনি উপস্থিত হইবেন, সভা হইবেই। রুদ্ধ নিঃশ্বাসে সমগ্র জনতা সুভাষচন্দ্রের আগমন প্রতীক্ষা করিতে লাগিল। এদিকে লালবাজারে তখন বিরাট কর্ম্মচাঞ্চল্য।

লরীবোঝাই পুলিশ একের পর এক ছুটিল ওয়েলিংটন স্কোয়ারের দিকে। নির্দ্দিষ্ট সময়ে সুভাষচন্দ্র তাঁহার সঙ্গীদের লইয়া গেটের সামনে আসিয়া দাঁড়াইলেন। পুলিশ কর্ম্মচারী সরকারের আদেশ-পত্রটি দিলেন সুভাষচন্দ্রের হাতে, ক্ষণিকের জন্য তাহাতে চোখ বুলাইয়া সুভাষচন্দ্র সঙ্গীদের বলিলেন, 'ভেতরে চলুন।' কিন্তু কাহার সাধ্য ভিতরে যায়?

সুভাষচন্দ্র আগাইয়া চলিলেন, পুলিশের লাঠি সুভাষচন্দ্র ও তাঁহার সঙ্গীদের মাথায় অজস্র ধারায় বর্ষিত হইতে লাগিল। ক্যাপ্টেন বলিলেন, "আমি কি করলাম জানেন? আমি সুভাষচন্দ্রকে রক্ষা করবার জন্য এগিয়ে যেতে চাইলাম। কিন্তু যাওয়ার কি জো আছে। শুধু লাঠি আর লাঠি!"

রুদ্ধ নিঃশ্বাসে প্রশ্ন করিলাম, 'তারপর!'

—"আমি নূতন এক ফন্দি আঁটলাম", ক্যাপ্টেন বলিয়া চলিলেন, "হাত দু'টোকে সযত্নে রাখলাম পেছনে, তারপরে উদ্যত লাঠির সামনে মাথাটা দিলাম এগিয়ে। মাথাটা যদি যায়ই চূর্ণ বিচূর্ণ হোয়ে, কোন ক্ষতি হবে না, কিন্তু তবু হাত দুটো যেন অক্ষত থাকে!"

বলে কি! মাথা যায় যাক্, তবু হাত দু'টো যেন বাঁচে!

প্রশ্ন করিলাম, 'আপনি বলছেন কি ক্যাপ্টেন? মাথাই যদি গেল, হাত দু'টো দিয়ে আপনি করবেন কি?'

ক্যাপ্টেন একটু মুচকি হাসিলেন, বাহিরের আকাশে উদীয়মান সূর্য্যের দিকে একচক্ষু বুজিয়া একবার একটু চাহিয়া লইলেন, তারপরে বলিলেন, "মাথা গেলে কিছু হয় না নিকুঞ্জ-বাবু। মাথা দিয়ে আমাদের সকলের হবে কি! বেশী মাথা থাকলে ঐ ইংরেজ সরকার আমাদের মাথাগুলি দিয়ে মুড়িঘণ্ট রেঁধে খাবে বৈ তো নয়! মাথা মাত্র একজনেরই দরকার, নেতার মাথাটা থাকলেই হোল। আমাদের প্রয়োজন শুধু হাতের। সুভাষচন্দ্র যোগাবেন বুদ্ধি আর আমরা হাতে-নাতে তাকে

কাজে পরিণত করব। সেই জন্যই ত হাত দু'টির প্রতি আমার এত মায়া।"

এই বলিয়া কল্পিত মাস্‌ল্‌-যুক্ত সরু ডান হাতটি গর্ব্বভরে আমাদের দিকে আগাইয়া দিলেন।

জেলখানা—কারাগার

আট

ক্যাপ্টেনের পরিচয় আপনারা খানিকটা পাইয়াছেন। এবার তাঁহার একান্ত অনুগত ভৃত্য 'নকলী-'র কথাটা একটু বলি। নকলীর পরিচয় এইখানে একটু দেওয়া দরকার এইজন্য যে, নকলীকে না চিনিলে ক্যাপ্টেনকে তো ঠিক চেনা যাইবেই না—আর শুধু ক্যাপ্টেনকেই বা বলি কেন, দেউলী জেলের অনেক কিছুই অজানা থাকিয়া যাইবে।

জেলখানায়, বিশেষ করিয়া ডেটিনিউদের জন্য যে-সব ক্যাম্প ইংরেজ-সরকার প্রস্তুত করিয়াছিলেন, সেই সব ক্যাম্প বা জেলে সাধারণ কয়েদিদেরও একটা বিশেষ স্থান ছিল। প্রথমে

তাহারা আসিয়াই নূতন জেলের গোড়াপত্তন করিত। সারাদিন পরিশ্রম করিয়া, ঝোপঝাড় কাটিয়া ফেলিয়া, আবর্জ্জনা পরিষ্কার করিয়া নূতন জেলখানাটিকে তাহারাই বাস-যোগ্য করিয়া তুলিত এবং তারপরে জেলখানায় আমাদের মত 'সম্মানিত রাজ অতিথিরা' পদার্পণ করিতেন।

এইসব সাধারণ কয়েদীর জীবন ছিল একান্ত দুঃখের। মুখ বুজিয়া তাহাদের শুধু পরিশ্রম করিয়াই যাইতে হইবে। গ্রীষ্মের খরতাপ যে করিয়াই হউক তাহাদের সহ্য করিতেই হইবে। শীতকালে অসহ্য শীত, কিন্তু তাহাতে কিছুই আসে যায় না, সাধারণ কয়েদীরা তো আর মানুষ নয়, তাহাদের আবার শীত-গ্রীষ্ম কি! শীতের দিনে একটি কম্বল তাহারা বেশী পাইত আর তাহাদের ভাগ্যে জুটিত একটি কম্বলের 'কুর্ত্তা'। সেই কম্বল আর কম্বলের কুর্ত্তা যাঁহারা দেখেন নাই তাঁহারা ঠিক ধারণা করিতে পারিবেন না যে, ঐ কম্বল এবং কুর্ত্তা কি আজব চিজ্! কয়েকদিন উহা ব্যবহার করিবামাত্রই সারা অঙ্গে নানারকমের গোটা উঠিতে থাকে। প্রথম-প্রথম তো দেখিয়া ভয় পাইয়া যাইতে হয়, মনে হয় মা শীতলা বোধহয় ইহাদের উপর কৃপাপরবশ হইয়াছেন! প্রথম প্রথম খুবই কষ্ট হয়, পরে সবই সহ্য হইয়া যায়, সহ্য না করিয়া উপায়ই বা কি?

এই সাধারণ কয়েদিদের উপর জেল-কর্ত্তৃপক্ষ, মানে জেলের সুপার হইতে সুরু করিয়া সাধারণ সিপাই পর্য্যন্ত অত্যন্ত

কৃপাপরবশ ছিলেন! কথায় কথায় কিল-চড় তো আছেই, তা' ছাড়া লাঠি, 'কম্বল-ধোলাই' এগুলিও হামেশাই লাগিয়া থাকিত। 'কম্বল-ধোলাই' ইংরেজের জেলখানার এক অদ্ভুত আবিষ্কার। অপরাধীকে লইয়া যাওয়া হইত একটি punishment cell-এ। সেখানে তাহাকে বন্ধ করিয়া রাখা হইত। বাংলায়, জেলখানার পরিভাষায়, ইহাকে বলা হইত 'ডিগ্রী-বন্ধ'। তাহার পরে হাত-পা বাঁধিয়া একটি কম্বল কিংবা চট দিয়া তাহার সর্ব্বাঙ্গ মুড়িয়া তাহাকে শায়িত করা হইত এবং ঐ অসহায় অবস্থায় বন্দীর উপর কিছুক্ষণের জন্য চলিত নির্দ্দয় লাঠির প্রহার। এই অভিনব ধরণে 'ধোলাই' করার সার্থকতা কর্ত্তৃপক্ষের কাছে এই ছিল যে, এত প্রহারের পরেও দেহে সেই আঘাতের বড় একটা চিহ্ন থাকিত না, অথচ, ব্যথা-বেদনায় সারা শরীর অবশ হইয়া যাইত, কিছুদিন পর্য্যন্ত উঠিয়া বসিবার কিংবা পাশ ফিরিয়া শুইবার কোন সাধ্য তাহার থাকিত না।

সাধারণ কয়েদিদের জন্য আর এক রকমের শাস্তির ব্যবস্থা ছিল, জেলখানার পরিভাষায় তাহাকে বলা হইত, 'ডাণ্ডা-বেড়ী'। অপরাধী কয়েদীকে এই 'ডাণ্ডা-বেড়ী' পরাইতে কর্ত্তৃপক্ষের পরিশ্রমও প্রচুর করিতে হইত। মিস্ত্রী লাগিত, যন্ত্রপাতি লাগিত, লোহালক্কর লাগিত আর বেশ কিছুটা সময়ও লাগিত। এই সবগুলির সমন্বয়ে শেষ হইত 'ডাণ্ডা-বেড়ী' পর্ব্ব। যাহার ভাগ্যে ইহা জুটিত, প্রথমে

তাহার দুই পায়ে—গোড়ালির ঠিক উপরে ভারী দুইখানি চামড়ার পাত মুড়িয়া দেওয়া হইত, তাহার পর ঐ পাতের উপরে পরানো হইত দুইটি ভারী লোহার বালা। দুই পায়ের সেই বালা দুইটিকে প্রায় একহাত লম্বা একটি লৌহদণ্ড দিয়া যোগ করিয়া দেওয়া হইত যাহাতে ইচ্ছা-মত ঐ ডাণ্ডাবেড়ীধারী 'কদম-কদম' না বাড়াইতে পারে! আরও দুইটি ভারী লৌহদণ্ড ঐ লৌহবলয় হইতে বাহির হইয়া আসিয়া উর্দ্ধদিকে প্রলম্বিত থাকিত। ভুক্তভোগী কয়েদী ঐ ডাণ্ডা দুইটিকে দুইহাতে ধরিয়া পথ চলিত; পদক্ষেপের সঙ্গে-সঙ্গে বাজিয়া উঠিত শৃঙ্খলধ্বনি। বহুদূর হইতে সে ধ্বনি যুগপৎ দুঃখীর দুঃখ এবং ইংরেজের জয়গৌরব ঘোষণা করিতে-করিতে চলিত!

মধ্যযুগীয় এ চণ্ডনীতি স্বাধীন ভারতের জেলখানায় স্বাধীনতার জয়বার্ত্তা আজিও ঘোষণা করিতেছে কিনা জানি না, কিন্তু ইংরেজ রাজত্বে তাহা ছিল যেমন সম্ভব তেমনি স্বাভাবিক! কারণ, প্রভু ইংরেজের কাছে, পরাধীন দেশের জেলখানা তো জেলখানাই। সেখানে আবার সুখ-সুবিধাই বা কি, আর দয়াদাক্ষিণ্যই বা কি!

এইজন্যই হারাণ বলিয়াছিল, 'জেলখানা-কারাগার বাবু, জেলখানা-কারাগার! জেলখানায় কি মানুষ থাকে?'

থাকিবার ব্যবস্থার সঙ্গে সঙ্গতি রাখিয়াই চলিত সাধারণ কয়েদীদের খাওয়া-দাওয়ার ব্যবস্থাটাও। ভোরবেলা তাহাদের

জন্য বরাদ্দ ছিল 'লপ্‌সি' নামক একটি অপূর্ব্ব বস্তু। 'লপ্‌সি'-কে এক কথায় বলা চলে মাড়-ভাত, কিন্তু মাড়-ভাতের সঙ্গে 'লপ্‌সির' পার্থক্য আকাশ-পাতাল। যে ক্ষুদকুঁড়া দিয়া ইহা প্রস্তুত হইত তাহা অপূর্ব্ব, ধূলাবালি ও কাঁকড়ের সেখানে অবাধ গতি। আর সর্ব্বোপরি একটি 'সুগন্ধ' তাহা হইতে এমনভাবে দিগ্‌বিদিকে পরিব্যাপ্ত হইতে থাকিত যে, বহুদূর হইতে বুঝা যাইত কি 'আজব চীজ্‌' রান্নাঘর হইতে বাহির হইতেছে। সঙ্গে আর কিছু থাকিত না। একটু নুন জুটিলে তো ভালই, তাহা না হইলে নির্ব্বিবাদে এক বাটি ঐ 'লপ্‌সি' সকালবেলায় কোন রকমে গিলিয়া ফেলিতে হইত।

দুপুরবেলা ভাত, ডাল ও একটা তরকারী। এই তরকারীতে না থাকিত এমন জিনিষ নাই। শাকশব্জী, লতাপাতা হইতে সুরু করিয়া কচুপাতা, বটপাতা কিছুই বাদ পড়িত না।

কয়েদিদের স্বাস্থ্যের প্রতি নজর ছিল কর্ত্তৃপক্ষের খুব; তাই 'সবুজ' যাহা কিছু হাতের কাছে মিলিত অনায়াসেই তাহা তরকারীর ঐ লৌহকটাহে স্থান পাইয়া যাইত। রাত্রেও ঐ একই ব্যবস্থা। রুটী কিংবা ভাত, আর ডাল-তরকারী। সপ্তাহে দুইদিন ছিল মাছের ব্যবস্থা। কয়েদিদের পক্ষে সে দু'দিন ছিল ভোজ! পরিবেশনের সময় দেখা যাইত বালতি-বালতি ঝোল আসিতেছে আর আলাদা একটি

ছোট্ট পাত্রে ছোট-ছোট মাছের টুক্‌রা। ঝোল এবং মাছ জেলখানার কয়েদিদের জন্য একসঙ্গে রান্না হইত না, কারণ পুকুরপ্রমাণ ঝোলের সঙ্গে মাছ যদি একবার মিশিয়া যায় তাহা হইলে আবার জাল ফেলিয়াও যে সে মাছ ধরা যাইবে না! তাই মাছের মনে মাছ রান্না হয়, ঝোলের মনে ঝোল। কয়েদিরা তাহাই পরম পরিতৃপ্তির সহিত আহার করে। এইভাবে তাহাদের দিন চলিয়া যায়।

শুধু তাহাদেরই বা বলি কেন, এই ডেটিনিউদের মধ্যে প্রায় সকলকেই কিছু না কিছুদিনের জন্য এই জীবন যাপন করিয়া, কিছুদিন 'লপ্‌সি-তরকারী' খাইয়া কম্বল এবং কোর্ত্তা পরিয়া তবে 'ডেটিনিউ'-র মর্য্যাদা লাভ করিতে হইয়াছে।

সাধারণ কয়েদীদের সম্পর্কে এত কথা বলার তাৎপর্য্য এই যে, ইহাদের জীবন-যাত্রার সঙ্গে ছিল আমাদের প্রতি মুহূর্ত্তের যোগাযোগ ; অথচ আমাদের আহার্য্য হইতে কিছু-কিছু ভাগ তাহাদের দেওয়া ছাড়া তাহাদের জন্য আর বড় একটা কিছু আমরা করিতে পারিতাম না। জেল কর্ত্তৃপক্ষের কড়া নজর ছিল যাহাতে সাধারণ কয়েদিরা আমাদের প্রতি সহানুভূতিপরায়ণ না হইয়া উঠে। তাই ওদের কোন সুখ-সুবিধার কথা বলিতে গেলে কর্ত্তৃপক্ষ তাহা তো করিতেনই না বরং এমন সব ব্যবস্থা করিতেন যাহাতে ওদের জীবনযাত্রা আরো দুর্ব্বহ হইয়া উঠিত। ভাল করিতে গেলে মন্দই হইত বেশি। এ সম্পর্কে বহু ঘটনার

মধ্যে মাত্র একটির কথা এখানে উল্লেখ করিতেছি।

দেউলীর মরুভূমিতে গ্রীষ্মও যেমন প্রচণ্ড শীতও তেমন তীব্র। অথচ এই কনকনে শীতের মধ্যেও সাধারণ কয়েদিদের জন্য বিশেষ কোন ব্যবস্থাই ছিল না। ভোরে এবং রাত্রিতে ঐ কম্বল এবং কম্বলের কোর্ত্তার মধ্যে ঢুকিয়া হি-হি করিয়া তাঁহারা শুধু কাঁপিত।

এই নিয়া আমরা জেল-সুপার ফিণে সাহেবের সঙ্গে কথা বলিলাম। আমাদের বক্তব্য শুনিয়া ফিণে সাহেব কিছুক্ষণ চুপ করিয়া রহিলেন, মনে হইল বিষয়টি সম্পর্কে গভীরভাবে তিনি চিন্তা করিতেছেন। কিছুক্ষণ এইভাবে কাটাইয়া তিনি বলিলেন যে, তিনিও কয়েকদিন ধরিয়া ওদের কথাই ভাবিতেছেন, এই শীতের হাত হইতে ওদের কিছু আরাম কি করিয়া দেওয়া যায় ইহাই নাকি শুধু তিনি চিন্তা করিতেছেন! আগামীকাল হইতেই তিনি ইহার একটা ব্যবস্থা করিবেন, এই আশ্বাস দিলেন। এক কথাতেই যে ফিণে সাহেব এমন করিয়া রাজি হইয়া যাইবেন বুঝিতে পারি নাই; সন্তুষ্ট হইয়াই সেদিন ঘরে ফিরিলাম।

পরদিন ভোর হইতে না হইতেই দেখি, মাঠের মধ্যে সব কয়েদিদের একসঙ্গে দাঁড় করানো হইয়াছে। ব্যাপার কি জানিবার জন্য অগ্রসর হইতেছি—দেখিতে পাইলাম, সারি বাঁধিয়া তাহারা 'ডবল মার্চ্চ' করিতে সুরু করিয়াছে!

জমাদারকে জিজ্ঞাসা করিয়া জানিতে পারিলাম, তাহার উপর ফিণে সাহেবের আদেশ হইয়াছে যে, জেলের সমস্ত কয়েদি-দের ভোরে একবার আর সন্ধ্যার দিকে একবার প্রায় পনের মিনিট কাল 'ডবল মার্চ্চ' করাইতে হইবে। কিছুক্ষণ এইভাবে প্রত্যহ দৌড়াইলেই শরীর হইতে ঘাম বাহির হইবে—শীতের আর নামগন্ধও থাকিবে না।

বুঝিতে বিলম্ব হইল না যে, কাল ফিনে সাহেব আমাদের কাছে কয়েদিদের শীতনিবারণের যে প্রতিশ্রুতি দিয়াছিলেন ইহা তাহারই বাস্তব রূপায়ণ! পাঁচ ছয় দিন পরেই সেই ডবল মার্চ্চও বন্ধ হইয়া গেল; কারণ দৌড়াদৌড়িতে হয়রাণ হইয়া কয়েদিরা নাকি ফিণে সাহেবের কাছে বলিয়াছিল যে, শীত নামক জীবটি তাহাদের ব্যারাক হইতে একেবারে চলিয়া গিয়াছে—শীত আর তাহাদের লাগে না!

এমনি ছিল জেল-কয়েদিদের উপর কর্ত্তৃপক্ষের সহৃদয়তা! 'হৃদয়' নামক যে-বস্তুটি থাকিলে মানুষের দুঃখ-বেদনাকে উপলব্ধি করা যায়, জেল কর্ত্তৃপক্ষ সেই বস্তুটি কোথায় যে গচ্ছিত রাখিয়া আসিতেন তাহা ঠিক বুঝা না গেলেও সহৃদয় হওয়ার মত দুর্ব্বলতা তাঁহাদের যে থাকে না—এ কথা ঠিক। তাই জেলের কয়েদিরা যে মানুষ, ভুল করিয়াও একবার এ ভাবনা তাঁহারা ভাবিতেন না।

নয়

দেউলী জেলের এই সাধারণ কয়েদিদের মধ্যে 'নকলী' ছিল একান্ত সঙ্গোপনে—সকলের অগোচরে। ছয়-ছোট্ট মানুষটি, গলা দিয়া ভাল করিয়া আওয়াজ বাহির হয় না, কাহারও মুখের দিকে চাহিয়া সে বড় একটা কথা বলিতে পারিত না। মনে হইত, এমন সহজ নম্র মানুষটি যেন কয়েদি-সমাজের উপযোগীই নয়। এই নকলীকে ক্যাপ্টেন কি ভাবে আবিষ্কার করিয়া ফেলিলেন তাহা তিনিই জানেন; তবে 'নকলী' যে ক্যাপ্টেনের উপযুক্ত বাহনই হইয়াছে পরে তাহা বেশ বুঝিতে পারিয়াছি।

ক্যাপ্টেনের একটা অভ্যাস ছিল এই যে, তিনি হুকুম করা মাত্র ভৃত্যের তাহা তামিল করা চাই। মুহূর্ত্তমাত্র বিলম্বও তিনি সহ্য করিতে পারিতেন না। কাজটি কি ভাবে হইল, সুসম্পন্ন হইল কি না, এ ব্যাপারে তাঁহার তেমন লক্ষ্য ছিল না—কাজটি হইলেই হইল। নকলীও ইহা ভাল করিয়া বুঝিয়া ফেলিয়াছিল। তাই আদেশ পাওয়া মাত্র নকলী তাহা পালন করিবার জন্য ছুটিয়া বাহির হইত ; হয়ত আর ফিরিত না, কিন্তু তাহাতে কিছু ক্ষতি নাই, কাজ করিবার জন্য যে নকলী দৌড়াইয়া গিয়াছে ইহাতেই ক্যাপ্টেন খুশি। একটি ঘটনার উল্লেখ করিলেই ব্যাপারটা পরিষ্কার হইয়া যাইবে।

আগেই বলিয়াছি যে, গরমের দিনে দেউলী জেলে রাত্রিতে শোয়ার ব্যবস্থা আমাদের ছিল বাইরে, খোলা যায়গায়। রাত্রিতে এত হাওয়া বহিত যে, মশারী টানাইবার কোন প্রয়োজন হইত না ; কিন্তু সকলের জন্য এক ব্যবস্থা থাকিলেও ক্যাপ্টেনের জন্য ছিল ভিন্ন ব্যবস্থা ! মশারী না টানাইলে তাঁহার ঘুমই হইত না এবং সেই মশারী টানাইবার ভার ছিল নকলীর উপর।

একদিন রাত্রিবেলা শুইতে গিয়া ক্যাপ্টেন দেখিলেন যে, মশারী তাঁহার টানানো হয় নাই। ক্যাপ্টেন তো রাগিয়া আগুন। অমনি নকলীর ডাক পড়িল। ডাকের নমুনা শুনিয়াই নকলী বুঝিতে পারিল যে, কিছু একটা অন্যায় সে করিয়া ফেলিয়াছে। অপরাধীর মত নকলী ক্যাপ্টেনের কাছে আসিয়া দাঁড়াইল।

ক্যাপ্টেন বলিলেন, 'নকলী, হামকো মচ্ছরদানী কাঁহা?' নকলীর মুখে এবার একটু হাসির রেখা দেখা দিল, বলিল, 'মচ্ছরদানি তো লাগা দিয়া হুজুর।'

'কাঁহা?'—হুঙ্কার দিয়া উঠিলেন ক্যাপ্টেন।

নকলী উত্তর করিল,—'উধর ও গাছমে লাগা দিয়া হুজুর, হিঁয়া তো লাগানেকা কুছ বন্দোবস্ত্ হ্যায় নেহি, উসিবাস্তে হুঁয়া লাগায়া।'

নকলীর কথা মত দূরের ঐ গাছতলায় গিয়া দেখিলেন, একটি গাছের দুই ডালের সঙ্গে নকলী মশারীর দুই কোণ বাঁধিয়াছে আর দুই কোণ বাঁধিয়াছে সন্নিকটস্থ আর একটি গাছের সঙ্গে। প্রচণ্ড হাওয়ায় সে মশারী উড়িতেছে!

ক্যাপ্টেন খুশি হইয়া উঠিলেন, বলিলেন, 'ঠিক হ্যায়, অব্ ঠিক হ্যায়!' ক্যাপ্টেনের খাট রহিল এক জায়গায়, আর মশারী আর এক জায়গায়! কিন্তু তাহাতে কোন ক্ষতি নাই! নকলী যে ক্যাপ্টেনের আদেশ অক্ষরে-অক্ষরে পালন করিয়াছে ইহাতেই তিনি খুশি। সে রাত্রিতে ক্যাপ্টেনের নিদ্রার আর কোন ব্যাঘাত হইল না!

সাধারণ কয়েদিমহলে 'নকলী' একটি 'টাইপ'। দেউলী জেলের জীবনযাত্রায় এইরূপ বিভিন্ন 'টাইপ'-এর সন্ধান আমাদের মিলিয়াছিল।

হারাণ, সুধন্য, সনৎ, নকলী, তিলক, পাঁচু, রামসিং, বটু, কালুয়া—ইহারা প্রত্যেকেই এক-একটা 'টাইপ'। জেলখানায় আমাদের উপর ইহাদের প্রভাব-প্রতিপত্তি বড় কম ছিল না, কারণ ইহাদের লইয়াই তো আমাদের প্রতিদিনের জীবন। রান্নাঘর হইতে আরম্ভ করিয়া খেলার মাঠ পর্য্যন্ত সর্ব্বক্ষেত্রেই ছিল ইহারা বিরাজমান, তাই ইহাদের বাদ দিলে জেলখানার কাহিনী যে শুধু অসম্পূর্ণ থাকিবে তাহাই নহে, সে কাহিনী হইবে অসত্য।

এই সাধারণ কয়েদিদের মধ্যে কিছু লোক আছে যাহারা কয়েদি হওয়ার উপযোগীই নহে। বাহিরে অন্যান্য লোকের মত তাহারাও সাধারণ গৃহস্থের জীবনই যাপন করিত। ভাগ্য-চক্রের পরিবর্ত্তনে অকস্মাৎ কোন কিছু করিয়া ফেলিয়া তাহারা জেলে আসিতে বাধ্য হইয়াছে এবং সাধারণ কয়েদিদের মতই জীবন-যাত্রা নির্ব্বাহ করিতেছে। কয়েদি-জীবনে ইহারা হইতেছে নেহাৎ-ই ছন্দপতন। হারাণ, সুধন্য, সনৎ ইহারা ছিল সেই শ্রেণীর।

এই শ্রেণীর বন্দীদের মধ্যে যাহারা একটু বয়স্ক তাহাদের তেমন ভয়ের কিছু ছিল না, কিন্তু অল্প বয়সের যাহারা তাহাদের নিয়াই হইল ভয়। কারণ, বহুদিন দাগী চোর-ডাকাতদের সঙ্গে থাকিয়া, তাহাদের জীবনের কাহিনী শুনিয়া এবং তাহাদের কার্য্যাবলী লক্ষ্য করিয়া উহাদের দলে ভিড়িয়া যাওয়ার লোভ কেহ-কেহ সম্বরণ করিতে পারিত না, তাহাদের ভবিষ্যৎ জীবন হইত যেমন করুণ, তেমনি ভয়াবহ।

হারাণ এবং সনৎ—এরা ছিল দুই ভাই। হারাণ বয়সে বড়, সনৎ ছোট। সনতের বয়স বছর বাইশেকের বেশী হইবে না। হারাণ তাই প্রায়ই বলিত, "এই ছোঁড়াটাকে নিয়েই ভয় বাবু। ওর উপরে যা নজর পড়েছে নচ্ছারদের, ওকে ভালয় ভালয় ঘরে ফিরিয়ে নিয়ে যেতে পারি তবেই হয়। আর ছোঁড়াটাও বড্ড বেশী ফাজিল, কথাবার্ত্তা একটাও শুনবে না। আজ তো আর কিছু বুঝবে না, বুঝবে দু'দিন পরে।"

হারাণ জানিত না যে, যাহারা ধীরে-ধীরে ঐ পথ ধরিয়া জীবনের অন্ধকার গহ্বরে নামিতে সুরু করে তাহারা দু'দিন পরেও বুঝিতে পারে না যে, কোথায় তাহারা নামিয়া যাইতেছে, কোন্ অন্ধকারের তীরে—কোন্ অতল গহ্বরে।

দশ

একটি কয়েদীর কথা আজও ভুলিতে পারি না। বক্‌সা জেলে তাহার সঙ্গে দেখা হইয়াছিল, দেখাও হইয়াছিল অল্প কয়েকদিনের জন্যই; কিন্তু, সে কয়েক দিনের মধ্যেই আমাদের জীবনে যে দাগটুকু সে কাটিয়া গিয়াছে তাহা তো সহজে মুছিয়া ফেলিবার নয়।

নাম ছিল তার 'ক্ষুদু'—জাতিতে মুসলমান, বয়স ২০।২১-এর বেশী হইবে না। সুন্দর, ফুট-ফুটে চেহারা। কাছে ডাকিলে ডাগর-ডাগর চোখ দু'টি তুলিয়া প্রসন্নমুখে দাঁড়াইয়া থাকে, কথা বড় একটা বলে না। কি করিয়া বলিতে পারি না,

কয়েক দিনের মধ্যেই এই ক্ষুদুর সঙ্গে আমার বেশ ভাব জমিয়া গেল। কারণে-অকারণে ও আমার কাছে আসিয়া হাজির হয়, এটা-ওটা জিজ্ঞাসা করে, যাওয়ার সময় প্রয়োজনীয় কিছু চাহিয়া লইয়া যেমন অকস্মাৎ আসে তেমনি অকস্মাৎ চলিয়া যায়।

একদিন ক্ষুদুকে একা পাইয়া ধরিয়া ফেলিলাম, বলিলাম:

—'ক্ষুদু, তুই এই অল্প বয়সে এই চুরির পথ, পকেট-মারার পথ ধরলি কেন?'

নির্ব্বিবাদে ক্ষুদু বলিল, "অল্প বয়স! বলেন কি বাবু, পকেট মারার এইতো বয়স। এর চেয়ে বেশী বয়সে কি আর পকেট মারা যায়? নাঃ আপনি কিচ্ছু বোঝেন না বাবু", —এই বলিয়া ক্ষুদু পলাইয়া গেল।

বসিয়া-বসিয়া ভাবিতে লাগিলাম, সত্যই হয়তো কিছু বুঝি না। এই ক্ষুদু একদিন নিষ্পাপ-নিষ্কলঙ্ক ছিল, তাহা অনায়াসেই বলা যায়। তবে কিসের লোভে, কোন্ পাপে ও এই কলঙ্কের পথে পা বাড়াইল? ইহার পেছনে কি আছে কোন ভয়ঙ্কর একটা দুঃখের দাবদাহ, অভাবের তাড়না, না ইহা শুধু পাপ-জীবনের প্রতি একটা সহজ আকর্ষণ? ক্ষুদুর কথায় মনে হইল ওর নিজের কাছে এই জীবনটা যেমন সঙ্গত তেমনি স্বাভাবিক—অন্যায় কিংবা অসঙ্গত বলিয়া যেন ইহাতে কিছু নাই।

বসিয়া-বসিয়া নানাকথা ভাবিতেছি এমন সময় দেখি ঝড়ের বেগে আবার ক্ষুদু আসিয়া হাজির। ময়লা ন্যাকরায়

মোড়া ছোট্ট একটা মোড়ক আমার হাতে গুঁজিয়া দিয়া বলিল, "রেখে দিন বাবু, আপনার কাছে। আমাদের এক্ষুনি তল্লাসী হবে, তল্লাসীর পরে আবার আপনার কাছ থেকে নিয়ে যাব।"

ক্ষুহ্ চলিয়া গেলে কৌতূহলপরবশ হইয়া মোড়কটি খুলিলাম। দেখিলাম, উহার মধ্যে চারটি সোনার গিনি জ্বল্-জ্বল্ করিতেছে। আশ্চর্য্য ! এই জেলখানার মধ্যেও ওদের কাজকর্ম্ম তাহা হইলে থামিয়া নাই, পুরাদমেই চলিতেছে! একঘণ্টা তল্লাসীর পরে কিছু না পাইয়া সিপাইরা যখন ব্যর্থমনোরথ হইয়া ফিরিয়া গেল ঠিক তাহারই খানিকক্ষণ পরে হাসিতে-হাসিতে ক্ষুহ্ আসিয়া হাজির। বলিল—

"বেটাদের সাহস কত! আমার কাছ থেকে গিণি ছিনিয়ে নেবে! আরে, তোরা চলিস্ গাছে-গাছে, আর আমরা চলি পাতায় পাতায়!"

এই বলিয়া ক্ষুহ্ একটু মুখ বিকৃত করিল এবং তাহার পরেই মুখের ভিতর হইতে আরো কি যেন ওর হাতের উপর রাখিল, দেখিলাম, দুইটি সোনার আংটি এবং দুইটি টাকা। হাতটি আমার দিকে বাড়াইয়া ও বলিয়া চলিল, 'খোপরটি আমার কাঁচা-খোপর বাবু, এই জন্যই ভয়, পাকা খোপর হোলে আর ওদের তোয়াক্কাই বা কে করত আর সোনাদানা লুকোবার জন্য এদিক ওদিক ছুটাছুটিই বা কে করত।'

জেলখানার দাগী কয়েদিদের খোপরের বৃত্তান্ত জানা আছে অনেকেরই। মুখের মধ্যে, গ্রীবাদেশের একধারে একটা

ছোট গর্ত্ত ওরা করে। ইহাকেই বলে 'খোপর'। এই খোপরের মধ্যে ওদের সঞ্চিত ধনরত্ন লুক্কায়িত থাকে। কাহার সাধ্য যে তাহা টের পায় আর তাহা বাহির করে? পাকা খোপর যাহারা করে, তাহারা নাকি রীতিমত অস্ত্রোপচারের সাহায্যে তাহা করে, আর কাঁচা যাহারা করে তাহারা কয়েকদিনের চেষ্টায় একটা সীসার গোলাকার পিণ্ড গ্রীবাদেশে কিছুদিন রাখিয়া ঐ গর্ত্তটি করিতে সমর্থ হয়। কাঁচা খোপরের মুস্কিল হইতেছে এই যে, সীসার বিষময় প্রতিক্রিয়ায় (Lead-poisoning) স্বাস্থ্যটি ভাঙ্গিয়া পড়িতে চায়, কিন্তু সে-দিকে নজর দেওয়ার সময় ওদের কই! জেলখানায় কিছু টাকাকড়ি না হইলে যে জীবন-যাত্রাই দুর্ব্বহ হইয়া ওঠে।

ক্ষুহ্র মুখে সব শুনিয়া ওকে বলিলাম,

—'আমাকে দিয়ে দে সব, তোকে আর এসব কিছুই ফিরিয়ে দেব না, দিনের পর দিন মরণের পথ তৈরী করছিস্ তুই।'

ক্ষুহ্র চোখ দুইটি সজল হইয়া আসিল। ওর হাতে যাহা ছিল ধীরে-ধীরে আমার হাতে দিয়া মাটির দিকে চাহিয়া ক্ষুহ্ নীরবে দাঁড়াইয়া রহিল। হয়তো ভাবিল, আমি মরিতে বসিয়াছি তাহাতে অন্যের কি-ই বা আসে যায়? হয়তো বহুদিন পরে স্নেহের একটি পরশ পাইয়া ওর অন্তরের মানুষটি ক্ষণিকের তরে সজাগ হইয়া উঠিল।

কিছুক্ষণ এইভাবে কাটিল। ক্ষুহু একান্ত নীরবে ঐ ভাবে মাটির দিকে মুখ করিয়া দাঁড়াইয়া আছে। ওকে এমন বিচলিত হইতে আর কোনদিন দেখি নাই। ও যেন এ জগতের মানুষই নয়। জেলখানার এই অন্ধকারাচ্ছন্ন পরিবেশ ছাড়াইয়া ক্ষুহু যেন চলিয়া গিয়াছে কোন্ সুদূরে—কোন্ আলোকের দেশে।

'ক্ষুহু',—নাম ধরিয়া ডাকিতে হঠাৎ সে চমকিয়া উঠিল। বলিলাম, 'আজ তোমাকে আমি কিছুতেই ছাড়ব না। বল, কে তোমাকে এই পাপের পথে, এই কলঙ্কের পথে নামিয়েছে। এ পথ ছাড়তে কি তুমি পার না, ক্ষুহু? তোমার বাড়ীঘর নেই? বাড়ীতে বাপ মা নেই? তাঁদের সঙ্গে কি কোন সম্পর্কই তোমার নেই?'

এবার ওর ছুইচোখ বাহিয়া অবিরত ধারায় জল পড়িতে লাগিল। বলিল—

"বাবু, এই নিয়ে আমি সাতবার জেল খাটছি, কৈ এমন করে তো কেউ আমাকে বাড়ীঘরের কথা, বাপ-মায়ের কথা জিজ্ঞেস করেনি, কেউ তো আমার জীবনের কথা কোনদিন জানতে চায়নি। কেনই বা চাইবে? চোরের জীবন, পকেটমারের জীবন আবার একটা জীবন! বাইরে চেনাশোনা লোকের সঙ্গে দেখা হোলে তারা দূরে সরে যায়, ধরা পড়লে কীল-চড়, লাথি-গুঁতো, সকলের লাঞ্ছনা আর সকলের ঘৃণা—এই তো তাদের সম্বল!"

কথাগুলি শুনিয়া অবাক হইয়া গেলাম। মনে হইল এ তো কোন দাগী চোর কিংবা পকেটমারের কথা নয়, এ যে নেহাৎই ভাল মানুষের কথা।

জিজ্ঞাসা করিলাম : 'তবে জেনেশুনে কেন এ পথে তুমি পা বাড়িয়েছ, ক্ষুদু ?"

"সে অনেক কথা বাবু, আপনি তা বুঝবেন না?" এই বলিয়া ক্ষুদু নীরবে, নত মুখে তেমনি দাঁড়াইয়া রহিল। বেশ বুঝিতে পারিলাম, ক্ষুদু আর বেশী কিছু বলিতে চাহে না।

অকস্মাৎ যে আলোর রেখাটি ওর এই অন্ধকারাচ্ছন্ন জীবনে ক্ষণিকের জন্য জ্বলিয়া উঠিতেছিল তাহা যেন নিবিয়া যাইতেছে। কিন্তু এই তো সুযোগ। আর হয়তো এ-মুহূর্ত্ত আসিবে না, ওর অতীত জীবনের কাহিনী আর হয়তো কোনোদিনই শোনা হইবে না।

ধীরে-ধীরে ওর একটি হাত ধরিলাম। ক্ষুদু যেন চমকিয়া উঠিল। বলিলাম, 'এইবার তোমাকে বলতেই হবে, আজ আর তোমাকে কিছুতেই ছাড়ছি নে।'

ক্ষুদু বলিল, 'বলতে পারি, কিন্তু, শুনে আপনার লাভ ?'
ছোট্ট একটি প্রশ্ন। কিন্তু এ প্রশ্নটি সত্যই আমাকে ভাবাইয়া তুলিল। সত্যই তো, একটি পকেট-মারের অতীত জীবনে আমার কি-ই বা লাভ, শুনিয়া কি-ই বা আমি করিতে পারিব ? যাহা ও কোনদিনই বলিতে চায় নাই, যে-জীবনের অন্ধকার

গহ্বরে ও একটু আলোকপাতও করিতে চায় নাই, সে জীবনের কাহিনীতে কি আমার প্রয়োজন ?

ক্ষুদু কিন্তু আমার উত্তরের অপেক্ষা করিল না। বলিয়া চলিল, "রাজশাহী শহরের এক প্রান্তে আমার বাড়ী। ছোটবেলা হইতেই পিতৃহীন আমি। বাড়ীতে মা আছেন, দাদা-বৌদি আছেন; আর আছে ছোট্ট একটি বোন। বাবার একটি ঘোড়ার গাড়ী ছিল। বাবা মরে যাওয়ার পরে দাদাই তা চালাতেন, মাঝে-মাঝে আমিও চালাতাম। গরীবের সংসার, ঐ গাড়ী দিয়েই যা আয় হোত তাতেই আমাদের কোন রকম চলে যেত। দিন এমনি ভাবে কেটে যাচ্ছিল।

একদিন রাত্রিতে ঘুমিয়ে আছি। গভীর রাত্রি, হঠাৎ কানে গেল রহিম যেন আমায় ডাকছে—রহিম আমার ছেলেবেলার বন্ধু। বাইরে এসে দেখি, ওর সঙ্গে নফর এবং নুরুও রয়েছে। ওরা বললে, 'চল্ আমাদের সঙ্গে।' ঘুমের চোখ। ভাল করে ঠিক্ বুঝতে পারলাম না, কোথায় যাচ্ছি, কি করতে যাচ্ছি। কিছুক্ষণ পথ চলার পর দেখতে পেলাম একটা বড় বাড়ীর দোরগোড়ায় ওরা দাঁড়াল।

আমাকে বললে, 'তুই বাইরে দাঁড়া আমরা আসছি। রাস্তায় লোক দেখলেই শিস্ দিবি।' দাঁড়িয়ে রইলাম। ভাবলাম, ওরা কি শেষ পর্য্যন্ত চুরি করতে ঢুকল এই বাড়ীতে ? ওরা চোর ? আর ওদের সঙ্গে আমিও কি চোর বনব ? এই

জেলখানা—কারাগার

ভেবে ওখান থেকে ছুটে পালাতে গেলাম। দেখি সামনেই দুইটি পুলিশ আমার পথ রোধ করে দাঁড়িয়েছে। শেষকালে যা হওয়ার তাই হোল, ঐ বাড়ীতে চুরির দায়ে ধরা পড়ল রহিম, নফর আর নুরু, আর ধরা পড়লাম আমি।

চুরির দায়ে দু'বছর জেল হোল আমার। দু'বছর পর জেল থেকে বেরিয়ে বাড়ীর দোরগোড়ায় যখন এসে দাঁড়ালাম, সাড়া পেয়ে মা ছুটে এলেন, ছুটে এল ছোট বোন্‌টি আমার। আদর যত্ন করে মা বসালেন ভাত খাওয়াতে ; ভাতের থালায় হাত দিয়েছি এমন সময় দাদা ঢুকলেন ঘরে। ঢুকে আমাকে দেখেই একেবারে তেলে-বেগুনে জ্বলে উঠলেন, বললেন, 'ক্ষুদু, বেরিয়ে যাও আমার বাড়ী থেকে, চোরের ঠাঁই নেই আমার বাড়ীতে।'

রাগে-দুঃখে শরীর আমার কাঁপছিল। কানের মধ্যে একটা কথাই শুধু শুনলাম—'আমি চোর, আমি চোর, আমি চোর।'

মনে হোল—দাদা, মা, বোন্ সবাই যেন একসঙ্গে বলছে, 'আমি চোর।' ভাতের থালা রইল পড়ে। মা কান্নাকাটি করলেন, বোন হাত দুটি ধরে বলল, 'দাদা, ভাত খেয়ে যাও।' কিন্তু সে কথা আমার কানে গেল না।

কোন দিকে না চেয়ে সটান এসে দাঁড়ালাম পথে। তখন সন্ধ্যা হয়ে গেছে।

তার পরের ইতিহাস খুবই সংক্ষিপ্ত। চোর যে, সে চুরির ব্যবসাকেই গ্রহণ করলে। এখনও যে ক'দিন বাইরে থাকি

মাঝে-মাঝে হয়তো দেখি, দাদা গাড়ী হাঁকিয়ে যাচ্ছেন, প্রাণটা হু-হু করে ওঠে। রাত্রিতে এক-আধ দিন বাড়ীর পাশ দিয়ে যাই। মনে হয়, হয় তো দেখব দোরগোড়ায় দাঁড়িয়ে আছেন মা, পাশে দাঁড়িয়ে আছে বোন্‌টি আমার। কিন্তু মনের আশা মনেই থাকে, কাউকে কোথাও দেখতে পাইনা।" এই বলিয়া ক্ষুদু থামিল।

কি বলিব ভাবিয়া পাইতেছিলাম না। শুধু মনে হইতেছিল ওর এই জীবনের জন্য কে দায়ী—ক্ষুদু নিজে কতটা এর জন্য দায়ী?

বলিলাম, 'ক্ষুদু, এখনও তো তোমার বয়স বেশি হয় নি, এখনও সময় আছে। তুমি কি পার না এ পথ পরিহার করে সুস্থ মানুষের জীবন যাপন করতে?' ক্ষুদু হাসিল, বলিল, 'আর তা হয় না বাবু, চুরি যে আমার রক্তের সঙ্গে এখন মিশে গেছে। কতবারই তো খালাস পাওয়ার আগে প্রতিজ্ঞা কোরে বেরিয়েছি যে, আর এ কাজ করব না, কিন্তু হাতের কাছেই যখন বড়লোকের একটী পকেট দেখি, হাতটিকে আর সামলে রাখতে পারি না, হাতের আঙ্গুলগুলো বেঁধে রেখেও দেখেছি বাবু, কিছুতেই কিছু হয় না—এ টান যে কি টান তা যে টের না পায় সে বুঝতে পারে না, আপনি কি করে বুঝবেন বাবু?'

সত্যই বুঝিতে পারিলাম না।

কী দুর্নিবার এ আকর্ষণ, যাহার টানে মানুষ বুঝিতে পারে কোথায় সে চলিয়াছে—তবু প্রতিরোধ করিতে পারে না!

তবু বলিলাম, 'একবার আমার কথাটি তুমি রাখ ক্ষুদু, সঙ্কল্প কর যে, আর এ কাজ করবে না।' একান্ত সহজ সুরে ক্ষুদু বলিল, 'আচ্ছা, আপনি যখন বলেছেন তখন আর করব না।' কথাটা বিস্ময়ের হইলেও বিস্মিত হই নাই, কারণ, বুঝিয়াছিলাম এটা শুধু ওর মুখেরই কথা। এ কথার কোন মূল্যই ওর কাছে নাই।

কিছুদিন পরেই ক্ষুদুর মুক্তির দিন আসিল। কয়েদী পোষাক ছাড়িয়া ধুতি-চাদর পরিয়া ক্ষুদু আসিল বিদায় নিতে। বলিলাম, 'প্রতিজ্ঞার কথাটা মনে আছে তো ক্ষুদু?' মৃদু হাসিয়া ক্ষুদু বলিল, 'একবারে তো আর হবে না বাবু, আস্তে-আস্তে হবে। তাই ঠিক করেছি যে, বাইরে গিয়ে আর যাই করি না কেন, আপনার পকেটটি মারব না, এই ভাবে আস্তে আস্তে এগুতে হবে।' ক্ষুদু চলিয়া গেল। কয়েকদিন হইতে বেশ বুঝিতে পারিতেছিলাম মুক্তির দিন যতই ওর কাছে আসিতেছিল সঙ্কল্প-ও ততই ওর শূন্যে বিলীন হইতেছিল। এই ভাবনা নিয়া বেশিদিন কাটাইতে হইল না। মাস দুই পরে একদিন ভোরে দেখি ক্ষুদু আবার আসিয়া হাজির! তেমনি সুস্মিত মুখ, স্নিগ্ধ চাহনি। জিজ্ঞাসা করিলাম, 'কিরে ক্ষুদু, এরই মধ্যে আবার ফিরে এলি?' ক্ষুদু উত্তর দিল, 'কি করি বাবু আপনাদের ছেড়ে বাইরে থাকতে ভাল লাগে না।'

বলিলাম, 'এবার কার পকেট মারলি রে?' ক্ষুদু বলিল, 'জবান ঠিক রেখেছি বাবু, আপনার পকেট মারিনি।'

এগার

বক্‌সার 'ক্ষুত্‌'-র রাজ্য হইতে আবার একবার ফিরিয়া যাওয়া যাক্ অতীতদিনের দেউলীর পরিবেশে।

বক্‌সা ও দেউলী যেন আমাদের জেল-জীবনের দুই সুদূর সীমান্ত ; একদিকে পাহাড়ের পর পাহাড়, পাহাড়ের গায়ে সবুজের স্নিগ্ধ শ্যামলিমা, আকাশ-ভরা মেঘ আর ঘন কুয়াসা, অন্যদিকে শুষ্ক পাণ্ডুর মরুক্ষেত্র, আকাশে নিদাঘের উত্তপ্ত সূর্য্য, পায়ের নীচে রুক্ষ, তৃষাদীর্ণ পৃথিবী। তাই দেউলীর কথা বলিতে গেলেই, চাতকের দৃষ্টি লইয়া মাঝে-মাঝে চাহিয়া থাকিতে ইচ্ছা করে বক্‌সা সীমান্তের স্নিগ্ধসজল পাহাড়ী

ঝর্ণাগুলির দিকে, আকণ্ঠ তৃষ্ণা লইয়া মনটা মাঝে-মাঝে ছুটিয়া যাইতে চায় রামধনু-আঁকা ঐ মেঘের রাজ্যে, সুধা-শ্যামলিম ঐ পাহাড়ের দেশে। তখন বুঝিতে পারি, কোন্ আকুল পিপাসায় অধীর হইয়া মরুভূমির কবি একদিন বলিয়া উঠিয়াছিলেন :

'বন্ধু, চেরাপুঞ্জির থেকে
একখানি মেঘ ধার দিতে পার
গোবি-সাহারার বুকে ?'

দেউলীর সীমাহীন আকাশের দিকে চাহিয়া ঠিক্ এই কথাটিই হয়তো অনেকের মনে হইয়াছিল, আর সঙ্গে-সঙ্গে এ কথাও মনে হইয়াছিল যে, ঐ নিষ্ঠুর আকাশের একপ্রান্তে এক টুকরা মেঘ ধার দিতে পারে এমন বন্ধুও হয়তো আমাদের কেহ নাই।

সত্য কথা বলিতে কি, একটু মেঘের ছায়া, একটু অন্ধকার, আর এক ঝলক বর্ষণের জন্য সমগ্র মনটা কি উন্মুখই না হইয়া থাকিত। কিন্তু কোথায় মেঘ, আর কোথায়ই বা বর্ষণ !

একদিন কিন্তু, সত্য-সত্যই অকস্মাৎ চারিদিক অন্ধকার করিয়া আসিল। দুপুর বেলায়, গরমে যখন সকলে আইঢাই করিতেছে তখন হঠাৎ মনে হইল বাইরের আলো যেন কমিয়া আসিতেছে। ছুটিয়া ঘরের বাহিরে আসিলাম, আকাশে সূর্য্য ম্লান হইয়া আসিয়াছে, বাতাসের বেগ উত্তরোত্তর বৃদ্ধি পাইতেছে, আর বহুদূর হইতে শোঁ-শোঁ করিয়া একটা প্রচণ্ড

গর্জ্জন যেন স্পষ্টতর হইয়া উঠিতেছে। ক্রমে অন্ধকারে দিক্‌ বিদিক ছাইয়া গেল, কাছের মানুষকেও আর তখন দেখা যায় না, ঝড়ের বেগে বাহিরে দাঁড়াইয়া থাকা একপ্রকার অসম্ভব হইয়া উঠিল। ছুটিয়া ঘরের দিকে যাইতে চাহিলাম, কিন্তু কোথায় ঘর? অন্ধকারে তো কিছু দেখা যায়ই না, তা'ছাড়া চোখ খুলিয়া দেখিব সে সাধ্যই বা কই! মাটির উপরেই বসিয়া পড়িলাম। কতক্ষণ এইভাবে কাটিয়াছে ঠিক বুঝিতে পারি নাই; কিন্তু ঝড় যখন থামিল, আকাশে আলো যখন আবার ফুটিল, দেখিলাম জামা-কাপড় হইতে সুরু করিয়া সব কিছুই ধূলায় ধূসর হইয়া গিয়াছে। কাছে যাহাকে দেখি প্রথম দৃষ্টিতে তাহাকে চেনাই মুস্কিল। মাথার চুলে, জামাকাপড়ে, সর্ব্বাঙ্গে, এমন রাশি-রাশি ধূলা জমিয়াছে যে, সে ধূলার যবনিকা ভেদ করিয়া আসল মানুষটিকে দেখাই যায় না। কিন্তু, ধূলা যতই জমুক না কেন, একটা উপকার খুবই হইয়াছিল। ঐ ধূলি-ঝড়ের পরে সেদিনের জন্য আর গরম সহ্য করিতে হয় নাই, সমগ্র পরিবেশটিই বেশ স্নিগ্ধ হইয়া গিয়াছিল।

এই ধূলি-ঝড়কে ও-দেশের লোকে বলে 'আন্ধি'! এই আন্ধির শব্দ বহুদূর হইতেই শোনা যায়। ঐ শব্দ শুনিয়া লোকে বুঝিতে পারে 'আন্ধি' আসিতেছে এবং সেই অনুসারে যে যার সতর্কতা অবলম্বন করে। পথচারী নিকটের কোন আশ্রয়ে আশ্রয় লয়, ঘরের লোক বাহিরে থাকিলে শব্দ শুনিয়া

ঘরে ঢুকিয়া পড়ে এবং ঘরের দরজা বন্ধ করিয়া বসিয়া থাকে। 'আন্ধি' চলিয়া না যাওয়া পর্য্যন্ত ঘরের বাহিরে তাহারা আসে না। কিন্তু আমরা ঠিক তাহার উল্টাটি করিয়া বসিয়াছিলাম। আমাদের ধারণা হইয়াছিল, আকাশে যখন অন্ধকার ঘনীভূত হইয়া আসিল তখন নিশ্চয়ই মেঘ করিয়াছে, একটু পরেই প্রচুর বারিপাত হইবে। কিন্তু, কে জানিত মরুভূমির ধূলির এত শক্তি যে, স্বয়ং মার্ত্তণ্ডদেব-ও তাহার কাছে ম্রিয়মাণ হইয়া পড়েন!

'আন্ধি' তো শেষ হইয়া গেল; কিন্তু আমাদের কাজ বাড়াইয়া দিয়া গেল অনেক। ইহার পর সুরু হইল ডাকাডাকি, হাঁকাহাঁকি। 'হিঁয়া আও, উধর যাও, পানি লাও, ঝাড়ু-লাগাও' ইত্যাদি কলরবে সমস্ত জেলখানাটি মুখর হইয়া উঠিল। কয়েদির দল ছুটাছুটি সুরু করিয়া দিল। সকলেই একসঙ্গে হুকুম করিতেছে, কিন্তু হুকুম তামিল করে কে?

জনকয়েক একটা জায়গায় গোল হইয়া বসিয়াছিলাম। ভালই লাগিতেছিল। হউক ধূলির ঝড়, তবু গরম তো কমিয়াছে। আর তা' ছাড়া একটা নূতন অভিজ্ঞতা হইল জীবনে, যাহা অনেকেরই হয় নাই। গোল হইয়া বসিয়া গল্প করিতেছি। আঁধির সময়ে কে কি করিয়াছেন, কোথায় কি ভাবে কাটিয়াছে এই সব অভিজ্ঞতা বন্ধুরা বর্ণনা করিতেছেন। গল্প বেশ জমিয়া উঠিয়াছে, এমন সময় জেল-গেটে সেন্ট্রির বিপদ

সঙ্কেত 'হুইসিল্' বাজিয়া উঠিল, সঙ্গে-সঙ্গেই সুরু হইল পাগলা-ঘণ্টি!

ব্যাপার কি! কিছুর মধ্যে কিছু না, কোন হাঙ্গামা নাই, কোন গোলমাল নাই, হঠাৎ পাগলা-ঘণ্টি বাজিল কেন? সকলেই উদ্বিগ্ন হইয়া গেটের দিকে চাহিয়া আছি, দেখি কিছুক্ষণ পরেই একদল সশস্ত্র সিপাই, কাহারও হাতে বন্দুক, কাহারও হাতে লাঠি, কাহারও বা হাতে ব্যাটন, জেলের মধ্যে ঢুকিতেছে। স্বয়ং ফিণে সাহেব তাহাদের নেতৃত্ব করিতেছেন। সিপাহীর দল সটান চলিয়া গেল সাধারণ কয়েদি গরাদে। সেখানে কি হইল কে জানে, কিছুক্ষণ পরে যেমন তাহারা আসিয়াছিল তেমনি সটান বাহির হইয়া গেল।

ঘণ্টা থামিয়া গেল। কয়েদিরা যে যার ঘর হইতে বাহির হইয়া পড়িল। তাহাদের মুখে যে বিবরণী শুনিলাম তাহার মর্ম্ম হইতেছে এই যে, ঐ আঁধির ঘনান্ধকারে কেহ জেল হইতে চম্পট দিয়াছে কিনা সিপাইরা এই খোঁজ লইয়া গেলেন। অবশ্য ব্যাপারটি সেদিনও যেমন আমাদের কাছে দুর্ব্বোধ্য ছিল আজ-ও তেমনি রহিয়া গিয়াছে।

কেহ-কেহ অবশ্য বলিলেন, 'ও সব খোঁজটোজ কিছু নয়, আসলে মনে করিয়ে দিয়ে গেল যে, ফিণে সাহেব এখনও জীবিত, তাঁর সিপাই-সান্ত্রীরা এখনও সজাগ, আর তাহাদের হাতের বন্দুক ব্যায়নেট এখনও উদ্যত!'

'আঁধি' চলিয়া গেল, ফিপে সাহেবও তাহার সৈন্যসামন্ত লইয়া চলিয়া গেলেন। এবার উঠিয়া পড়িতে হয়, বিছানাপত্র ঝাড়িয়া-মুছিয়া ঠিক করিতে হইবে তো। উঠিয়া ঘরের মধ্যে গেলাম। দেখি 'বট্টু' ইতিমধ্যেই বিছানাপত্র ঝাড়িয়া-মুছিয়া মোটামুটি ঠিক করিয়া ফেলিয়াছে।

বার

'বট্রু' উত্তর প্রদেশের লোক, সাধারণ কৃষক শ্রেণীর। অত্যন্ত সাদাসিধা গোছের মানুষ—ইংরেজীতে যাকে বলে Simpleton. কঠিন কোন কথা তো বট্রু বোঝেই না, সহজ কথাটাকেও একেবারে জলের মত সোজা করিয়া না বলিলে বট্রু বিপদে পড়িয়া যায়।

সেই দিনও তাহাই হইল। বট্রুকে বলিলাম, 'বট্রু, সবই তো ঠিক করিয়াছ তবে শিয়রের দিকটায় এখনও বিস্তর ধূলা জমিয়া আছে। আজ রাত্রিতে আর কিছু করা যাইবে না ; আজ আমি মাথাটা ঐদিকে দিব আর পা দিব এই দিকে। সেই

ভাবেই বিছানাটা করিয়া রাখিও।' কথাটা ধীরভাবে কয়েকবার আওড়াইয়া লইয়া বট্টু খানিকক্ষণ কি যেন ভাবিল। পরে বলিল, মুহূর্ত্তের মধ্যেই সে সব ঠিক করিয়া ফেলিবে, কোন চিন্তা যেন আমি এ বিষয়ে না করি।

বট্টুর কথায় আশ্বস্ত হইয়া স্নান করিতে গেলাম। স্নান সারিয়া আসিয়া দেখি আমার খাটের সামনে এক বিরাট হৈ-চৈ কাণ্ড! বট্টু অনেক লোকজন জমায়েৎ করিয়াছে, হাত-পা নাড়িয়া কি করিতে হইবে তাহাদের বুঝাইতেছে। বট্টুকে জিজ্ঞাসা করিলাম, "এত লোক কেন ডাকিয়াছ বট্টু? এত হৈচৈ-ই বা কিসের?" উত্তরে ও যা বলিল তাহার মর্ম্মার্থ হইতেছে এই যে, আমি যাহা বলিয়া দিয়াছি তাহা করিতে হইলে খাটটি সম্পূর্ণ ঘুরাইয়া ফেলিতে হইবে এবং আমার এই খাটটি ঘুরাইতে হইলে পাশের আরও তিন-চারিটি খাট সরাইয়া ফেলিতে হইবে, সেই জন্যই এত লোকের দরকার হইয়া পড়িয়াছে!

বুঝিতে বিলম্ব হইল না বট্টুর বিপদ কোন্ খানে!

বলিলাম, "বট্টু, লোকজন তুমি সব বিদায় করিয়া দাও, আমি একাই এ কাজ করিতে পারিব।"

বট্টু তো শুনিয়া অবাক্। ও ভাবিল, বাবু বলে কি? এত লোকের যেখানে প্রয়োজন সেখানে বাবু একাই এ দুঃসাধ্য সাধন করিতে চান! বিস্ময়বিস্ফারিত নেত্রে বট্টু আমার দিকে

চাহিয়া রহিল। নির্ব্বাকনিস্পন্দ হইয়া ও দেখিতে লাগিল আমি কি করিতেছি।

আমি বালিশ ডুইটিকে খাটের অপর প্রান্তে রাখিলাম। বলিলাম, 'এইবার বুঝিয়াছ তো যে, বিছানা ঘুরাইতে হইলে খাটশুদ্ধ ঘুরাইতে হয় না।'

বট্টুর বিস্ময় চরমে উঠিয়াছিল। সে বলিল যে, হ্যাঁ এইবার সে বুঝিতে পারিয়াছে এবং সঙ্গে-সঙ্গে এ কথাও বলিতে ছাড়িল না যে, একমাত্র বাঙালী বাবুরাই এত কঠিন সমস্যার এত সহজ মীমাংসা করিতে পারেন! বাঙালী বাবুদের ঘটে বুদ্ধি অনেক। অন্য দেশের লোক হইলে নাকি খাট না ঘুরাইয়া উপায় ছিল না!

এই বট্টুর সঙ্গে আর একটি লোকের কথা মনে পড়িতেছে, নাম তার পাঁচু। পাঁচু বাঙালী, বট্টুর একেবারে বিপরীতধর্ম্মী, anti-thesis—অনেকবার জেলে আসিয়াছে এবং আরও অনেকবার যে আসিবে, এ সম্পর্কে আমরা নিশ্চিন্ত ছিলাম।

পাঁচুর একটা মস্ত গুণ ছিল এই যে, সব সমাজে পাঁচু মানাইয়া চলিতে পারিত। ডেটিনিউদের গানের আসরে পাঁচু তবলা বাজাইত, খেলার মাঠে পাঁচু খেলার সাজসরঞ্জামের তত্ত্বতল্লাসী করিত আবার অবসর সময়ে লেখাপড়া-ও কিছু করিয়া লইত।

ডেটিনিউদের মধ্যে যাঁহারা 'কমিউনিষ্ট'-পন্থী তাঁহারাই সাধারণ কয়েদিদের পড়াশুনায় মনোযোগ দিতেন বেশি। অবশ্য

কারণও একটা ছিল। কারণটা হইতেছে এই যে, বাহিরে গিয়া ইহাদের 'mass contact' বা সাধারণ লোকজনের মধ্যে কাজকর্ম্ম করিতে হইবে। জেলখানায় যদি ইহার মহড়া না দেওয়া যায় তাহা হইলে চলিবে কেন? জেলখানার 'mass' হইতেছে এই সাধারণ কয়েদি মহল, তাই তাহাদের সঙ্গে যোগা-যোগ রক্ষা করিয়াই বাহিরের 'mass contact' কর্ম্মসূচীর কিছুটা তাঁহারা ভিতরেও কাজে পরিণত করিতে চেষ্টা করিতেন। সার্থক কতটা হইতেন বলিতে পারি না; কিন্তু চেষ্টার অন্ত ছিল না।

শ্রীযুক্ত মনোরঞ্জন রায় ওরফে কেবল রায় হয়তো ঐ উদ্দেশ্য লইয়াই দেউলীতে mass contact সুরু করিয়া দেন। যে কয়জন কয়েদিকে তিনি লেখাপড়া শিখাইতেন পাঁচু তাহাদের অন্যতম। পাঁচুকে লেখাপড়া শিখাইবার একটা সুবিধাও এই ছিল যে, পাঁচু নীরেট মূর্খ নহে, চতুর্থ শ্রেণী পর্য্যন্ত সে পড়িয়াছে। ইংরেজী লিখিতে না পারিলেও দুই চারিটা বলিতে পারে, তাহা ছাড়া বিষয়বস্তু যত কঠিনই হউক না কেন, চট্ করিয়া তাহা বুঝিয়া ফেলিতে পারে। কেবলবাবু বলিয়াছেন, এ পর্য্যন্ত যত কয়েদিকে তিনি পড়াইয়াছেন তাহাদের মধ্যে পাঁচুই একমাত্র লোক যাহার ধৈর্য্যও যেমন অবিচল, নিষ্ঠাও তেমনি প্রগাঢ়। প্রতি দিনই সন্ধ্যার পরে পাঁচু হাতমুখ ধুইয়া নিয়মিতভাবে কেবল বাবুর ঘরে উপস্থিত হইত এবং ঘণ্টা দুই সেখানে পাঠ গ্রহণ করিয়া তবে অন্য কাজে যাইত—এমনি পাঁচুর আগ্রহ।

পাঁচুর বিদ্যার্জ্জন যে দিনের পর দিন উন্নতির দিকে চলিয়াছে তাহার পরিচয়ও তাহার কথাবার্ত্তায়, বিশেষ করিয়া নানা রকম আলাপ-আলোচনায় ধরা পড়িত। এই জন্য সাধারণ কয়েদি মহলে পাঁচুর প্রতিপত্তিও বড় কম ছিল না। হারাণ তো একদিন বলিয়াই ফেলিল যে, 'পাঁচুর পেটে যা বিদ্যে বাবু, বাইরে থাকলে এ্যাদ্দিনে ও দু'তিনটে পাশ দিয়ে ফেলত।'

রোজকার মত সেদিনও পড়াশুনা করিয়া পাঁচু গারদে ফিরিতেছিল। হঠাৎ পথে ফণীবাবুর সঙ্গে দেখা। ফণীবাবু জিজ্ঞাসা করিলেন, 'কি রে পাঁচু, আজ যে বড় তবলা বাজাতে গেলি নে ?'

পাঁচু বলিল, 'আজ বড্ড দেরি হোয়ে গেল, Class Struggle (ক্লাস ষ্ট্রাগ্‌ল্) পড়ছিলাম কি না বাবু।'

'Class struggle ?'—সবিস্ময়ে ফণীবাবু জিজ্ঞাসা করিলেন। 'বুঝলি কিছু class-struggle-এর।'

পাঁচু একটু মুচকি হাসিল, বলিল, 'তা' কি আর বুঝি না বাবু, Class VI থেকে Class VII-এ উঠতে আমার চার বছর লেগেছে—আমি class struggle বুঝব না তো কে বুঝবে বাবু!"

তের

পাঁচুর সঙ্গে আরো এক জনের কথা মনে পড়ে। নাম তাহার দেবেন। দেবেনের মেয়াদ ছিল দীর্ঘ দিনের। কলিকাতায় দক্ষিণেশ্বরের কালী বাড়ী হইতে গহনা চুরির দায়ে দেবেন ধরা পড়ে। সে-সময় এ চুরির ব্যাপার লইয়া নাকি কলিকাতা সহরে একটা ভীষণ হৈ-চৈ পড়িয়া যায়। একে তো বহু টাকার গহনা-চুরি, তাহাতে আবার দেবীর দেহ হইতে।

ভারতবর্ষ ধর্ম্মের দেশ। এখানকার চোর-ডাকাত যাঁহারা, তাহারা চুরি কিংবা ডাকাতি করিলেও স্বয়ং দেবীর দেহ হইতে অলঙ্কার ছিনাইয়া লইবে, এত বড় একটা পাপ কাজ করিতে পারে

ইহা ছিল সকলের কল্পনারও অতীত। দেবেন কিন্তু তাহাই করিয়া বসিল। সুতরাং সকলেই সেদিন ভাবিয়াছিলেন, এত বড় দুঃসাহসিক কাজ যে করিয়া বসিতে পারে সে আর যাহাই হউক সাধারণ চোর নয়। সেই দেবেন যেদিন সত্যসত্যই দেউলী আসিয়া হাজির হইল তাহাকে দেখিবার জন্য, তাহার কাহিনী শুনিবার জন্য রীতিমত ভিড় জমিয়া গেল।

দেবেনের চেহারাটিও ছিল যেমন ভারিক্কি, কথাবার্তা, ধরণ-ধারণও ছিল তেমনি একটু ভারিক্কি চালের। কয়েদি মহলে সহজেই দেবেন নিজস্ব একটু জায়গা করিয়া লইল।

একমাত্র হারাণই তাহাকে দেখিতে পারিত না, বলিত, "ও আবার একটা মানুষ? জাগ্রত কালীমায়ের গা থেকে যে গহনা চুরি করে তার মত পাপী আর দুনিয়ায় দু'টো আছে? ও যদি মানুষ হোত তা হোলে এতদিনে ও গলায় দড়ি দিয়ে মরত।" গলায় দড়ি দেওয়া তো দূরের কথা, দেবেন দিব্যি বাঁচিয়া রহিল এবং কয়েদি মহলে বেশ প্রতিপত্তির সহিতই দিন কাটাইতে লাগিল।

দেবেন সম্পর্কে ডেটিনিউদের উৎসাহ ও কৌতূহল দু'চার-দিনের মধ্যে শেষ হইয়া গেলেও পাচুর মত দেবেনও 'কমিউনিষ্ট' বন্ধুদের দৃষ্টি সহজেই আকর্ষণ করিল। পাঁচু করিয়াছিল তাহার বুদ্ধিমত্তার প্রাচুর্য্যে, আর দেবেন করিল তাহার 'ঐতিহ্যে'র ঐশ্বর্য্যে। দেবীর দেহ যাহার কাছে মানুষের দেহের বেশী মূল্য বহন করে না, স্বভাবতই সে জড়বাদী—*Materialist*

ঈশ্বরে সে বিশ্বাস করে না। কমিউনিজমের দর্শন-ও নিরীশ্বর-বাদী, সুতরাং সেই দিক দিয়া দেখিতে গেলে সাধারণ কয়েদিদের মধ্যে দেবেনের মত আর কে আছে যার উপর কমিউনিজমের ইমারৎ অতি সহজেই তৈরী করা যায়। 'মেটিরিয়লিষ্ট' তো সে আছেই, এখন একটু ঘষিয়া-মাজিয়া 'ডায়েলেকটিক'-এর কোঠায় তাহাকে আনিতে পারিলেই হয়!

দেবেন তাই পাঁচুর মত লেখাপড়া সুরু করিয়া দিল বটে, কিন্তু, তেমন আগাইতে পারিল না। বাহিরে যে বিপুল অর্থ সে নানাস্থানে লুকাইয়া রাখিয়া আসিয়াছে তাহার চিন্তাই তাহার সমগ্র মনটিকে ঘিরিয়া থাকিত।

একদিন পাঁচুকে সে ডাকিয়া বলিল, 'দেখ পাঁচু, লেখাপড়া করতে তো ভালই লাগে, কিন্তু বাবুদের কথাগুলি যেন ঠিক ধরতে পারি নে। আর তা ছাড়া—' এই বলিয়া দেবেন একটু ইতস্তত করিতে লাগিল।

পাঁচু বলিল, 'তা ছাড়া কি—কথাটা খুলেই বল না।'
'ওরা যে বলেন', দেবেন ধীরে-ধীরে বলিয়া চলিল, 'বড় লোকের গচ্ছিত টাকা গরীবদের মধ্যে বিলিয়ে দিতে হবে, তা হোলে আমারও কি—' দেবেন কথাটা শেষ করিতে পারিল না। কথার মাঝখানেই পাঁচু বলিয়া উঠিল, "ও তুমি বুঝি ভাবছ তোমার জমানো টাকা তোমার হাতেই থাকবে, শুধু অন্যের জমানো টাকা সম্পর্কেই কেবল ভাগ-বাঁটোয়ারার ব্যবস্থা হবে, তা মনে করো না দেবেন দা'—

দেবেনের মুখখানি কালো হইয়া গেল। সত্যই এবার সে একটু ভাবনায় পড়িল। কথার মোড়টা ঘুরাইয়া দেওয়ায় উদ্দেশ্যে দেবেন প্রশ্ন করিল, 'আচ্ছা, খুব সোজা করে এক কথায় আমাকে বুঝিয়ে দিতে পার, 'কমিউনিজম' ব্যাপারটা কি?' "কেন পারব না, খুব পারি"—বলিল পাঁচু, "একটা দৃষ্টান্ত দিলেই সহজে তুমি বুঝতে পারবে। এই জেলখানার কথাই ধর না কেন, এখানে ফিণে সাহেব তো ধরতে গেলে একরকম হর্ত্তা-কর্ত্তা, কিন্তু, আমাদের মধ্যে আর ওঁর মধ্যে কত তফাৎ। কমিউনিষ্ট সমাজে সেটি হবার জো নেই। সেখানে ফিণে সাহেবকে যেমন আমি সিগারেট ধরিয়ে দেব আবার তেমনি ফিণে সাহেবও আমাকে সিগারেট ধরিয়ে দেবেন—সোজা কথায় এই হোল 'কমিউনিজম'।

দেবেন এইবার ঘাড় নাড়িয়া সায় দিল। মনে হইল কথাটা তাহার কাছে জলের মত স্পষ্ট হইয়া গিয়াছে, কিন্তু, তবু সেই বাহিরের টাকাটার কথা যেন দেবেন কিছুতেই ভুলিতে পারে না এবং সেই জন্যই এই কমিউনিজমকে দেবেন যুক্তি দিয়া গ্রহণ করিলেও, সমগ্র মন দিয়া কিছুতেই গ্রহণ করিতে পারে নাই।

তাই পাঁচু ও দেবেনের মধ্যে পাঁচুই শেষ পর্য্যন্ত কমিউনিষ্টদের প্রিয়পাত্র হইয়া রহিল, দেবেন যত তাড়াতাড়ি কমিউনিষ্টদের কাছে আসিয়াছিল তত তাড়াতাড়িই তাঁহাদের কাছ হইতে দূরে সরিয়া গেল।

চৌদ্দ

দেউলী জেলের সাধারণ কয়েদিদের মধ্যে আরো একটি জিনিষ লক্ষ্য করিয়াছিলাম তাহা হইতেছে, বাঙালী অ-বাঙালী সমস্যা। আমাদের রাজনৈতিক জীবনে যেমনি, ঠিক কয়েদিদের মধ্যেও সেদিন দেখিয়াছিলাম, অ-বাঙালী কয়েদিদের মধ্যে বাঙালী-বিরোধিতাটা বেশ ছিল। অবশ্য তাহার কারণও একটা ছিল। সে-অঞ্চলটা বাঙালীর নয়, ওদেরই। তাহা ছাড়া কয়েদিদের মধ্যে শতকরা ৭০ জনই ছিল অ-বাঙালী। এ হেন অবস্থায় বাঙালীদের আধিপত্য তাহারা স্বীকার করিতে যাইবে কেন?

বাংলাদেশ হইতে যে সব কয়েদি দেউলী জেলে গিয়াছিল তাহাদের মধ্যে কয়েকজন ছিল বেশ ডানপিটে। ওরা এই সমস্যা সমাধানের একটা সহজ পথ আবিষ্কার করিয়া ফেলিল। অ-বাঙালীদের সঙ্গে সামান্য একটু ঝগড়াঝাঁটি বাঁধিলেই বাঙালী কয়েদিরা প্রথমেই মারধর সুরু করিয়া দিত। সুধন্য, বাদল, রহমৎ প্রভৃতি ছিল এই 'মারদাঙ্গা' দলের পাণ্ডা। তিন চারিটি মাথা ফাটাফাটি হইয়া গেল। বিচারে দোষী-নির্দ্দোষ অনেকেরই সাজাও হইয়া গেল!

এই ব্যাপার লইয়া একদিন সুধন্যের সঙ্গে কথা বলিতেছিলাম। ওকে জিজ্ঞাসা করিলাম, 'বিদেশ বিভূঁয়ে এসেই একেবারে মারধর সুরু কোরে দিয়েছিস কেন তোরা? অল্প কয়েকজন তোরা আছিস, একেবারে মেরে তুঁড়িয়ে ফেলবে যে রে তোদের।'

সুধন্য একটু মুচকি হাসিল, বলিল, "ভুল বলছেন বাবু, এইটেই তো আমাদের বাঁচবার পথ। প্রথম থেকেই যদি কারণে-অকারণে মারধর কোরে ওদের মনে ভয় ঢুকিয়ে দিতে না পারি তা হোলে ওরা আমাদের তোয়াক্কাই করবে না! একেই তো ওদের ধারণা যে, বাঙ্গালীরা দুর্ব্বল, তার উপর আমরা যদি প্রথম থেকেই নরম সুরে কথা কই, ওদের জোর-জুলুমের কাছে কি আর দাঁড়াতে পারব?"

পরে দেখিয়াছি সুধন্যের কথাই সত্য। কয়েকটি রক্তাক্ত

ঘটনার পর সুধন্য, বাদল প্রভৃতি কয়েকজনকে সত্যই ওরা সমীহ করিয়া চলিত।

কয়েদিদের বাঙালী-অবাঙালী সমস্যার ঢেউ আমাদের গায়েও লাগিয়াছিল—অবশ্য একটু অন্যভাবে। বাঙালী কয়েদিদের আমরা একটু বেশি খোঁজ-খবর করিতাম। কিন্তু, ইহার কারণ এই নয় যে, অবাঙালীদের আমরা পছন্দ করিতাম না।

অন্যান্য প্রদেশের কয়েদিদের লইয়া মুস্কিল হইত এই যে, হিন্দীভাষা না জানায় ওদেরকে কোন কথা বুঝাইতে আমাদের গলদঘর্ম্ম হইয়া যাইতে হইত। আগে বুঝানো, তার পরে তো কাজ! কিন্তু সব কথা বুঝানো যায় এমন সাধ্য কার? হিন্দী কথার মধ্যে আমাদের তো সম্বল মাত্র 'হিঁয়া-হুয়া, ইধর-উধর, হ্যায়, থা'--ইত্যাদি। এই কয়টি শব্দের ভাণ্ডার লইয়া একেবারে আনকোরা হিন্দী ভাষাভাষীদের সঙ্গে আঁটিয়া ওঠা কি সহজ ব্যাপার? তাই যতটা সম্ভব বাঙালীদের দিয়াই আমরা আমাদের কাজকর্ম্ম চালাইয়া লইতাম। ইহাতে বাঙালীরাও আমাদের উপর বিরক্ত হইত, অ-বাঙালীরাও হইত। বাঙালী কয়েদিরা বিরক্ত হইত, কেন না খাটুনী তাহাদের অনেক বেশি করিতে হইত, অবাঙালীরা বিরক্ত হইত, কারণ, তাহারা ভাবিত বাঙালীদের বুঝি আমরা বেশি ভালবাসি! আমরা যে কি দায়ে পড়িয়া যে তাহাদের এত ভালবাসিতাম তাহা তাহারা বুঝিবে কেমন করিয়া?

কিন্তু, তবু আমাদের চেষ্টার ত্রুটি ছিল না। এই ভাষা-বিভ্রাট হইতে রেহাই পাওয়ার জন্য একদল তো কোমর বাঁধিয়া হিন্দী-পাঠ সুরু করিয়াই দিলেন। এই দলের অগ্রণী ছিলেন শ্রীযুক্ত সুধাংশু অধিকারী। সুধাংশু বাবু এক-আধটু হিন্দী আগেই শিখিয়াছিলেন, দেউলীতে আসিয়া তিনিই প্রথম এই পথে পা বাড়াইলেন এবং অল্প কয়েকদিনের মধ্যেই 'হিন্দী কা তিসরী কেতাব' শেষ করিয়া ফেলিলেন। আমরা কিন্তু তখনও 'পহেলা কেতাব' লইয়াই নাড়াচাড়া করিতেছি। সুতরাং 'হিন্দীবাৎ' সম্পর্কে কোন কিছু বিপদ বাঁধিলেই একেবারে 'হিন্দী কা তিসরী কেতাব' সুধাংশু বাবুর কাছে গিয়া হাজির হইতাম। সুধাংশু বাবু সমস্যার মীমাংসা করিয়া দিতেন। সেই সুধাংশু বাবুও একদিন কি রকম বিপদে পড়িয়াছিলেন শুনুন:

'কণ্ট্রাক্টর' জেলগেটে আসিয়াছেন। সুধাংশু বাবুর ডাক পড়িল। কণ্ট্রাক্টরটি আসিয়াছেন বালিসের অর্ডার নেওয়ার জন্য। সুধাংশু বাবুর কিছু তূলার প্রয়োজন। সুধাংশুবাবু কণ্ট্রাক্টরকে নির্ব্বিবাদে বলিলেন, 'কুছ্ তুল্লি দেনা পরেগা।' মালপত্রের বাক্স কণ্ট্রাক্টারের সঙ্গেই ছিল, বাক্স হইতে বাহির করিয়া সুন্দর একটি তুলি সুধাংশু বাবুর দিকে তিনি আগাইয়া দিলেন। সুধাংশুবাবু বলিলেন 'নেই নেই, ই-নেই, তুল্লি, তুল্লা'—বিপদে পড়িয়া 'তুল্লিকে' 'তুল্লা' করিলেন কিন্তু কোন ফলই হইল না! জিজ্ঞাসুনয়নে কণ্ট্রাক্টার মহোদয় ওর মুখের দিকে চাহিয়া রহিলেন। সুধাংশু বাবুরও বিশেষ দোষ নাই। 'হিন্দীকা তিসরি কেতাব' তিনি শেষ

করিয়াছেন সত্য কথাই, কিন্তু, তূলার হিন্দি-সংস্করণ যে কি তাহা তো সেই কেতাবে তিনি পান নাই! তাই নানাভাবে বুঝাইতে চেষ্টা করিতে লাগিলেন। 'তুল্লি' ও 'তুল্লা'-য় যখন কিছু হইল না, তখন বলিলেন, 'মানে, বালিশকা তুল্লা।' কন্ট্রাক্টর এবার আরো মুস্কিলে পড়িলেন। এ পর্য্যন্ত একটি শব্দ তাহার অজ্ঞাত ছিল; এবার হইল দুইটি। কিন্তু, সুধাংশু বাবুও ছাড়িবার পাত্র নহেন। 'হিন্দিকা তিসরি কেতাব' যিনি শেষ করিয়াছেন এই সামান্য ব্যাপারে তিনি হার মানিতে যাইবেন কেন! তাই এবার আরো পরিষ্কার করিবার উদ্দেশ্যে বলিলেন,—'শিয়রকা বালিশকা তুল্লি।'

একের পর এক, তিনটি দুর্ব্বোধ্য শব্দের সম্মুখে দাঁড়াইয়া কন্ট্রাক্টার বেচারা মহা ফাঁপরে পড়িলেন। এমনিভাবে সুধাংশু বাবু যত বুঝাইতে চান কন্ট্রাক্টার তত বিপদে পড়েন। সুধাংশুবাবু দেখিলেন মুখের কথা দিয়া আর বুঝানো যাইবে না; এবার ভাব ভঙ্গীর আশ্রয় লইতেহইবে। সম্মুখে একটি খাট ছিল সেই খাটের উপর একটী কয়েদিকে শোয়াইয়া দিলেন এবং মাথার নীচে হাত দিয়া কোনক্রমে 'বালিশ' পর্য্যন্ত বুঝাইতে সমর্থ হইলেন এবং তাহারও পরে অনেকক্ষণ হাত-পা নাড়িয়া বালিশের মধ্যকার তূলায় কোনক্রমে পৌঁছিলেন। কন্ট্রাক্টার সঙ্গে-সঙ্গে সোল্লাসে লাফাইয়া উঠিয়া বলিলেন, 'ও, রুই মাঙ্গতেহে আপ্। ওহি বলিয়ে।'

সুধাংশুবাবু সে-যাত্রা বাঁচিয়া গেলেন বটে, কিন্তু বড় মেহনৎ করিয়া বাঁচিলেন!

পনর

ঐ ঘটনা লইয়া ক্যাম্পের মধ্যে হৈ-চৈ পড়িয়া গেল; সান্ধ্য-বৈঠকে বন্ধু-বান্ধবদের মধ্যে রসাল সব আলোচনা সুরু হইল। বন্ধুদের অতীত জীবনে এমনতর ভাষা-বিভ্রাট কোথায় এবং কি ভাবে কাহার জীবনে কতবার আসিয়াছে তাহার বর্ণনা একে-একে অনেকেই দিতে সুরু করিলেন।

কোহিনূরবাবু বলিলেন, 'এ আর কি বিপদ, মাদ্রাজে আমি যা বিপদে পড়েছিলাম তা আরো সাংঘাতিক।' কোহিনূর বাবুর সাঙ্ঘাতিক অভিজ্ঞতা জানিবার জন্য সকলেই উৎকর্ণ হইয়া রহিলেন। একটু দম লইয়া কোহিনূরবাবু বলিতে সুরু করিলেন, 'ধরা পড়বার

কিছুদিন আগে আমি এবং আমার এক বন্ধু গিয়াছিলাম মাদ্রাজ পরিভ্রমণে। মাদ্রাজে গিয়া প্রথমেই বুঝিতে পারিলাম যে অন্যান্য প্রদেশে যেমন ভাঙ্গা-ভাঙ্গা হিন্দি বলিয়া অনেক বিপদ হইতে উদ্ধার পাইয়াছি এখানে তাহা হইবে না। শিক্ষিত মহলে অবশ্য ইংরেজীর চলন খুব বেশি, কিন্তু, সাধারণ অশিক্ষিতদের মধ্যে হাত-পা ছোড়াছুড়ি করা ছাড়া কোন উপায়ই নাই।

একদিন হইয়াছে কি, দুই বন্ধুতে বাহির হইয়াছি একটু দুধের খোঁজে। কিছুতেই কাহাকেও বুঝাইতে পারি না যে, আমরা কি চাহিতেছি। সাদা জিনিষ কত দেখাইলাম, সাদা দালান হইতে সুরু করিয়া পানের দোকানের চূণ পর্য্যন্ত কিছু বাদ দিলাম না। ইহাতেও ব্যর্থমনোরথ হইয়া কলের জল ও সাদা জিনিষ একই সঙ্গে দেখাইতে চেষ্টা করিলাম, কিন্তু, কিছুতেই কিছু হইল না। অবশেষে অনন্যোপায় হইয়া শেষ পন্থা অবলম্বন করিলাম। বন্ধুটিকে বলিলাম, তুই হাত দুইটা মাটিতে ঠেকাইয়া চতুষ্পদ গরুর ভঙ্গি কর আর আমি তারই নীচে হাঁটু গাড়িয়া করি গোয়ালার ভঙ্গি! অগত্যা তাহাই করিতে হইল। ইহার পরে মাদ্রাজে আর একদিনও থাকি নাই।'

ভাষাবিভ্রাট শুধু ভাব-প্রকাশের দিক দিয়াই নয়, মানুষের জীবন পর্য্যন্ত যে বিপন্ন করিয়া তুলিতে পারে তাহার একাধিক অভিজ্ঞতা জেল-জীবনে আমাদের ঘটিয়াছে। খেলার মাঠে,

খাওয়ার ঘরে, শুইবার জায়গায় ভাষা-বিভ্রাট সংক্রান্ত দু-চারটি ঘটনা প্রায় রোজই ঘটিত। ভাবনা সেজন্য ছিল না, ভাবনা হইত এমন এক-একটি ব্যাপারে যেখানে আমাদের জীবন পর্য্যন্ত বিপন্ন হইয়া উঠিত।

একরাত্রে খাওয়ার ঘরে এমনি একটা ঘটনা ঘটিয়াছিল। সেদিন আহার্য্য পরিবেশন করিতেছিল দুইজন হিন্দুস্থানী কয়েদি। ভাত-ডাল দেওয়ার পরে যখন তরকারী দেওয়ার পালা আসিল, জনৈক ভোজনরত বন্ধু হাঁকিয়া বলিলেন, "বট্টু দু'-চারঠো ডাণ্ডা লাগাও।" তরকারীর বালতি লইয়া বট্টু ফ্যাল ফ্যাল করিয়া চাহিয়া রহিল, 'ভাবিল, বাবু বলে কি!' কিন্তু বাবু সহজে ছাড়িতে চাহিবেন কেন? অনেকদিন রোগে ভুগিয়া বহুকাল পরে তিনি খাওয়ার ঘরে আসিয়াছেন। আসিয়াই দেখেন, সুন্দর ডাঁটাচচ্চরী রান্না হইয়াছে। ডাঁটার লোভে এতদিনের রোগক্লিষ্ট জিহ্বা তাঁহার সজল হইয়া উঠিল, চট্ করিয়া হাঁকিয়া বলিলেন, 'দু-চারঠো ডাণ্ডা লাগাও।"

বন্ধুটি তো অকপটে 'হিন্দী বাৎ' বলিতে গিয়া ডাঁটাকে 'ডাণ্ডা' বলিয়া ফেলিলেন, কিন্তু, বট্টু বেচারী এদিকে একেবারে থ' খাইয়া গেল। বাবুকে 'ডাণ্ডা' লাগাইবে, কথাটা নিজের কাণে শুনিয়াও সে বিশ্বাস করিতে পারিতেছিল না, তাই কিংকর্ত্তব্য-বিমূঢ় হইয়া সে দাঁড়াইয়াই রহিল। চারিদিকে হাসির রোল পড়িয়া গেল। বন্ধুটি-ও হতবাক্ হইয়া রহিলেন। কি যে

তাঁহার ত্রুটি, আকাশ-পাতাল ভাবিয়াও তিনি তাহা আবিষ্কার করিতে পারিলেন না। এদিকে চারিধার হইতে রব উঠিতে লাগিল—'জলদি বাবুকো ডাণ্ডা লাগাও!'

বট্টু অবশ্য বন্ধুটির কথামত কাজ করে নাই, কিন্তু, তিলকের মত কয়েদি হইলে রীতিমত ফ্যাসাদ বাঁধিয়া যাইত। তিলক ছিল ডেটিনিউ বাবুদের একান্ত আজ্ঞাবহ। কথাটি বলা মাত্র সে তাহা কার্য্যে পরিণত করিয়া ফেলিত। তাহার নিয়মানুবর্ত্তিতার একটি দৃষ্টান্ত হইতেই তিলকের চরিত্রটি পরিষ্কার বুঝা যাইবে।

দেউলী জেলে আসিবার পূর্ব্বে তিলক ছিল নেহাৎই দেহাতি। গ্রামের নিরীহ লোক, গ্রামের বাহিরে বড় একটা যায় নাই। দেউলী দর্শনই জীবনে তাহার প্রথম নূতন দেশ দর্শন। তাই দেউলীতে আসিয়া ডেটিনিউদের চাল-চলন, হাবভাব দেখিয়া প্রথমটায় সে রীতিমত ভড়কাইয়া গেল। স্থির করিয়া ফেলিল, নিজের বুদ্ধি খাটাইয়া কিছু এখানে করিতে গেলে কি-সে কি হইয়া যাইবে ঠিক নাই, তাই বাবুরা যাহা বলিবেন অক্ষরে-অক্ষরে সে তাহা প্রতিপালন করিয়া যাইবে। তিলক প্রথমটায় জেলের বাইরের কাজে লাগিয়া গেল। বাইরের কাজ যতদিন করিল নিশ্চিন্তেই করিল, কারণ সেখানে অন্য কাহারও সংস্পর্শে তাহাকে আসিতে হইত না। কিন্তু বিপদ বাঁধিল সেইদিন, যেদিন 'কিচেন' ম্যানেজার তিলককে ডাকিয়া পাঠাইলেন। ম্যানেজার বাবু তিলককে

যাহা বলিলেন তাহার মর্ম্ম হইতেছে এই যে, ঘরের কাজে নিয়োজিত একটি কয়েদি অসুস্থ হইয়া পড়ায় কয়েকদিন উক্ত কয়েদির বদলে তাহাকে কাজ করিতে হইবে। কাজের ফিরিস্তিও পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে তিলককে তিনি বুঝাইয়া দিলেন। তিলক সব কথাই বুঝিল বটে, কিন্তু কাজ সুরু করিতে গিয়াই বিপদে পড়িয়া গেল।

দিনের প্রথম কাজই হইল: যে সব ডেটিনিউরা 'বেড্-টি'তে অভ্যস্ত, রাত্রি ভোর হইতে না হইতেই তাঁহাদের চা-পানের ব্যবস্থা করা। অন্যান্য কয়েদিদের সঙ্গে কেটলী ভরিয়া তিলকও চা লইয়া আসিল। আসিয়া দেখে বাবুরা সবাই তখনও ঘুমাইতেছেন। কিন্তু ঘুমাইলে কি হইবে, ম্যানেজার বাবু বলিয়া দিয়াছেন; সুতরাং চা খাওয়াইতেই হইবে। তিলক ছাড়িবার পাত্র নয়, সে কাজে লাগিয়া গেল। চা সে কোনদিন খায়ও নাই, কাহাকে এ পর্য্যন্ত খাওয়ায়ও নাই। তাই কি করিবে প্রথমটা কিছুই ঠাহর করিতে পারিল না।

বাবুরা তখনও ঘুমে, তাই জিজ্ঞাসা করিবারও উপায় নাই। কিন্তু, আর তো দেরি করা যায় না। তিলক আর উপায়ান্তর না দেখিয়া সম্মুখে যিনি নিদ্রিত ছিলেন কেটলিটি লইয়া তাঁহার কাছে গিয়া দাঁড়াইল, তাহার পরে কেটলীর নলটি তাঁহার মুখে ঢুকাইয়া চা ঢালিতে উদ্যত হইল! চা আর ঢালিতে হইল না—গরম নল মুখে লাগিবা মাত্র ভদ্রলোক চিৎকার করিয়া

উঠিলেন। তিলক কিন্তু তখনও নির্ব্বিকার! গম্ভীর স্বরে সে শুধু বলিল, "লেও বাবু, চা পিও।" এমনি ছিল তিলকের চরিত্র!

তাই বলিতেছিলাম, সেদিন সেই 'ডাণ্ডা লাগাও'-এর বৈঠকে যদি বট্টু না থাকিয়া তিলক থাকিত তাহা হইলে ঐ 'হিন্দী বাৎ'-এর অর্থ সেদিন সংশ্লিষ্ট বন্ধুটির কাছে পরিষ্কার হইয়া যাইত! কিন্তু, তবু এ কথা স্বীকার করিতেই হইবে যে, হিন্দী ভাষার দৌলতেই হউক অথবা আমাদের বরাতের জোরেই হউক বিপদটা দুয়ার পর্য্যন্ত আসিয়াই প্রতিবার ফিরিয়া-ফিরিয়া গিয়াছে, একেবারে ভিতর পর্য্যন্ত একবারও পৌঁছাইতে পারে নাই।

এ প্রসঙ্গ শেষ করিবার আগে সংশ্লিষ্ট আর একটি ঘটনার কথা কিছুতেই ভুলিতে পারিতেছি না। তাহা ঠিক হিন্দী ভাষাবিভ্রাট ঘটিত নয়, হিন্দী শিক্ষার অত্যুগ্র উৎসাহজনিত। ঘটনাটি ১৯৪৩-এর বক্সা জেলের। জেল-জীবনে একটা জিনিষ বরাবরই লক্ষ্য করিয়াছি যে, মাঝে-মাঝে কিসের যেন একটা স্রোত আচমকা আসিয়া পড়ে। কেন আসিল, কোথা হইতে আসিল তাহা খতাইয়া সেদিন বড় একটা দেখি নাই তবে আসে যে—এ কথাটা ঠিক। জেলখানার এই স্বাভাবিক গতিপথেই সেদিন আসিল বক্সা জেলে হিন্দী শিক্ষার স্রোত। অকস্মাৎ দেখা গেল হিন্দী বই প্রচুর আসিতেছে এবং সকাল সন্ধ্যায় বন্ধুর দল তারস্বরে হিন্দী পাঠ সুরু করিয়া দিয়াছেন!

এই হিন্দী-পাঠের প্রবল স্রোতে সেদিন যে দুইটি বন্ধু গা ভাসাইয়া দিয়াছিলেন তাঁহাদের নাম শ্রীযুক্ত নলিনী গুহ এবং শ্রীযুক্ত সুধীর নন্দী। এই বন্ধু দুইটিকে বহুদিন হইতেই চিনি। দেখিয়াছি, অন্য অনেকগুণের মধ্যে যে গুণটি তাঁহাদের সকলেরই প্রশংসা অর্জ্জন করিয়াছিল তাহা তাঁহাদের অকপট সারল্য। যাহা তাঁহারা করিতেন তাহা মুখে না বলিলেও যাহা তাঁহারা মুখে বলিতেন তাহা সমগ্র মন-প্রাণ দিয়াই করিতেন। হিন্দী শিক্ষার বেলায়ও তাঁহাদের ঠিক এই বৈশিষ্ট্যই সকলের নজরে পড়িয়াছে। যখন হিন্দী অধ্যয়নে মন দিবেন বলিয়া তাঁহারা ঠিক করিয়াছিলেন, তখন আর কোন দিকে নজর দেওয়া তাঁহাদের পক্ষে ছিল অসম্ভব। এমনি তাঁহাদের নিষ্ঠা।

একটি বড় হল ঘরে ২০।২২ জনের থাকিবার ব্যবস্থা ছিল, তাহারই মাঝখানে দুই বন্ধুতে যখন ভোর বেলা সুর করিয়া হিন্দী পড়িতে সুরু করিতেন তখন শুধু আশেপাশের বন্ধুরাই নন, স্বর্গ হইতে মা সরস্বতীও যে ইঁহাদের শিরে হিন্দী-পুষ্প বর্ষণ করিতেন, তাহাতে আর সন্দেহ ছিল না! সুধীর বাবুর কাছে হিন্দী শিক্ষা সম্পর্কে কথা তুলিলে প্রায়ই তাঁহাকে বলিতে শোনা যাইত, 'সবই ঠিক কোরে এসেছি ভাই, কিন্তু, কিছুতেই হিন্দী Intonation-টা রপ্ত করতে পারছি না।' কথাটা খুবই সত্য। নলিনী বাবুর বাড়ী ছিল মাদারীপুর, সুধীর বাবুর বাড়ী ঢাকায়। তাঁহাদের উচ্চারণভঙ্গী বা

Intonation-ও ছিল একেবারে খাঁটি স্বদেশী। তাঁহারা উচ্চস্বরে হিন্দী পাঠ সুরু করিলে দূর হইতে মনে হইত ঢাকা কিংবা মাদারীপুরের জঠরে হয় তো বা কোন দিন দৈবক্রমে গোরক্ষপুর কিংবা বালিয়া জেলা ঢুকিয়া গিয়াছিল, কিসের তাড়নায় যেন সেই গোরক্ষপুর আর বালিয়া জেলা আজ বাহিরে আসিতে চাহিতেছে, কিন্তু, পারিয়া উঠিতেছে না!

একদিনের একটি ঘটনা আজো মনে আছে। বাহিরের বারান্দায় কয়েকজনে বসিয়া আছি। চায়ের ঘণ্টা বাজিয়াছে, চা আসিয়া পড়িল বলিয়া। এমন সময় ঘরের ভিতর হইতে কিসের যেন আওয়াজ পাইয়া সকলেই সচকিত হইয়া উঠিলাম। একটু পরেই বোঝা গেল—ভয়ের কিছু নয়, নলিনী বাবু ও সুধীর বাবু হিন্দী পাঠ সুরু করিয়াছেন! কিন্তু, কি যে পড়িতেছেন আজ আর তাহার অর্থ বোঝা যাইতেছে না। অন্যদিন কান পাতিয়া সকলেই উঁহাদের পাঠ শুনিতেন, মর্ম্ম-ও কিছুটা উদ্ধার করিতেন, কিন্তু, আজ পাঠ্যবস্তুর মর্ম্ম উদ্ধার করে, সাধ্য কার? অনেকক্ষণ উৎকর্ণ হইয়া রহিলাম। শুনিলাম, প্রথম একটি লাইন নলিনীবাবু পড়িয়া যাইতেছেন, তিনি শেষ করিবা মাত্র বিচিত্র সুরে সুধীর বাবু তাহার শেষটুকু টানিয়া যাইতেছেন। বোঝা গেল, হিন্দী গদ্য কিংবা হিন্দী কাব্যের দুইটি ছত্র এই অভিনব পদ্ধতিতে তাঁহারা কণ্ঠস্থ করিয়া ফেলিতে চাহিতেছেন। কিন্তু, লাইন দুইটি কি? অনেকক্ষণ কান পাতিয়া শুনিলাম, তাহার পরে সকলের চেষ্টায় যাহা উদ্ধার করা গেল তাহা হইতেছে এই

যে, নলিনী বাবু বলিতেছেন, 'বাহারকা দরওয়াজা খট্‌' তাহার পরেই সুধীর বাবু সুর ধরিতেছেন, 'খটা রহি হায়।' একবার নয়, দুইবার নয়, এইরূপ বহুবারই শুনিলাম—নলিনী বাবু বলিতেছেন, 'বাহারকা দরওয়াজা খট্‌' সুধীর বাবু বলিতেছেন 'খটা রহি হায়।' ব্যাপার কি! শব্দগুলি তো কানে কোন ক্রমে প্রবেশ করিল, কিন্তু ইহার মানেটা কি? অনেকক্ষণ কাটিয়া গেল। চা আসিল, চা খাওয়া শেষও হইল; বাহিরে চায়ের বৈঠক ভাঙ্গিল কিন্তু, তবু ঘরের ভিতরে অবিরাম চলিয়াছে 'বাহারকা দরওয়াজা খট্‌'—'খটা রহি হায়।'

কিছুক্ষণ পরে সাহসে ভর করিয়া ঘরের মধ্যে ঢুকিয়া পড়িলাম। সঙ্গে যে বন্ধুটি ছিলেন তিনি হিন্দী বেশ ভালই জানিতেন। ঘরে ঢুকিবামাত্র বন্ধুদ্বয়ের পাঠ বন্ধ হইয়া গেল।

জিজ্ঞাসা করিলাম, 'আপনারা কি পড়ছিলেন নলিনীবাবু?'

নলিনীবাবু সে কথার উত্তর দিলেন না, সুধীরবাবুও না। তাঁহারা দুইজনেই মুচকি-মুচকি হাসিতে লাগিলেন। সে-হাসির অর্থ হয়তো এই যে, 'হিন্দীভাষা কি আর এত সোজা হে বাপু, যে সকলেই বুঝিতে পারিবে!'

আমাদের কথাবার্ত্তার ফাঁকে সঙ্গের বন্ধুটি বইটি দেখিয়া ফেলিলেন, দেখিয়াই হো-হো করিয়া হাসিয়া উঠিলেন, বলিলেন, —'এ আপনারা কি পড়ছিলেন?'

সুধীরবাবু ও নলিনীবাবু দুইজনেই জিজ্ঞাসুনয়নে চাহিলেন বন্ধুটির প্রতি, আঙ্গুল দিয়া দেখাইয়াও দিলেন কি লেখা আছে!

বন্ধুটি বলিলেন, 'অক্ষরগুলি ঠিকই বসানো আছে, কিন্তু পাঠ-পদ্ধতি তো আপনাদের অভিনবই—উদ্ভাবনী শক্তি আরো অভিনব !"

বন্ধুটি যাহা বলিলেন তাহার মর্ম্ম হইল এই যে, পাঠে লেখা আছে, 'বাহিরে প্রচণ্ড ঝড় বহিতেছে এবং সেই ঝড়ের ঝাপটায় বাহিরের খোলা দরজা খট্‌খট্ শব্দ করিতেছে।'

নলিনীবাবু ও সুধীরবাবু আগের লাইনটা পড়া গতকাল শেষ করিয়াছেন আজ পরের লাইনটি পড়িতেছেন। সেই লাইনটিতে লেখা আছে, 'বাহারকা দরওয়াজা খটখটা রহি হ্যায়,' তাঁহারই অভিনব রূপ নলিনীবাবু ও সুধীরবাবুর সমবেত চেষ্টায় হইয়াছে, 'বাহারকা দরওয়াজা খট্,'—'খটা রহি হ্যায়।'

কথাটা মুহূর্ত্তের মধ্যে চারিদিকে রাষ্ট্র হইয়া গেল। তাহার পরে সুধীরবাবু ও নলিনীবাবুর কি দুর্দ্দশা! সকলকে বুঝাইতে বুঝাইতেই হিন্দী শিক্ষার যে energy-টুকু তাঁহাদের অবশিষ্ট ছিল তাহাও যেন শেষ হইয়া আসিল। শুধু কি তাই! কয়েকদিন পর্য্যন্ত ঘরের বাহিরে যাওয়ারও কোন উপায় রহিল না। কারণ, তাঁহাদিগকে দেখিলেই, কেহ হয়তো চীৎকার করিয়া উঠিতেন, 'বাহারকা দরওয়াজা খট্' অমনি দূর হইতে অন্য কাহারও আওয়াজ শোনা যাইত 'খটা রহি হ্যায়।'

এত আনন্দ, এত হৈ-চৈ, এত হাসি-উচ্ছ্বাসের মধ্যেও জেলখানার দিনগুলি মাঝে-মাঝে একঘেয়ে হইয়া উঠিত। যতই কিছু করি না কেন, সকাল হইতে সন্ধ্যা এবং সন্ধ্যা

হইতে সকাল পর্য্যন্ত সেই তো একটানা জীবন-যাত্রা। একই পরিবেশ, একই ঘর-দুয়ার, একই লোকজন। দৃষ্টি প্রসারিত করিবার উপায় নাই ; সম্মুখে সঙ্কীর্ণ, সীমায়িত বাধা। তাহারই ওপারে বাহির-বিশ্বের সীমান্ত—মানুষের চলার পথ সেখানে বাধাহীন, জীবন দুর্ব্বার, গতি অব্যাহত। সেই বাহির বিশ্বের একটু আলোর পরশ, একটু আনন্দের ছোঁয়া পাইবার জন্য বন্দীর সমগ্র মন উন্মুখ হইয়া থাকিত। বিনা বিচারে বন্দী আমরা, অনির্দ্দিষ্ট কালের পরিধি পার হইয়া কবে যাইব এই কয়েদখানার বাহিরে, কবে বাহিরের জীবন-যাত্রার কলরব মুখর হইয়া উঠিবে, এই ভাবনা জেলজীবনের দিনগুলিকে একান্ত ভারাক্রান্ত করিয়া তুলিত।

মনের সেই ভারি বোঝাটাকে দূর করিবার জন্য তাই চেষ্টার আমাদের ত্রুটি ছিল না। জীবনের বিভিন্ন প্রকাশের ক্ষেত্রে বিচিত্র রস পরিবেশন করিয়া বন্দীজীবনের শুষ্ক, নিরস দিনগুলিকে রসঘন করিয়া তুলিতে পারিয়াছিলাম বলিয়াই হয়তো অনেকেই সুস্থদেহ ও সুস্থ মন লইয়া একদিন বাহির হইতে পারিয়াছি, কিন্তু পারেন নাই, এমন লোকের সংখ্যাও নেহাৎ কম হইবে না।

অসুস্থ দেহে, অসুস্থ মনে জেলখানা হইতে তাঁহারা বাহির হইয়াছেন, পরাধীনতার অভিশাপ সারাজীবনের জন্য বুকে বাঁধিয়া কেহ বা ধীরে-ধীরে মৃত্যুর পথে পা বাড়াইয়াছেন আর কেহবা না মরিলেও জীবনভর মৃত্যু-যন্ত্রণা ভোগ করিয়া

গিয়াছেন। দেশবাসী তাঁহাদের দিকে ফিরিয়াও চাহে নাই, একটু আশ্রয়, একটু সেবা, একমুঠি অন্নের অভাবে তিল-তিল করিয়া অন্তিম মুহূর্ত্তের প্রতীক্ষায় তাঁহারা দিন গুণিয়াছেন। এই তো আমাদের দেশ! কিন্তু, থাক সে-কথা। জেলের ভিতরকার কথা বলিতেছিলাম—কি কথায় কি কথা আসিয়া পড়িল।

বন্দীশালায় সকলের দিন সমান যায় না। আমাদের-ও গেল না। 'মৃণালকান্তি'-র রহস্যজনক মৃত্যুর কথা পূর্ব্বে বলিয়াছি। সে-সম্পর্কে জেল কর্ত্তৃপক্ষ এবং ইংরেজ সরকার তূষ্ণীম্ভাব অবলম্বন করিলেন, তাহা শুধু তাঁহাদের পক্ষেই সম্ভব। তাঁহাদের কথাবার্ত্তা, হাবভাব দেখিয়া মনে হইত, এ মৃত্যুতে অখুশি তো তাঁহারা হন নাই-ই বরং কিছুটা খুশিই হইয়াছেন, কারণ, তাঁহাদের একটি শত্রু তো অন্ততঃ নিপাত গিয়াছে! রাজবন্দীদের প্রতি ইংরেজ সরকারের এ নিষ্ঠুর আচরণ অভাবিত নয়, অভিনব তো নয়ই, ইহা তাঁহাদের স্বভাব-সিদ্ধ। তাহাছাড়া ১৯৩০-৩৪ সালে সমগ্র বাংলাদেশে বাংলার বিপ্লবীরা যে বিদ্রোহের আগুন জ্বালাইয়াছিল তাহাতে শুধু ইংরেজ সরকারই নয়, জাতি হিসাবেও সমগ্র ভারতবর্ষের ইংরেজ-সমাজ একেবারে ক্ষিপ্ত হইয়া উঠিয়াছিল। বিপ্লবীরা চট্টগ্রাম অস্ত্রাগার লুণ্ঠন করিয়াছে, ঢাকায় লোম্যাক হডসনকে ধরাশায়ী করিয়াছে, কলিকাতায় 'রাইটার্স বিল্ডিং' আক্রমণ করিয়াছে, মেদিনীপুরে একের পর এক ম্যাজিষ্ট্রেটকে গুলি

করিয়া মারিয়াছে, উত্তরবঙ্গে লুঠতরাজ করিয়াছে, তাহাদের আবার বিচার-আচার কি ? 'ষ্টেটসম্যান' পত্রিকায় ধারাবাহিক ভাবে চিঠি বাহির হইতে লাগিল, কেহ বা বলিল, ধরা যাহারা পড়িবে কালবিলম্ব না করিয়া দেয়ালের গায়ে দাঁড় করাইয়া গুলি করিয়া তাহাদের মারা উচিত, কেহ বা বলিল কেন, হাতের কাছে যে ল্যাম্প পোষ্ট পাওয়া যায় তাহাই যথেষ্ট। '*Statesman*' পত্রিকা তো একবার '*On the Volcano*' নাম দিয়া এক সম্পাদকীয় প্রবন্ধই লিখিয়া ফেলিলেন ; আর সে-প্রবন্ধে বাংলার বিপ্লববাদ ও বিপ্লবীদের সম্পর্কে চরম বিষোদ্‌গার করিতে ছাড়িলেন না। এই সব কারণে শুধু ইংরেজ জাতি নয়, দেশের সমস্ত ইংরেজ ভক্তগণের মনেই বিপ্লবীদের সম্পর্কে এক ঘোর প্রতিক্রিয়ার সৃষ্টি হইয়াছিল।

সে প্রতিক্রিয়ার ঢেউ আসিয়া লাগিয়াছিল বন্দীশালায়-ও। কারণ, তদানীন্তন শাসন কর্তৃপক্ষের মতে রাজবন্দীরা তো ছিলেন সেই সব দুর্দ্ধর্ষ বিপ্লবীদেরই সগোত্র। তাই বাগে যখন পাওয়া গিয়াছে ঝালটা ইহাদের উপর ঝাড়িয়া লইতে আর আপত্তি কি! এই মনোভাবই ছিল তখনকার শাসন কর্তৃপক্ষ হইতে সুরু করিয়া জেল কর্ত্তৃপক্ষ পর্য্যন্ত সমস্ত ইংরেজ রাজকর্ম্মচারীদের মধ্যে। তাই কারণে-অকারণে আমাদের উচিত শিক্ষা দিতে তাঁহাদের ইচ্ছা বা আগ্রহ কোনটারই ত্রুটি ছিল না!

১৯৩১ সালে হিজলী শিবিরে জেল-সান্ত্রীর গুলিতে রাজবন্দী সন্তোষ মিত্র ও তারকেশ্বর সেন মৃত্যু বরণ করেন, সে গুলিচালনার মূলেও ছিল রাজবন্দীদের উপর প্রতিশোধ গ্রহণের একটা পাশবিক আগ্রহ।

আপাতদৃষ্টিতে সে গুলিচালনার মূলে যে কারণই বিদ্যমান থাকুক না কেন, ইহার আসল কারণটি আজ আর কাহারও কাছে অবিদিত নাই। হিজলী বন্দীশালার সঙ্গে যাহাদের পরিচয় আছে তাঁহারা জানেন, সেই বন্দীশিবিরের অভ্যন্তরে যে টাওয়ার-টি আছে তাহা কত উঁচু। সে টাওয়ারে আলোক মালা জ্বলিলে বহুদূর হইতে এমন কি মেদিনীপুর সহর হইতেও দেখা যাইত। মেদিনীপুরের জেলা ম্যাজিষ্ট্রেট প্যাডিকে যে দিন গুলি করিয়া মারা হয় সেই দিন হিজলী জেলের রাজবন্দীরা টাওয়ারটিকে আলোর মালায় সজ্জিত করিয়াছিলেন। একে তো 'প্যাডি' সাহেবকে হত্যা, কে বা কাহারা করিল, তাহার কোন হদিসই সরকার করিতে পারে নাই তাহার উপর আবার বন্দীশালায় আলোর মালায় সে হত্যাকাণ্ডের বিজয়োল্লাস! ইংরেজের ক্রোধ একেবারে চরমে উঠিল। কিন্তু, কোন অজুহাত না পাইলে তো কিছু করা যায় না, তাই সুযোগ-সন্ধানী ইংরেজ সরকার সুযোগের আশায় দিন গুণিতে লাগিল। ১৯৩১ সালের সেপ্টেম্বর মাসে সে সুযোগ মিলিল জেল-কর্তৃপক্ষের। শান্ত্রীর গুলিতে নিরপরাধ দুই রাজবন্দী স্বাধীনতার বেদীতলে জীবন উৎসর্গ করিলেন। এতদিন পরে

মেদিনীপুর জেলা ম্যাজিষ্ট্রেট হত্যার প্রতিশোধ গ্রহণ করিয়া ইংরেজ কতটা শান্ত হইয়াছিল বলিতে পারি না, কিন্তু, বিপ্লবীদের বিপ্লব অভিযান তাহাতে বন্ধ হওয়া তো দূরের কথা, আরো দুর্ব্বার হইয়া উঠিল। হিজলী বন্দীশালায় গুলিবর্ষণের কালে মেদিনীপুরের জেলা ম্যাজিষ্ট্রেট যিনি ছিলেন কিছুদিন পরে সেই ডগলাস সাহেবকে বিপ্লবীদের গুলিতে প্রাণ দিতে হইল। বাংলার বিপ্লবীরা অত্যাচারীকে কোনদিন ক্ষমার চক্ষে দেখে নাই, সেদিনও দেখিল না।

ইংরেজ কিন্তু তাহাতেও দমে নাই। বীরের জাতি বলিয়া সারা জগতে ইংরেজের খ্যাতি আছে। সে এত সহজে দমিতে যাইবে কেন! তাই বিপ্লবীদের বিরুদ্ধে যখন তেমন কিছু করা তাহাদের পক্ষে সম্ভব হইল না তখন সমগ্র শক্তি নিয়োজিত করিল রাজবন্দীদের উপর। সেখানে বন্দীরা একান্ত নিঃসহায়, নিঃসম্বল। প্রতিশোধ গ্রহণের এত বড় সুযোগ এবং সুবিধা আর কোথায়!

হিজলী জেলের গুলিবর্ষণের ফলে দেশজোড়া যে প্রতিবাদ ইংরেজ সরকারের প্রতি রূঢ় ভৎর্সনায় মূর্ত্ত হইয়া উঠিয়াছিল তাহাতে সেদিন এই কথাটিই স্পষ্ট প্রমাণিত হইয়াছিল যে, সেদিনকার বিদেশী-রাজ পশুশক্তিতে কত বলীয়ান্। কিন্তু, সেই প্রতিবাদ ও ভৎর্সনায় কর্ণপাত করিবার তখন সময় ছিল না বৃটিশ সরকারের। ভারতে বৃটিশ রাজ্যের ভিৎ যাহারা কাঁপাইয়াছে তাঁহাদের অন্তরাত্মাকে যদি কাঁপাইয়া না তোলা

যায় তবে বৃটিশশক্তির গগনস্পর্শী মর্য্যাদা যে ধূলায় লুটাইয়া পড়িবে! তাই বন্দীশিবিরগুলিকে লক্ষ্য করিয়া অত্যাচারীর অত্যাচার তখন তাণ্ডব মূর্ত্তিতে দেখা দিল।

বাংলাদেশে বিভিন্ন জেলগুলি ছাড়া বন্দীশিবির ছিল তিনটি —হিজলী, বহরমপুর ও বক্‌সা। এই তিনটি বন্দীশিবিরের মধ্যে বহরমপুর বন্দীশিবিরটিতেই জেল কর্তৃপক্ষের অত্যাচারের মাত্রা চরম হইয়া উঠিয়াছিল। বেশ মনে আছে, 'বহরমপুর' শব্দটি শুনিলেই সেদিন শরীরে কাঁটা দিত। যদি কাহারও বহরমপুর বন্দীশিবিরে যাওয়ার হুকুম হইত তবে তাহার শরীরের সমস্ত রক্ত বহরমপুর যাওয়ার পূর্ব্বেই জল হইয়া যাইত। এমনি ছিল বহরমপুর সম্পর্কে কিংবদন্তী। আর কিংবদন্তীই বা বলি কেন—ভুক্তভোগীদের কাছে বহরমপুর জেলের যে অত্যাচার উৎপীড়ণের সংবাদ পরে পাইয়াছি তাহা কিংবদন্তীকেও ছাড়াইয়া গিয়াছে। সে সব বর্ণনা শুনিয়া সত্যই মনে হইয়াছে যাহা ঘটিয়াছে তাহার কতটুকুই বা দূর দূরান্ত হইতে শুনিতে পাইয়াছি, এ যেন সত্যসত্যই, 'Truth is stranger than fiction.'

দিনের পর দিন, মাসের পর মাস, বছরের পর বছর— বহরমপুরে যাহা ঘটিয়াছে, কোন সভ্যদেশের কারাগারে কোথাও তাহা অনুষ্ঠিত হইয়াছে কিনা সন্দেহ! জার্ম্মাণীর বিভিন্ন Concentration Camp-এর বহু চাঞ্চল্যকর কাহিনী আমরা শুনিয়াছি, 'বেলসেন' ক্যাম্পের অমানুষিক অত্যাচারের কাহিনী

আজিও হয়তো অনেকের মনে ঘৃণার সঞ্চার করে, কিন্তু, সুসভ্য ইংরেজ জাতি এতকাল ধরিয়া বহরমপুর জেলে সে যুগে যাহা করিয়াছিল তাহা যে কত 'বেলসেন'-কে ছাড়াইয়া গিয়াছে তাহা আমরা জানি না। কি করিয়াই বা জানিব ? ইংরেজ যতদিন ছিল ততদিন ইংরেজের চোখেই শুধু ভারতবর্ষকে নয়, ভারতবর্ষের বাহিরের জগৎটাকেও আমরা দেখিতে বাধ্য হইয়াছি ; তাই 'বেলসেন'-এর কথা শুনিয়া আমরা চমকিয়া উঠি কিন্তু বহরমপুরকে আমরা চিনি না।....

বহরমপুরে সাধারণত থাকিতেন অপেক্ষাকৃত কম বয়সের বন্দীরা। বয়সের ধর্ম্ম অনুসারে রক্ত-ও তাহাদের কিছুটা উত্তপ্ত থাকা স্বাভাবিক, কিন্তু, সে উষ্ণ রক্তকে চিরদিনের তরে ঠাণ্ডা করিবার যে পথ সে-দিন সরকার গ্রহণ করিয়াছিলেন সে পথটা আর যাহারই হউক না কেন, মানুষের যে নয় এ কথা ঠিক। জেল-সান্ত্রীরা বহরমপুরে সঙ্গীন উদ্যত করিয়াই রাখিতেন। নিয়মের একটু ব্যতিক্রম হইলেই আর রক্ষা নাই।

শাস্তির পদ্ধতিও ছিল অভিনব। যদি কেহ কোন অপরাধ করিয়াই ফেলে, সে অপরাধ যত সামান্যই হউক না কেন শাস্তি সকলেরই ভোগ করিতে হইবে। এই ছিল 'বহরমপুরী' বিধান। রাত্রিতে 'লক-আপ' করিবার সময় হয়তো দেখা গেল, জনৈক রাজবন্দী নির্দ্দিষ্ট সময়ের একটু পরে আসিয়া হাজির হইয়াছেন, রাত্রিতে আর তাঁহার জন্য তাঁহার সেল-এর দরজা সেদিন খোলা হইত না, সারারাত্রি কোন নির্জ্জনকক্ষে বসিয়া-বসিয়া কিংবা

দাঁড়াইয়া-দাঁড়াইয়া তাঁহাকে রাত্রি অতিবাহিত করিতে হইত, তাহার পরে, পরের দিন তাঁহার বিচার এবং শাস্তির ব্যবস্থা!

কোন জমাদার কিংবা কোন সুবাদার-মেজরের সঙ্গে হয়তো কোন ব্যাপার লইয়া কোন বন্দীর বচসা সুরু হইল, আর যায় কোথা, সেই বন্দীর উপর তো নির্দ্দয় প্রহার সুরু হইলই সঙ্গে সঙ্গেই পড়িল পাগলা-ঘন্টি, সেলে-সেলে রাজবন্দীদের আটক করা হইল এবং তাহার পরে তালা খুলিয়া প্রতিটি সেলে যে ৫।৭ জন্ করিয়া বন্দী থাকিতেন তাহাদের ইচ্ছামত প্রহার করিয়া আবার তালাবদ্ধ করিয়া সান্ত্রীরা চলিয়া যাইত। কাহার মাথা ভাঙ্গিল, কাহার হাত-পা ভাঙ্গিল, কিম্বা, কে সংজ্ঞাহীন হইয়া পড়িয়া রহিল সে সব খোঁজ-খবর করিয়া সময়ের অপব্যবহার করিবার মত সময় তাহাদের কেথায়?

একদিন দুইদিন নয়, একবার দুইবার নয়, এই রকমের ঘটনা বহরমপুর বন্দীশিবিরে ঘটিত অহরহ।

ডাক্তারের আসা-যাওয়া লইয়া, হাসপাতাল লইয়া, খেলা-ধূলা লইয়া জেল-কর্ত্তৃপক্ষের সঙ্গে বিরোধ বহরমপুরে প্রায় সব সময় লাগিয়াই থাকিত। কখন কোন্ মুহূর্ত্তে যে, কোন্ দিক্ হইতে সান্ত্রীরা রুদ্রমূর্ত্তিতে অস্ত্রশস্ত্র লইয়া ছুটিয়া আসিবে, পূর্ব্ব মুহূর্ত্তেও তাহার কোন আভাস পাওয়া যাইতনা। ভোরে হউক, দুপুরে হউক কিংবা রাত্রেই হউক, আসিলেই হইল। তাহার পরে কাহারও বা মাথা ফাটিল, কাহারও বা ভাঙ্গিল কোমর, কাহারও বা পাঁজরের হাড় ক'খানি। তাহার পরে শাস্তি!

তাই বলিতেছিলাম, এ ইতিহাসের যদি আলোকচিত্র লওয়া হইত তাহা হইলে অনায়াসেই ইহা বোধগম্য হইত যে, জার্ম্মানীর 'বেলসেন' মৌলিকত্বের দাবী মোটেই করিতে পারে না, ইহা ইংরেজ অনুষ্ঠিত বহরমপুর-উৎপীড়ণের একটা সার্থক *Copy-book* মাত্র।

বহরমপুরে যাহা ঘটিয়াছে তাহার শতাংশও যে দেউলীতে ঘটে নাই বলিলে মিথ্যা বলা হইবে না। সত্যকথা বলিতে কি, দেউলীতে আমরা যে-কয়বছর ছিলাম তাহার মধ্যে কর্ত্তৃপক্ষের সঙ্গে খুব বড় রকমের প্রত্যক্ষ সংঘর্ষ তেমন বড় একটা হয় নাই। দেউলীতে যাহা ঘটিত তাহাকে বর্ত্তমান যুগের রণনীতির ভাষায় বলা চলে, '*Cold War*' বা স্নায়ুযুদ্ধ। মাঝে-মাঝে বিস্ফোরণও এক আধবার হইয়াছে, কিন্তু সে বিস্ফোরণকে প্রথম শ্রেণীর বিস্ফোরণ কিছুতেই বলা চলে না।

দেউলীজেলের জীবনযাত্রার প্রথম দিনটি হইতেই কর্ত্তৃপক্ষের বিরুদ্ধে অভিযোগ আমাদের ছিল। মৃণালকান্তির মৃত্যু সম্পর্কে একটা নিরপেক্ষ তদন্তের দাবী আমরা যত জোর দিয়াই পেশ করি না কেন, 'ফিণে' সাহেব ছিলেন সে সম্পর্কে একান্ত উদাসীন।

বন্দীশালায় কর্ত্তৃপক্ষের বিরুদ্ধে সংগ্রাম ঘোষণা করিবার কতগুলি ধরাবাঁধা পথ ছিল। প্রথম পথটি হইল, আবেদন-নিবেদন, তাহার পরে জেলের আভ্যন্তরীণ আইন ও শৃঙ্খলার বিরুদ্ধে জেহাদ ঘোষণা এবং তাহাতেও কোন ফল না

হইলে অনশন ধর্ম্মঘটই ছিল বন্দীদের তূণে শেষ-অস্ত্র। অনেক ভাবিয়া চিন্তিয়া এই অস্ত্রটিকে প্রয়োগ করিতে হইত। সংগ্রামের এই যে চিরাচরিত পথ, এই পথে সার্থকতালাভের একটা প্রধান উপায় ছিল বাহিরের সঙ্গে যোগাযোগ স্থাপন করা। কারণ, ভিতরে যাহা ঘটিতেছে বাহিরের জগৎ যদি সে সম্পর্কে অবহিত হইয়া জেলের বাহিরে বন্দীদের ন্যায্য দাবীদাওয়া লইয়া একটা তুমুল আন্দোলন গড়িয়া তুলিতে না পারে তাহা হইলে কর্ত্তৃপক্ষকে কিছুতেই বাগে আনা যায় না। দেউলীতে কিন্তু রাজবন্দীদের এই অসুবিধার কথাটা প্রত্যেক রাজবন্দীকে ভাবাইয়া তুলিয়াছিল। সম্মুখস্থ রেল ষ্টেশন হইতে ৬০ মাইল দূরে, জনমানবহীন এক নির্জ্জন প্রান্তরে রাজবন্দীদের এই বন্দীশিবিরটি! এখান হইতে বাহিরের জগতের সঙ্গে যোগাযোগ কী ভাবে সম্ভব! এই অসহায় অবস্থার সুযোগ লইয়াই জেলকর্ত্তৃপক্ষ রাজবন্দীদের ন্যায়সঙ্গত অধিকারগুলি সম্পর্কে উদাসীন থাকিতে সাহস পাইতেন।

কিন্তু, চুপ করিয়া বসিয়া থাকা যায় কতদিন? কতদিন নীরবে সহ্য করা যায় সরকার এবং সরকারী কর্ম্মচারীদের এই হৃদয়হীন উপেক্ষা? তাই দেউলীর জলহীন মরুময় আকাশের কোণেও একদিন এক টুকরা মেঘ দেখা দিল—শীঘ্রই যে ঝড় উঠিবে তাহার আর কোন সন্দেহ রহিল না।

ভোরবেলা প্রাতঃকৃত্য সমাপন করিয়া গোল হইয়া বসিয়া

বাহিরের বারান্দায় গল্প করিতেছি, অকস্মাৎ খবর পাওয়া গেল, সশস্ত্র বাহিনী লইয়া ফিণে সাহেব স্বয়ং জেলের মধ্যে ঢুকিতেছেন। ব্যাপার কি দেখিবার জন্য গাত্রোত্থান করিতে না করিতেই দেখি সশস্ত্র বাহিনী পরিবেষ্টিত ফিণে সাহেব দ্রুতপদে সেলগুলির দিকে যাইতেছেন। কাহাকেও কিছু না বলিয়া একের পর এক তিনি সেলগুলিতে ঢুকিয়া তন্নতন্ন করিয়া তল্লাসী করিয়া কিছু না পাইয়া যেমন নীরবে আসিয়াছিলেন তেমনি নীরবে প্রস্থান করিলেন। কি খুঁজিলেন? কাহাকে খুঁজিলেন? সকলের মুখেই এক প্রশ্ন।

'—বসু'কে নাকি পাওয়া যাইতেছেনা।

সে কি ব্যাপার! কথাটা মুহূর্তের মধ্যে রাষ্ট্র হইয়া গেল। সকলেই অভিমত প্রকাশ করিলেন, এ হইতেই পারে না। কেহ বলিলেন, এই তো কাল রাত্রিতেও তাঁহাকে দেখিয়াছি, কেহ বা বলিলেন কাল রাত্রিতে কেন, আজ ভোরেও যেন তাঁহাকে দেখিয়াছি বলিয়া মনে হইতেছে, এইসব বাদানুবাদ এবং তর্ক বিতর্কে কিন্তু একটা কথা আমাদের মনেই হইল না যে, বেশ তো এখনই তো খুঁজিয়া দেখা যায়'—বসু' জেলে আছে কি নাই! কতটুকু আর এই জেল, পলাইয়া থাকিবার উপযুক্ত জায়গাই বা কই।

আসলে সেদিন কিন্তু সত্য-সত্যই বসুকে দেখা গেল না। ক'দিন হইতে যে তাঁহাকে দেখা যায় না, তাই বা কে জানে? '—বসু' মহাশয় ছিলেন একান্ত নিরীহ প্রকৃতির। পাতলা

ছিপছিপে চেহারা, ধীর-স্থির চালচলন, দেখাইয়া না দিলে সহজে চোখেই পড়ে না। তাই, ক'দিন ধরিয়া যে তিনি নিখোঁজ কে জানে? তাঁহাকে সারাদিন দেখিতে না পাইয়া কিন্তু অনেকেরই ধারণা হইল যে, বেশ কিছুদিন আগেই তিনি গা-ঢাকা দিয়াছেন। সংবাদটি রাষ্ট্র হওয়ামাত্র যে-বন্ধুরা বলিতে সুরু করিয়াছিলেন, 'এই তো কাল রাত্রিতেও দেখিয়াছি, আজ ভোরেও দেখিয়াছি', তাঁহারাও যেন কেমন একটু সুর পাল্টাইতে সুরু করিলেন এবং হিসাবপত্র করিয়া দেখিলেন যে, গত ছয়-সাত দিন যাবতই তাঁহাকে দেখা যাইতেছে না!

জেল-কর্তৃপক্ষ কিন্তু আজই ভোরে আবিষ্কার করিলেন যে,'—বসু' মহাশয়কে খুঁজিয়া পাওয়া যাইতেছে না। তাই বা কি করিয়া সম্ভব? তিনি যদি কিছুদিন আগেই চম্পট দিয়া থাকেন তবে Roll-Call Officer তাহা এতদিনে নির্দ্ধারণ করিলেন কেন? কেন প্রথম দিনই তাঁহার নজরে পড়িল না? নজরে না পড়ার কারণ-ও অবশ্য যে না ছিল এমন নয়।

দেউলী জেলে যে Roll-call হইত তাহা ছিল নেহাৎ-ই মামুলী। নির্দ্ধারিত সময়ে অফিসারটি খাতাপত্র লইয়া জেলে ঢুকিতেন, কাহাকেও দেখিতে না পাইলে জিজ্ঞাসা করিতেন, 'অমুক বাবুকে তো দেখছি না, তিনি কোথায়?' তাহার উত্তরে শুধু এই কথাই বলিলে যথেষ্ট হইত যে, 'তিনি স্নানের ঘরে কিংবা পায়খানায় কিংবা অন্যত্র আছেন।' এই ভাবেই

roll-call এর কাজ হইয়া আসিত। কিন্তু উপর্য্যুপরি 'বসু'-কে না পাওয়ায় Roll-Call Officer-এর সন্দেহ উপস্থিত হয়। তিনি সে-কথা ফিণে সাহেবের কাছে জানান এবং তাহারই ফলে আজ ভোরে ফিণে সাহেব সদলবলে জেলের মধ্যে প্রবেশ করেন।

সবই তো বোঝা গেল। বোঝা গেল '—বসু' মহাশয় চম্পট দিয়াছেন। কিন্তু, তারপর ?

এই পরের পর্ব্বটির জন্য অধীর উৎকণ্ঠায় সকলে অপেক্ষা করিতে লাগিলাম। সেদিন রাত্রিতে আর কিছু হইল না বটে, কিন্তু রাত্রি ভোর হইতে না হইতেই আসন্ন একটা ঝড়ের পূর্ব্বাভাস সমস্ত পরিবেশটিকেই আচ্ছন্ন করিয়া ফেলিল। জেল-গেটের সান্ত্রী হইতে শুরু করিয়া সামান্যতম জেলকর্ম্মচারী সকলের মধ্যেই একটা অস্বাভাবিক কর্ম্মচাঞ্চল্য শুধু এই কথাটাই সকলকে স্মরণ করাইয়া দিল যে, আর দেরি নাই, শীঘ্রই জেলের মধ্যে একটা তুমুল কাণ্ড সংঘটিত হইবে। হইলও তাহাই।

একটু পরেই দেখা গেল, পুরাদস্তুর কম্যাণ্ডেণ্টের পোষাকে ফিণে সাহেবের নেতৃত্বে বিরাট এক সশস্ত্র বাহিনী জেলের মধ্যে ঢুকিতেছে। কাহাকেও কিছু না বলিয়া, কোনদিকে দৃক্‌পাত না করিয়া সেই বাহিনী সটান গিয়া ঢুকিল '—বসু' মহাশয়ের কক্ষে। রাজবন্দীরা সকলেই রুদ্ধশ্বাসে বাহিরের প্রাঙ্গনে দাঁড়াইয়া আছেন, অনিশ্চিত একটা অমঙ্গলের

ছায়া যেন সমস্ত জেলটিকেই ছাইয়া ফেলিয়াছে। এমনি ভাবে কতক্ষণ কাটিয়াছিল ঠিক বলিতে পারি না, অকস্মাৎ 'Quick March' শব্দে সকলেই সচকিত হইয়া উঠিলাম। দেখিলাম, ফিণে সাহেবের নেতৃত্বে সমগ্র বাহিনীটি আবার জেল-গেটের দিকে অগ্রসর হইয়া চলিয়াছে। কিন্তু একি! দুইটি জেল-সেন্ট্রির কাঁধে ঐ কে বসিয়া! বুঝিতে আর কিছু বাকি রহিল না। দেখিতে পাইলাম সান্ত্রীর কাঁধের উপর নিশ্চিন্তে বসিয়া '—বসু' মহাশয় মুচকি-মুচকি হাসিতেছেন।

ভিড়ের ভিতর হইতে বন্ধুদের মধ্যে কে একজন চীৎকার করিয়া উঠিল—'Halt !' অভ্যাসের দোষে সান্ত্রীরা তৎক্ষণাৎ থামিল, বুঝিতেও পারিল না এ আদেশ তাহাদের কম্যাণ্ডাণ্টের নয়! ফিণে সাহেব তো চটিয়া আগুন। বন্দীদের মধ্যেও উত্তেজনা যথেষ্টই ছিল। কিছু বলা নাই, কওয়া নাই, তাঁহাদের মধ্য হইতে একটি বন্ধুকে জোর করিয়া ছিনাইয়া লইয়া যাইবে —সে কি কথা! তরুণ বন্দীরা সকলের আগে আসিয়া পথরোধ করিয়া দাঁড়াইল।

তাহার পরের ঘটনা খুবই সংক্ষিপ্ত। হাতাহাতি এবং যথাক্রমে মারপিট সুরু হইয়া গেল। ফিণে সাহেবের জামা ছিঁড়িল, টুপী পড়িয়া গেল। সান্ত্রীরা ক্ষিপ্ত হইয়া উঠিল। তাহাদের জীবন থাকিতে কিনা তাহাদেরই সম্মুখে সাহেবের এত বড় অপমান! উদ্যত অস্ত্র লইয়া তাহারা বন্দীদের আক্রমণ করিল। বন্ধুদের মধ্যে প্রবীণ যাঁহারা ছিলেন তাঁহাদের অনেকেই এক

দিকে তরুণ বন্ধুদের ও অপরদিকে ক্ষিপ্ত সান্ত্রীদের মাঝে পড়িয়া উভয় দলকেই নিবৃত্ত করিতে চেষ্টা করিলেন। এত উত্তেজনায়-ও কিন্তু 'ফিণে' সাহেব নিজেকে হারাইয়া ফেলেন নাই, তিনি ধীরে-ধীরে তাঁহার সান্ত্রীদের একত্র করিয়া জেল গেটের বাহিরে চলিয়া গেলেন। '—বসু' মহাশয়কে-ও অবশ্য সঙ্গে নিলেন। রাগে, ক্ষোভে, অপমানে ফিণে সাহেব সেদিন তেমন কিছু একটা প্রতিশোধ না লইয়াই অবশ্য চলিয়া গেলেন, কিন্তু যাওয়ার আগে তাঁহার রোষদীপ্ত আননখানি একবার ঘুরাইয়া হয়তো এই বলিয়াই মনে-মনে শাসাইয়া গেলেন যে, 'এক মাঘে শীত যায় না।'

এক পর্ব্ব তো কোনক্রমে শেষ হইয়া গেল, ইহার পরের পর্ব্বে আমাদের তরফ হইতে কি করিবার আছে, ইহাই হইল সমস্যা। ফিণে সাহেব সেদিন হাতেনাতে কিছু না করিলেও এ ব্যাপারটিকে এত সহজে যে ছাড়িয়া দিবেন না তাহা তো জানা কথা! কিন্তু সে জন্য তো আর কালবিলম্ব করা যায় না; এখনই একটা কর্ম্মপন্থা গ্রহণ করিয়া তাহাকে কাজে পরিণত করিতে হইবে।

এই সব গুরুত্বপূর্ণ আলাপ-আলোচনার মধ্যে-ও একটা প্রশ্ন কিন্তু অনেকের মনেই উঁকি মারিতেছিল। সে-প্রশ্নটি হইতেছে এই যে,'—বসু' মহাশয় তো দেখা যাইতেছে তাহা হইলে এই জেলের মধ্যেই আত্মগোপন করিয়াছিলেন। কিন্তু কোথায় ছিলেন, কি ভাবে ছিলেন?

ইতিমধ্যে এ সম্পর্কে বহু বন্ধু বহু Theory-রও অবতারণা করিলেন! কাহারও মতে,'—বসু'র যা হ্যাংলা ছিপছিপে চেহারা তাহাতে যে কোন জায়গায়ই তিনি লুকাইয়া থাকিতে পারেন, তাঁহার লেপটিকে গোল করিয়া একটা কোলবালিসের রূপ দেওয়া হইয়াছিল এবং'—বসু' মহাশয় নির্ব্বিবাদে তাহার মধ্যেই ঢুকিয়াছিলেন! কেহ এ কথাও বলিতে ছাড়িলেন না যে, তাঁহাকে আজ ঐ লেপ-রূপ কোল-বালিশ হইতেই টানিয়া বাহির করা হইয়াছে! ইহা কেহবা স্বচক্ষে দেখিয়াছেন, কেহবা স্বকর্ণে শুনিয়াছেন!

এইভাবে বাদানুবাদ চলিতে লাগিল। জনৈক বন্ধু আবার জোর দিয়া বলিলেন যে, 'আসলে ও সব কিছু নয় তাঁহার ঘরে যে একটি কালো মিশমিশে থাম আছে; ওঁর গায়ের রঙ এবং ঐ থামের রঙ এত মিশ খায় যে, উহার পেছনে যদি তিনি দিনরাত লুকাইয়াও থাকেন তবে তাঁহাকে বাহির করে সাধ্য কার?'

কথাগুলি শুনিতে অবশ্য ভালই লাগিতেছিল, কিন্তু আসলে এ কথাগুলি তো আর সত্য হইতে পারে না! কারণ দু-চার মিনিট কিংবা ঘণ্টাখানেক হয়তো বা ঐ সব উপায়ে আত্মগোপন করা সম্ভব, কিন্তু, ছয়-সাত দিন ধরিয়া তিনি শুধু জেল-কর্ত্তৃপক্ষের নহে বন্ধুদেরও যে অনেকের চোখে ধূলি দিয়া আত্মগোপন করিয়াছিলেন তাহা নিঃসন্দেহ। ইহা সম্ভব হইল কিরূপে?

ষোল

'এক মাঘে শীত' সত্যই গেল না! সংগ্রাম শেষ পর্য্যন্ত সুরুই হইয়া গেল। ফিণে সাহেব সেই যে সেদিন সক্রোধে জেল-গেটের বাহিরে চলিয়া গেলেন তাহার পরে আর তাঁহাকে জেলের মধ্যে দেখা গেল না বটে; কিন্তু, ঘণ্টায়-ঘণ্টায়ই একের পর একটি তাঁহার কড়া আদেশ-পত্র এই বলিয়া আমাদিগকে শাসাইয়া যাইতে লাগিল যে, তিনি তো সশরীরে অক্ষত দেহে বর্ত্তমান আছেন-ই, বরং এত উষ্ণ মেজাজে আছেন যে, অদূর ভবিষ্যতে সে উষ্ণতা হ্রাসের কোন লক্ষণই নাই!

এদিকে জেলের মধ্যেও সাজ-সাজ রব পড়িয়া গেল। মেজাজ দেখানো শুধু জেল-সুপারেরই একচেটিয়া এ কথাটা আমরা মানিয়া লইব কেন! তাই প্রথমেই সুরু হইল, সাহেব যে-আদেশ পত্র আমাদের উদ্দেশে জেলের মধ্যে পাঠান তাহাকে যথাসম্ভব না মানিয়া চলা।

নিয়ম ছিল, Roll-call-এর বাঁশি বাজিবামাত্র আমরা যার-যার সিটে গিয়া বসিব এবং কয়েক মিনিট পরে অফিসার ঢুকিয়া আমাদের Roll-call করিয়া যাইবেন। এতদিন তাহা পালন করি নাই। অফিসারের সঙ্গে সহযোগিতা করিয়াই 'রোলকল'-এর নিয়ম না মানিয়াও আনায়াসে চলিতে পারিয়াছি। কিন্তু, সেদিনের সে-ঘটনার পরে আবার নূতন করিয়া আদেশ আসিল 'রোল-কল'-এর আইন মানিতেই হইবে। হইবে তো বটে, কিন্তু, মানে কে? তাই রোল-কলের বাঁশি বাজিবা মাত্র সিটে যাওয়া তো দূরের কথা, যাঁহারা সিটে বসিয়া থাকিতেন তাঁহারাও তখন সিট ছাড়িয়া এদিক ওদিক চলিয়া যাইতেন। 'রোল-কল' অফিসার ভিতরে আসিয়া মহা ফাঁপরে পড়িতেন। ঘণ্টা দুই-তিন ব্যর্থ চেষ্টা করিয়া তাঁহাকে বিফলমনোরথ হইয়া ফিরিয়া যাইতে হইত। এমনিভাবে আমরা আসন্ন সংঘর্ষের জন্য প্রস্তুত হইতে লাগিলাম।

ইতিমধ্যে যাঁহারা সেদিন হাঙ্গামায় সংশ্লিষ্ট ছিলেন বলিয়া ফিণে সাহেবের ধারণা জন্মিয়াছিল তাঁহাদের উপর শমন আসিয়া পড়িল।

জেলখানার বিচার পদ্ধতিটা একটু অভিনব। সুপারের আদেশেই এখানে শমন জারি হয় এবং শমন যাঁহাদের উপর জারি হয় তাঁহারা সকলেই দোষী। কারণ, এখানে 'সুপার' আগে দোষী সাব্যস্ত করেন, পরে তাঁহাদের উপর শমন জারি করিয়া তাঁহাদের দণ্ডবিধান করেন! দণ্ডমুণ্ডের কর্ত্তা এখানে একজনই—হাকিম এবং হুকুমদার তিনি নিজেই।

সুতরাং শমন যাহাদের উপর আসিল তাঁহাদের ভাগ্য সম্পর্কে আমাদের মনে কোন সন্দেহের অবকাশ রহিল না। তাঁহারা জেল-গেটের বাহিরে যাওয়ার আধঘণ্টার মধ্যেই তাঁহাদের বিছানাপত্র পাঠাইয়া দেওয়ার তাগিদ আসিল। বুঝিতে আর বাকি রহিল না যে, বেশ কিছুদিনের জন্য বন্ধুদের *Cell-punishment* হইয়াছে। কিন্তু, কতদিনের জন্য? এ প্রশ্নের জবাব পাইতেও বেশীক্ষণ দেরী হইল না। ঘণ্টাখানেক পরেই সান্ত্রী ভিতরে আসিল একটি আদেশ-পত্র লইয়া। তাহাতে জানা গেল যে, জেলের আইন ও শৃঙ্খলা ভঙ্গের অপরাধে বন্ধুদের তিন সপ্তাহের জন্য *Cell-punishment* হইয়াছে।

কিন্তু, আর তো বসিয়া থাকা যায় না। আমাদেরও অবিলম্বে ইতিকর্ত্তব্য স্থির করিয়া ফেলিতে হয়। আলাপ-আলোচনা, তর্ক-বিতর্ক এবং সভাসমিতিতে দিনরাত কাটিয়া যাইতেছে। সংগ্রাম যে অবিলম্বে সুরু করিতে হইবে সে সম্বন্ধে কাহারও দ্বিমত ছিল না। আলাপ-আলোচনা

চলিতেছিল সংগ্রামের পদ্ধতি লইয়া। পরিস্থিতি যেখানে গিয়া পৌঁছিয়াছে সেখানে যে আমাদের শেষ অস্ত্রটি প্রয়োগ ছাড়া গত্যন্তর নাই তাহাও ক্রমশঃ স্পষ্ট হইয়া উঠিতেছিল; কিন্তু, বাহিরের জগতের সঙ্গে একেবারে বিচ্ছিন্ন অবস্থায় সে অস্ত্র প্রয়োগ, অর্থাৎ, অনশন ধর্ম্মঘট কতটা কার্য্যকরী হইবে—উহাই ছিল প্রশ্ন।

আসলে এই সংগ্রামের অধিনায়কত্ব স্বাভাবিকভাবেই বর্তিয়াছিল শ্রীযুক্ত সতীন সেন ও শ্রীযুক্ত সন্তোষ দত্তের উপর। ইহার কারণও অবশ্য ছিল।

সতীনদা (শ্রীযুক্ত সতীন সেন) তো ছিলেন বহু জেল-সংগ্রামেরই অভিজ্ঞতাপুষ্ট শ্রেষ্ঠ সৈনিক, সন্তোষ-দার উপরেও অতীতের কারাকাহিনী কম লাঞ্ছনার চিহ্ন রাখিয়া যায় নাই। বহু আলাপ-আলোচনার পরে ঠিক হইল যে, অনশন ধর্মঘটই করিতে হইবে, তবে *mass scale*-এ নয় *selective hunger strike*—সেই অনুসারে চারিটি নাম নির্দ্ধারিত হইয়া গেল।

স্থির হইল যে, আমরা দেউলীর রাজবন্দীদের তরফ হইতে একটা চরমলিপি (*Ultimatum*) সরকার এবং জেল কর্তৃপক্ষের কাছে পাঠাইব এবং তাহার আশানুরূপ উত্তর না পাইলে অনশন ধর্মঘট সুরু হইয়া যাইবে। আশানুরূপ উত্তর পাওয়া ত দূরের কথা, নির্দ্ধারিত সময়ের মধ্যে উত্তরই যে আসিবে না তাহা জানিতাম, কিন্তু, তবু সংগ্রামের যে

চিরাচরিত পদ্ধতি আছে তাহাকে তো মানিয়া চলিতেই হইবে। আমরাও তাহাই করিলাম, কিন্তু শেষ পর্য্যন্ত উত্তর আসিল না।

কর্ম্মসূচি অনুযায়ী শ্রীযুক্ত রসময় শূর, শ্রীযুক্ত কোহিনূর ঘোষ, শ্রীযুক্ত জীবন সরকার ও শ্রীযুক্ত ফণী চ্যাটার্জ্জি এই চারিজন বন্ধু অনশন ধর্ম্মঘট সুরু করিয়া দিলেন।

দিন যাইতে লাগিল। প্রথম দুই-তিন দিন অনশনব্রতী বন্ধুরা হাঁটিয়া বেড়াইয়া সকলের সঙ্গে হৈ-চৈ করিয়াই কাটাইয়া দিলেন। কিন্তু, কয়েক দিনের মধ্যেই ধীরে-ধীরে তাঁহারা শয্যাগ্রহণ করিতে বাধ্য হইলেন। অনশনের দুর্ব্বলতা তত নয়, দেউলীর প্রচণ্ড গরমই বন্ধুদের একেবারে কাবু করিয়া ফেলিল। জেলকর্তৃপক্ষ কিন্তু তবুও নির্ব্বিকার, নিশ্চিন্ত। তাঁহাদের হাবভাব, চালচলতি দেখিয়া মনে হয়, জেলের জীবনযাত্রা যেন স্বাভাবিক গতিতেই চলিতেছে ; কোথাও কিছু যে ঘটিয়াছে এমন আভাসও তাঁহাদের ভাবভঙ্গীতে প্রকাশ পায় না।

আমাদের অবস্থাটা তখন সাংঘাতিক। আমাদেরই চোখের সামনে আমাদেরই কয়েকটি বন্ধু অনশনে দিন যাপন করিতেছেন, ক্রমশই তাঁহাদের স্বাস্থ্য ভাঙ্গিয়া পড়িতেছে, অথচ আমরা আমাদের স্বাভাবিক জীবন যাপন করিতেছি। মনের দিক দিয়া ইহা যে কত দুঃসহ তাহা ভুক্তভোগী ছাড়া কেহ হৃদয়ঙ্গম করিতে পারিবে না।

কিন্তু উপায় নাই—যুদ্ধ যুদ্ধই। যুদ্ধক্ষেত্রে যুদ্ধের আইন ও শৃঙ্খলা ভঙ্গ করা যে গুরুতর অপরাধ। মায়া নাই, মমতা নাই, নিষ্ঠুরতম নীতিকে মানিয়া চলাই সেখানে সৈনিকের একমাত্র কর্ত্তব্য; নিকটতম বন্ধুর নির্ম্মম মৃত্যুর সম্মুখে দাঁড়াইয়াও একদণ্ড দুঃখ করিবার অবকাশ সেখানে নাই। এই তো যুদ্ধ!

যুদ্ধ চলিতে লাগিল। একদিকে সরকারের দুর্জ্জয় অনমনীয় মনোভাব, অন্যদিকে বন্ধু-চতুষ্টয়ের মৃত্যুপণ সঙ্কল্প। জেলকর্ত্তৃপক্ষ প্রথমটা মনে করিয়াছিলেন যে, অনশন ধর্ম্মঘটের কথাটা একটা হুমকিমাত্র—এর বেশি কিছু নয়। তাঁহারা ভাবিতে পারেন নাই যে, এত দূরদেশে, বাহিরের জগৎ হইতে একেবারে বিচ্ছিন্ন হইয়াও বন্দীরা এই পথটি অবলম্বন করিয়া বসিবে।

কিন্তু, সত্য-সত্যই যখন অনশন ধর্ম্মঘট সুরু হইয়া গেল তখন জেল-কর্ত্তৃপক্ষ একটু যে ভাবনায় না পড়িলেন এমন নয়। কিন্তু, বাহিরে তাহা প্রকাশ করা ইংরেজের স্বভাব বিরুদ্ধ। তাই ফিণে সাহেব এবং তাঁহার অধস্তন কর্ম্মচারীবৃন্দ বুক ফুলাইয়াই চলিতে লাগিলেন। তাহা সত্ত্বেও আমাদের কাছে এ কথাটা ক্রমশ স্পষ্ট হইয়া উঠিতে লাগিল যে, তাঁহাদের স্ফীত বক্ষের তলদেশ ক্রমেই ফাঁকা হইয়া আসিতেছে! ইহার প্রথম প্রমাণ পাওয়া গেল সদ্য-নিযুক্ত একজন এম-বি ডাক্তারের শুভপদার্পণে!

অনশন ধর্ম্মঘটের কয়েক দিনের মধ্যেই তিনি আসিয়া হাজির হইলেন এবং তাঁহার কথাবার্ত্তায় পরিষ্কার বুঝা গেল যে, অনশন ধর্ম্মঘটে একান্ত বিব্রত হইয়াই সরকার তাঁহাকে দেউলী বন্দীশিবিরে প্রেরণ করিয়াছেন। ডাঃ খাঁ বয়সে প্রবীণ না হইলেও বিদ্যাবুদ্ধি ও বিচক্ষণতায় স্বয়ং-সম্পূর্ণ। কথা যে তিনি শুধু বলিতে জানিতেন তাই নয়, কখন কোন্ কথাটি কোথায় বলিতে হইবে এ বিদ্যায় তিনি ছিলেন পারদর্শী। অল্প কয়েক দিনের মধ্যেই তিনি তাঁহার কথা-বার্ত্তায়, ব্যবহারে এবং সৌজন্যে সকলের কাছেই জনপ্রিয় হইয়া উঠিলেন।

প্রথম দিনই জেলের মধ্যে ঢুকিয়া তিনি সটান গিয়া হাজির হইলেন অনশনব্রতীদের ঘরে। তাঁহাদেরই শয্যাপার্শ্বে বসিয়া তাঁহাদের সঙ্গে গল্প জুড়িয়া দিলেন; বলিলেন, অনশন-ব্রতীদের দুঃখে চিত্ত তাঁহার ভারাক্রান্ত। অনাহারে এই অমূল্য জীবনগুলি শেষ হইয়া যাইবে, এ হইতেই পারে না। যে করিয়াই হউক ইহাদের বাঁচাইয়া রাখিতেই হইবে!

বলিলেন, কে জানে এই রাজবন্দীদের মধ্যে এমন কেহ নাই যিনি ভবিষ্যতে ডি ভ্যালেরা কিংবা ষ্ট্যালিনের মত জাতির ভাগ্য একদিন নির্ণয় করিবেন না! অন্তরের সমগ্র অনুভূতি দিয়াই যে ডাঃ খাঁ কথাগুলি বলিতেছিলেন সে-বিষয়ে আমাদের কোন সন্দেহ ছিল না। পরাধীন জাতির স্বাধীনতা সংগ্রামের ইতিহাস তিনি হয় তো কিছু জানিতেন, কিন্তু যে

কথাটা জানিতেন না তাহা হইতেছে এই যে, ষ্ট্যালিন, ডি ভ্যালেরা হইতে স্থরু করিয়া পরাধীন জাতির ইতিহাস যাঁহারা গড়িয়াছেন, জীবনে তাঁহাদের বহু দুঃখের সমুদ্রেই পাড়ি জমাইতে হইয়াছে।

এমনি করিয়া দেখিতে-দেখিতে দশ দিন পার হইয়া গেল। জেল-কর্ত্তৃপক্ষের তবুও কোন ভ্রূক্ষেপ নাই। এদিকে ডাঃ খাঁ বেচারী দিনরাত ছুটাছুটি করিতে করিতে হাঁপাইয়া উঠিয়াছেন। এগারো দিনের দিন ভোরে ফণী চ্যাটার্জীর অবস্থা সত্যই আমাদের ভাবাইয়া তুলিল। আগের দিন তিনি সামান্য জলটুকু খাওয়া পর্য্যন্ত বন্ধ করিয়া দিয়াছিলেন। ইহারই ফলে ভোরবেলা তাঁহার নাড়ীর অবস্থা রীতিমত খারাপ হইয়া উঠিল। সংবাদ পাইয়া ডাঃ খাঁ আসিলেন, বহুক্ষণ ধরিয়া ফণীবাবুকে পরীক্ষা করিলেন। তিনি মুখে অবশ্য বিশেষ কিছু বলিলেন না, কিন্তু, বেশ দেখিতে পাইলাম তাঁহার প্রফুল্ল মুখও বিষণ্ণ হইয়া উঠিয়াছে, শঙ্কার ভাব তাঁহার চোখেমুখে সুস্পষ্ট।

ডাঃ খাঁ চলিয়া গেলেন। কিছুক্ষণ পরেই জেল আফিস হইতে শ্রীযুক্ত সতীন সেন ও শ্রীযুক্ত সন্তোষ দত্তের ডাক আসিল। বেশ বুঝা গেল এতদিনে ফিগে সাহেবের টনক নড়িয়াছে। কিন্তু টনক নড়িলে কি হইবে, ইংরেজের বংশধর হার মানিলেও সহজে কি তা স্বীকার করিতে চায়? আপোষ-আলোচনার

কথা অবশ্য চলিল, কিন্তু মীমাংসায় আসা তো আর সহজ নয়! ফিণে সাহেব একদিক দিয়া একটু ছাড়িতে রাজি হইলে আবার অন্যদিক্ দিয়া দ্বিগুণ আঁটিতে চেষ্টা করেন। কথাবার্ত্তায়, বাক্‌বিতণ্ডায় এমনি করিয়া আরো তিন-চার দিন গেল। এদিকে শুধু ফণী চ্যাটার্জ্জিই নয়, একে একে সকলের অবস্থাই খারাপ হইতে লাগিল। একটা অনিশ্চিত আশঙ্কার কালোছায়া যেন সমগ্র জেলটিকেই ছাইয়া ফেলিল।

ষোল দিনের কথাবার্ত্তায়ও যখন কোন সুরাহা হইল না তখন স্থির হইল আপোষ-আলোচনার সূত্র আর টানা হইবে না, এখানেই উহা শেষ করা হইবে। এই সংবাদ ফিণে সাহেবের কাছে পৌঁছিবামাত্র তিনি নিজে আসিয়া জেলের মধ্যে হাজির হইলেন, কথাবার্ত্তা বলিতে বলিতে সতীন-দা ও সন্তোষ-দাকে লইয়া চলিয়া গেলেন অফিস ঘরে। সেখানে কথাবার্ত্তা সব পাকাপাকি হইয়া গেল। আমাদের সমস্ত দাবীগুলি সরকার মানিয়া লইলেন।

মুহূর্ত্তের মধ্যে সমস্ত জেলে একটা আনন্দের ঢেউ উঠিল। জয়-গৌরবের কলকোলাহলে মুখর হইয়া উঠিল সমগ্র পরিবেশ। বিজয়ী সৈনিক চতুষ্টয়ের চারিদিকে সকলে আসিয়া ভিড় জমাইয়াছে। তাহাদেরই মাঝখানে সতীন-দা ও সন্তোষ-দা সবিস্তারে বর্ণনা করিতেছেন ফিণে সাহেবের সঙ্গে কি-কি কথা তাঁহাদের হইয়াছে।

এইভাবে দেউলী সংগ্রামের প্রথম পর্ব্ব শেষ হইয়া গেল!

যে-যে বন্ধুদের *Cell-punishment* হইয়াছিল তাঁহারা সকলেই ঘরের ছেলে ঘরে ফিরিয়া আসিলেন,—'বসু মহাশয়,' যাঁহাকে লইয়া এত কাণ্ডের সূত্রপাত, তিনিও আসিলেন। দেউলী জেলের স্বাভাবিক জীবনযাত্রা আবার সুরু হইয়া গেল।

কয়েকটা দিন শুধু বিগত সংগ্রামের আলাপ-আলোচনায় কাটিল। সংগ্রামের দিনগুলিতে মন খুলিয়া কেহ বড় একটি কথাবার্ত্তা বলিতে পারে নাই, সকলেই কর্ত্তব্যের দায়ে যাহা করণীয় করিয়া গিয়াছে। প্রতিদিনের জমানো কথা এখন যেন মুক্তির নিঃশ্বাস ফেলিয়া বাঁচিল—এখন শুধু, কথা আর কথা।

ইহার মধ্যে একটি লোককে তেমন কথা বলিতে দেখি নাই, তিনি আমাদের ফণী দত্ত মহাশয়। সংগ্রামের দিনগুলিতে তিনি যেমন নির্ব্বাক-নিস্পন্দ ছিলেন, ঠিক যেন এখনও তিনি প্রাণ খুলিতে পারিতেছেন না। ব্যাপার কি?

কথাটা ফণীবাবুকেই জিজ্ঞাসা করিবার জন্য আমরা কয়েকজন সটান তাঁহার কাছে গিয়া হাজির হইলাম। তখন বেলা প্রায় নয়টা, কিন্তু, ফণীবাবু তখনও শয্যাত্যাগ করেন নাই।

কাছে যাইতেই ফণীবাবু বলিলেন, 'একটা মজার স্বপ্ন দেখছিলাম, তাই উঠতে দেরি হোয়ে গেল। কি দেখছিলাম জানেন? দেখছিলাম, আমি *hunger-strike* করেছি!' —এই বলিয়া ফণীবাবু হাসিয়া উঠিলেন।

আমি বলিলাম, 'কেন, এতে হাসবার কি আছে ফণীবাবু, জেলখানায় যে-কোনদিনই তো এ স্বপ্ন সত্য হোয়ে উঠতে পারে।'

'তা পারে না,' একটি আঙ্গুল নাড়িয়া সহাস্যে ফণীবাবু বলিলেন, 'আমি প্রতিজ্ঞা করেছি, জেলখানায় না খেয়ে মরে যাব তবু *hunger-strike* করব না!' এই বলিয়া ফণীবাবু ঘন-ঘন ঘাড় নাড়িতে লাগিলেন।

সতের

অন্ধরাত্রির শেষে যেন আলোকের উৎসব সুরু হইয়া গেল!

যতদিন কর্তৃপক্ষের বিরুদ্ধে ছিল রাজবন্দীদের সংগ্রাম ততদিন বন্ধুদের জীবনের স্বতঃ-উৎসারিত প্রাণবন্যার পথটি ছিল বন্ধ। সংগ্রামের শেষে পথের বাঁধাটি যখন ঘুচিল, রুদ্ধস্রোত তখন আবার ছুটিল তাহার গতিপথে। আলোকে ও আনন্দে দেউলী জেলের জীবন-যাত্রা আবার ভাস্বর হইয়া উঠিল। গানের আসর, খেলাধূলার বৈঠক, সাহিত্যের সভা সবই আবার জমজমাট হইয়া উঠিল।

দেউলী জেলে, আর শুধু দেউলী জেলেই বা বলি কেন, সব জেলেই বন্দীদের প্রধান এবং প্রকৃষ্টতম প্রকাশের ক্ষেত্র হইতেছে গানের রাজ্য। এ রাজ্যের একটা সুবিধা ছিল এই যে, ইহার মধ্যে প্রবেশ করিতে পারিতেন সকলেই, এ বিদ্যা যাঁহার আয়ত্তে আছে তিনিও; যাঁহার একেবারে কিছু নাই তিনিও।

সত্য কথা বলিতে কি, গায়ক আমরা সকলেই, কাহারও গান প্রকাশযোগ্য আবার কাহারও গান 'সারা জনমের তরে' মনের অভ্যন্তরে চির-নির্ব্বাসিত। কিন্তু, তাহা সত্ত্বেও আমরা যে প্রত্যেকেই আমাদের নিজেদের কাছে এক একজন গায়ক, সে বিষয়ে কোন সন্দেহ নাই। সে-গান কেহ কোনদিন শোনে নাই, কোনদিন কেহ হয় তো শুনিবেও না, কিন্তু, তবু কত দীর্ঘদিন, কত দীর্ঘরাত্রি যে নির্জন কারাবাসে দুর্দ্দিনের চির-সাথী এই অশ্রুত সঙ্গীত, বন্দীজীবনের শুষ্ক, নীরস, নিষ্ঠুর দিনগুলিকে রস-ঘন করিয়া তুলিয়াছে, বন্দী বন্ধুদের তো আর সে-কথা অজানা নাই।

জীবন বাবু (শ্রীযুক্ত জীবন সরকার) সেইজন্যই দুঃখ করিয়া বলিতেন, সঙ্গীতজ্ঞদের গানের আসরে আমরা জায়গা পাই না, কিন্তু, ওঁরা কি জানেন যে, ঐ আসরের শ্রেষ্ঠ শিল্পীবৃন্দ মিলিয়া সারা জীবনে যত গান গাহিয়াছেন, আমি একাই তত গান গাহিয়াছি ?

কথাটা জীবনবাবু মিথ্যা বলেন নাই। গান যখন তাঁহাকে পাইয়া বসিত তখন চলিতে-ফিরিতে, শুইতে-বসিতে

সর্ব্বক্ষণই তিনি গানের সুর ভাঁজিতেন। গান সম্পর্কে জীবনবাবু ছিলেন স্বাতন্ত্র্য-ধর্ম্মী। বাঁধাধরা কোন সুর, কিংবা কোন তাল-লয়ের *convention* তিনি মানিয়া চলিতেন না। সুরও যেমন ছিল তাঁহার নিজস্ব, গানের পদ্ধতিটিও ছিল তাঁহার স্বতন্ত্র! তাহা ছাড়া অদ্ভুত ছিল তাঁহার ধৈর্য্য। ঘন্টার পর ঘন্টা গান গাহিয়া চলিয়াছেন, বন্ধু-বান্ধবেরা সে গান শুনিয়া দূরে পলাইয়া যাইতেছে, কেহ বা কাছে আসিয়া তাঁহাকে থামাইতে চেষ্টা করিতেছে, কিন্তু সাধ্য কি যে জীবনবাবুর সঙ্কল্পচ্যুতি ঘটায়! একের পর একটি গান তিনি গাহিয়াই চলিয়াছেন। সর্ব্বাঙ্গে অবিরত ধারায় ঘাম ঝরিতেছে, ঘন-ঘন নিঃশ্বাসে বক্ষ তাঁহার উঠানামা করিতেছে, কণ্ঠের নালীগুলি স্ফীত হইয়া উটিয়াছে; কিন্তু তবু জীবন বাবুর ভ্রূক্ষেপ নাই, অবিশ্রান্ত গতিতে গান তাঁহার চলিতেছে! গানের কথা সম্পর্কেও সংস্কারমুক্ত ছিল তাঁহার মনটি। তাই দেখিয়াছি, 'সকালে উঠিয়া আমি মনে মনে বলি' হইতে সুরু করিয়া 'অস্তি গোদাবরী তীরে বিশাল শাল্মলী তরু' পর্য্যন্ত যে কোন পদকেই তাঁহার নিজস্ব সঙ্গীতাবর্ত্তে ফেলিয়া জীবনবাবু তাঁহার অভিনব পদ্ধতিতে অনর্গল গান গাহিয়া যাইতেন। সুরের কোন বালাই ছিল না, 'সকালে উঠিয়া আমি মনে মনে বলি' আর 'অস্তি গোদাবরী তীরে' প্রভৃতি যাবতীয় গানের কথা জীবনবাবুর কণ্ঠে একই সুরের ছকে উচ্ছল হইয়া উঠিত।

জীবনবাবুর আর একটি অভ্যাসও ছিল। সেটা আরো মারাত্মক! মাঝে-মাঝে তিনি 'সঞ্চয়িতা', 'চয়নিকা', 'মেঘনাদ বধ কাব্য' প্রভৃতি গাহিতেন! দেউলীর ঐ গ্রীষ্মতাপদগ্ধ দ্বিপ্রহরেই জীবনবাবুর হয় তো একদিন গানের ঝোঁক চাপিয়া বসিল! আর কথা নাই, অমনি তিনি সুর ভাঁজিতে সুরু করিলেন!

বন্ধুরা বুঝিলেন, আর রক্ষা নাই, জীবনবাবুর ঘাড়ে এবার গানের ভূত চাপিয়াছে! সঙ্গে-সঙ্গেই জীবনবাবুর উচ্চকণ্ঠ গর্জ্জন করিয়া উঠিল, প্রথমে সাবধানবাণী উচ্চারিত হইল! জীবনবাবু ঘোষণা করিলেন—'আজ আমার সঞ্চয়িতা গান।'

প্রাণটা সকলেরই কাঁপিয়া উঠিল। কেহ-কেহ বলিল, 'জীবনবাবু এখন থাক্, সন্ধ্যার পরে গানটা জমবে ভাল।' কিন্তু, কে কার কথা শোনে! যে সুর ভিতর হইতেই উথলিয়া উঠিতেছে তাহাকে রোধ করিবে কে? একটি-একটি করিয়া 'সঞ্চয়িতা'-র প্রতিটি কবিতাকে নিজস্ব ঢঙে গাহিয়া তবে তিনি ছাড়িতেন! এমনি ছিল সঙ্গীতে তাঁহার উৎসাহ। তাই তিনি যখন বলিতেন যে, 'ওরা আমাকে গানের আসরে ঢুকতে দেয় না,' তখন কথাটা যে কত দুঃখে বলিতেন তাহা অতি সহজেই অনুমান করা যায়!

জীবনবাবুর গান সম্পর্কে নানা গল্প ও নানা কাহিনী নানাভাবেই প্রচারিত হইয়াছিল। এসব প্রচার কার্য্য সম্পর্কে ফণীবাবু বলিয়াছেন যে, ইহাদের অধিকাংশই নাকি অতিরঞ্জিত।

তবে একটা গল্প যে তাঁহার সম্পর্কে শোনা যায় তাহা গল্প হইলেও নাকি সত্য। ঘটনাটি ঘটিয়াছিল বাংলাদেশেরই একটি জেলে।

জীবনবাবুর তখন বন্দী-দশা সবে আরম্ভ। পুলিশের হেফাজতে বহু কিছু খাইয়া এবং না খাইয়া তিনি সবেমাত্র জেলের মধ্যে প্রবেশ করিয়াছেন। মনটা তাঁহার প্রফুল্লই ছিল বলিতে হইবে। হউক না জেল, তবু তো পুলিশের হাত হইতে চিরতরে মুক্তি! সাধারণ দু-একজন কয়েদি ছাড়া জীবনবাবুর আর কোন সাথী ছিল না, সুতরাং তাঁহার সঙ্গীত ছিল এই নির্জ্জন কারাবাসের একমাত্র সঙ্গী। এই সঙ্গীকে লইয়াই জীবনবাবু একদিন মহা বিপদে পড়িয়া গিয়াছিলেন।

গরমের দিন। রাত্রি প্রায় শেষ হইতে চলিল, কিন্তু জীবনবাবুর আর কিছুতেই সারারাত্রি ঘুম হইল না। একবার শয্যায় গড়াগড়ি করিতেছেন, একবার ক্ষুদ্রকক্ষে পায়চারি করিতেছেন কিন্তু, সবই বৃথা, ঘুম কিছুতেই আসিতেছে না। অনন্যোপায় হইলে সকল বন্দীরাই যাহা করেন, জীবনবাবুও তাহাই করিলেন। তিনি গান ধরিলেন—'চয়নিকা' গান।

নিঝুম—নিস্তব্ধ রাত।

চারিদিকে কোন সাড়াশব্দ নাই। সেই স্তব্ধতা ভেদ করিয়া নৈঃশব্দের অতল তল হইতে জীবনবাবুর জলদগম্ভীর কণ্ঠ গর্জ্জন করিয়া উঠিল :

"ভাঙরে হৃদয়, ভাঙরে বাঁধন,
সাধরে আজিকে প্রাণের সাধন,
লহরীর পর লহরী তুলিয়া
আঘাতের পর আঘাত কর্,—"

জীবনবাবুর রুদ্ধ কক্ষের প্রতিটি ইট, জেল প্রাচীরের প্রতিটি প্রস্তরখণ্ড, সমগ্র জেলের পরিবেশ যেন একই সঙ্গে জীবনবাবুর কণ্ঠে কণ্ঠ মিলাইয়া চীৎকার করিয়া উঠিল, 'আঘাতের পর আঘাত কর্'—আঘাত অবশ্য আর করিতে হইল না। জেলসান্ত্রীর একাধিক বাঁশি সঙ্গে-সঙ্গে বাজিয়া উঠিল, জেলগেটে পাগলা-ঘণ্টির আওয়াজ শোনা গেল। মূহুর্ত্তের মধ্যে জেলের নৈশ-স্তব্ধতা ভঙ্গ করিয়া সশস্ত্র সান্ত্রীর দল পাগলের মত ছুটিল জীবনবাবুর কক্ষের দিকে। এত কাণ্ড যে ইহার মধ্যে হইয়া গিয়াছে, সে-দিকে জীবনবাবুর ভ্রূক্ষেপ নাই। তিনি তখনও চোখ বুজিয়া গাহিতেছেন, 'আঘাতের পর আঘাত কর্—' সান্ত্রীরা তো জীবনবাবুর কক্ষে আসিয়া একেবারে থ' খাইয়া গেল। কে একজন বলিল, 'কুঁছ নেহি হুয়া ভাই, বাবু তো গানা গা রহে হেঁ!'

সান্ত্রীরা হতাশ হইরা ফিরিয়া গেল। ঐ জেলে জীবনবাবু বাকি যে ক-দিন ছিলেন রাত্রিতে নাকি আর কোনদিন গান গাহেন নাই!

ইহার পরে ফণীবাবুকে প্রায়ই বলিতে শোনা যাইত যে, 'জীবনবাবু তো গান গাহেন না, তিনি 'গান' (*Gun*) দাগেন!' জীবনবাবু কিন্তু, এসব কথায় বিন্দুমাত্রও দমিতেন না।

এটা তো গেল গানের আসরের বাহিরের দিক। দেউলী জেলের গানের আসরটি বিখ্যাত সুরশিল্পী ও সমঝদারদের সমাবেশে কম সমৃদ্ধ ছিল, একথাটা কিছুতেই বলা চলে না!

শ্রীযুক্ত অনিল রায় ও শ্রীযুক্ত মহেন্দ্র ব্যানার্জ্জী এই সুর শিল্পীদ্বয়কে বাদ দিয়া তো দেউলীর গানের আসর কল্পনাও করা যাইত না। ইহাদের ঘিরিয়া আরো যে-সব শিল্পী বিরাজ করিতেন তাঁহারাও এই আসর জমানোর কাজে বড় কম সাহায্য করিতেন না। ইহাদের পরেই আসে সমঝদারদের কথা।

সমঝদারদের সংখ্যা যে কত ছিল, ঠিক করিয়া বলা কঠিন, তবে এটা ঠিক যে, এই সমঝদারদের মধ্যেও শ্রেণী-বিভাগ ছিল। যাঁহারা প্রথম শ্রেণীর তাঁহারা আসরে ঢুকিয়া সরাসরি একেবারে ওস্তাদের কাছ ঘেসিয়া বসিতেন; আর যাহারা আধা-সমঝদার তাঁহারা আসরের অভ্যন্তরে প্রবেশ করিলেও বসিতেন আসরটির সীমান্ত-রেখা ঘিরিয়া। এই আধা-সমঝদারদের লইয়াই ছিল মুস্কিল। গানের আসরে সীমান্তবর্ত্তী হইলে কি হইবে, আসরের বাহিরে তাঁহারা একেবারে সঙ্গীতের মধ্যবর্ত্তী! গানের তান, লয় ও রাগ-রাগিনী লইয়া আলাপ-আলোচনায় আসল সমঝদারদেরও তাঁহারা হার মানাইয়া ছাড়িতেন! ফয়েজ খাঁ হইতে সুরু করিয়া কমলা ঝরিয়া পর্য্যন্ত কেহই তাঁহাদের সমালোচনার গণ্ডীর বাহিরে থাকিতে পারিতেন না। এমনি ছিল তাঁহাদের শক্তি!

দেউলী সঙ্গীতাকাশের আর একটি নক্ষত্রের কথা না বলিলে এ কাহিনী একেবারেই অসম্পূর্ণ থাকিয়া যাইবে। তিনি গায়ক না হইয়াও গায়ক-শ্রেষ্ঠ, সমঝদার না হইয়াও মূল সমঝদার, এক কথায় বলিতে গেলে তিনি ছিলেন গানের আসরের প্রাণ! হিন্দী গানের ভাষ্য করিয়া দেওয়া, কবিতার ছন্দে তাহার বাঙ্গলা রূপান্তর প্রভৃতি কাজ এত তাড়াতাড়ি বীরেনদা-র (শ্রীযুক্ত বীরেন্দ্র চ্যাটার্জি) মত আর কেহ করিতে পারিতেন না। বীরেনদাকে বিশেষ কর্ম্মতৎপর দেখা যাইত, নূতন রেকর্ডের আসরে। এই রেকর্ডের আসরেরও একটা ইতিবৃত্ত আছে। সে ইতিবৃত্তের কাহিনীর সঙ্গে পরিচয় ঘটিলেই বুঝিতে আর বাকি থাকিবে না যে, দেউলী জেলে ঐ রেকর্ডের আসরটি এবং বীরেনদা, আমাদের জীবন যাত্রার উপর কতখানি রস বর্ষণ করিয়াছেন!

দেউলীর খরতাপে, জেল-কর্ত্তৃপক্ষের নিষ্ঠুর আচরণে প্রতিদিনের জীবন আমাদের যখন একান্ত দুর্ব্বহ হইয়া উঠিতেছিল, দেউলী জেলের দিনগুলি যখন তৃষাদীর্ণ মরু প্রান্তরের এক টুকরা ওয়েসিসের জন্য পাগল হইয়া উঠিতেছিল; ঠিক সেই মুহূর্ত্তে একদিন রাত্রিশেষে কোথা হইতে যেন একটি নিবিড় সুরের তরঙ্গ সকলকে সচকিত করিয়া তুলিল।

ভোরের হাওয়ায় তন্দ্রাতুর অলস চোখ দুইটি মেলিবার ইচ্ছাও ছিল না, সাধ্যও ছিল না, কিন্তু, স্পষ্ট শুনিতে পাইলাম,

দূর-দূরান্ত হইতে একটি সুরের লহর যেন বাতাসে কাঁপিয়া কাঁপিয়া সমগ্র জেলটিকে প্রদক্ষিণ করিতেছে। কে গায়? কাহার কণ্ঠ? কাহার সুর?

মনে হইতেছিল, সুর-সমুদ্রের একটি তরঙ্গ যেন কোনক্রমে বিচ্ছিন্ন হইয়া এই মরুময় প্রান্তরে পথ হারাইয়া ফেলিয়াছে। সেই হারানো পথের সন্ধানে, সেই উচ্ছল সমুদ্রের উদ্দেশে যাত্রা করিবার আকুল আগ্রহে সে ধ্বনির তরঙ্গ অধীর আগ্রহে আবেগচঞ্চল হইয়া উঠিয়াছে। কিন্তু, আর তো শুইয়া থাকা যায় না। উঠিয়া বসিলাম। দেখিলাম এক এক করিয়া লোক চলিয়াছে পঞ্চাননবাবুর ঘরের দিকে। সেখানে পৌঁছিয়া দেখিলাম, ইতিমধ্যেই ঘরটি তাঁহার ভরিয়া গিয়াছে। পঞ্চানন বাবুর নূতন গ্রামোফোনটি নূতন রেকর্ডের সান্নিধ্যে মুখর হইয়া উঠিয়াছে। এতদিন গ্রামোফোনটী ছিল জেলের বাহিরে, অনেক চেষ্টা-চরিত্রের পর গতকল্য উহা ভিতরে আসিয়াছে। নূতন কিছু রেকর্ডও আছে সঙ্গে।

সংবাদটি পঞ্চাননবাবু গোপন রাখিয়াছিলেন। বিষয়টি তিনি ও তাঁহার দুই-তিন জন বন্ধু ছাড়া আর কেহ জানিতেন না। এই গোপনীয়তাই রাত্রি শেষে বন্ধু মহলে এতটা বিস্ময়ের সৃষ্টি করিয়াছে। দেখিতে-দেখিতে পঞ্চাননবাবুর ঘর শুধু নয়, বাহিরের প্রাঙ্গণও ভরিয়া গেল! না ভরিয়া উপায় ছিল না। আকণ্ঠ তৃষ্ণায় যখন ছাতি ফাটিয়া যাইতেছে তখন অকস্মাৎ চোখের সামনে উথলিয়া

উঠিল জলভরা নদী! নদীর পারে তখন আর তৃষিত চাতকের দল ভিড় জমাইবে না কেন?

এমনি করিয়া রেকর্ডের আসরের সৃষ্টি। ইহার পরে মাসে দুইবার না হইলেও অন্ততঃ একবার করিয়া নূতন রেকর্ড আসিত! কয়েকটি দিন আর কোন কাজ থাকিত না, শুধু এখানে ওখানে নূতন নূতন গান শোনা। শুধু গান শোনাইতো নয়, ঐ গানেই যে মুহূর্তের জন্য আমরা বাইরের জগৎকে স্পর্শ করিতাম। বন্দীর জীবনে এ সুযোগের মূল্য যে কতখানি, বন্দী ছাড়া তাহা আর কে বুঝিবে?

রেকর্ডের আসর এমনি করিয়া জমিয়া উঠিল! হিন্দী গান আসিলেই বীরেনদার ডাক পড়িত। আমরা যাঁহারা হিন্দী গান তো দূরের কথা, 'হিন্দী বাৎ'-ও বুঝিতাম না, তাঁহারাই বীরেনদাকে খোঁজ করিতাম সবচেয়ে বেশি। কারণ একে তা ওস্তাদী গান, তাহার উপরে আবার হিন্দী! ওস্তাদের বাংলা গানের কথাই বুঝিয়া ওঠা কঠিন, হিন্দী হইলে তো আর উপায়ই নাই। তাই বীরেনদাকে বাদ দিয়া এ দুস্তর সাগর পাড়ি দেওয়া আমাদের পক্ষে ছিল একেবারে অসম্ভব। বীরেনদারও সে দিকে কোন আলস্য কিংবা শৈথিল্য ছিল না, ডাক দিলেই হইল।

একটি দিনের কথা আজও মনে আছে। রেকর্ডের আসর বসিয়াছে। বীরেনদা নিবিষ্ট হইয়া একটি গান শুনিতেছেন এবং গুন-গুন করিয়া সে গানের সুর

ভাঁজিতেছেন। গানটি শুনিতে ভালই লাগিল, কিন্তু ওস্তাদের ওস্তাদী দাপটে গানের পদটি যে কি অনেক চেষ্টা করিয়াও তাহা উদ্ধার করিতে পারিলাম না। বাধ্য হইয়াই বীরেনদার শরণাপন্ন হইতে হইলাম।

বীরেনদা বলিলেন, 'চমৎকার গান হে—'আশাবরী! বুঝতে পারলে না?'

বলিলাম, 'আশাবরী' না 'জৌনপুরী', তা দিয়ে আমার কি হবে, গানের পদটি কি বলুন।

নিঃসঙ্কোচে বীরেনদা বলিলেন, 'কেন, পদটি হচ্ছে, 'ওগো বড়মিঞা, তোমার ঘরের টঙে কাঁদে খাঁচার টিয়া।'

বীরেনদা চলিয়া গেলেন, কিন্তু মনের মধ্যে একটা খট্‌কা রহিয়া গেল। ওস্তাদী গান অবশ্য পদলালিত্যের ধার ধারে না, তবু একেবারে বড়মিঞাকে নিয়া সুরু! মনটা যেন কিছুতেই সায় দিতেছিল না। সন্দেহ দূর করিবার জন্য পঞ্চাননবাবুর ঘরে গিয়া রেকর্ডটি খুলিলাম, কিন্তু একি! রেকর্ডের গায়ে যে লেখা আছে,—

"ওগো মরমিয়া,
তোমার গানের সুরে কাঁদে
আমার হিয়া।"

আঠার

রেকর্ডের আসরকে কেন্দ্র করিয়া দেউলীর আসর আবার গরম হইয়া উঠিল। কিছুদিনের জন্য জেলের অধিবাসীরা মরুভূমির অসহ্য খরতাপের কথা ভুলিল, অভাব-অভিযোগের কথা ভুলিল, জেল-কর্ত্তৃপক্ষের দুর্ব্ব্যবহারের কথা ভুলিল। সঙ্গীত সবাইকে যেন একটা নূতন দেশে লইয়া গেল, সেখানে শুধু আলো আর আনন্দ, শুধু হাসি আর উচ্ছ্বাস। সকাল হইতে সন্ধ্যা, আবার সন্ধ্যা হইতে রাত্রি পর্য্যন্ত শুধু গান আর গান। ভাল জুৎসই রেকর্ড হইলে তো কথাই নাই, সে রেকর্ডকে বহুবার বাজাইয়া রেকর্ডের সে গান কণ্ঠে উঠাইয়া তবে মুক্তি।

এমনি ভাবে দিন যাইতে লাগিল। গান হয়তো কোন কোন সময় থামিত,—কিন্তু গানের ঢেউ? তাহাকে থামায় সাধ্য কার? সে ঢেউ যে কত জায়গায় কত বেরসিকদের শুষ্ক মনে সাড়া জাগাইয়াছে তাহা আজ মনেও নাই, কিন্তু একটি কথা মনে আছে যে, সেদিন উচ্চকণ্ঠেই হউক আর গুন-গুন করিয়াই হউক, প্রকাশ্যেই হউক আর গোপনেই হউক, গান গাহিতেন না, এমন কেউ হয়তো দেউলীতে ছিলেন না।

একটি দিনের কথা বলি। ভোরবেলা কিচেনের সামনে চায়ের আসর বসিয়াছে। গল্পগুজব, আলাপ-আলোচনা, হাসি-তামাসায় আসরটি বেশ জমিয়া উঠিয়াছে, এমন সময় হন্তদন্ত হইয়া শ্রীযুক্ত ফণী চ্যাটার্জ্জি মহাশয় আসিয়া হাজির। হৈ-হল্লা থামিয়া গেল। ফণীবাবুর চেহারা দেখিয়া অনেকেরই মনে হইল যে, নিশ্চয় কোন দুঃসংবাদ তিনি বহন করিয়া আনিয়াছেন। তাই সকলে প্রায় সমস্বরে প্রশ্ন করিলেন, —'ব্যাপার কি ফণীবাবু—কি হয়েছে?'

গম্ভীর মুখে ফণীবাবু বলিলেন, 'আর রক্ষে নেই, সর্ব্বনাশ হোয়ে গ্যাছে।'

কি সর্ব্বনাশ হইয়াছে শুনিবার জন্য সকলেই উৎকণ্ঠিত হইয়া উঠিলেন—প্রশ্নবাণে ফণীবাবুকে জর্জ্জরিত করিয়া ফেলিলেন সকলেই, কিন্তু ফণীবাবুর মুখে শুধু একটি কথা, 'সর্ব্বনাশ হোয়েছে।'

'কি হয়েছে বলুন না ?' এবার রীতিমত সকলেই চটিয়া উঠিয়াছেন।

ফণীবাবু বলিলেন, 'আমি সে-কথা নিজের মুখে বলতে পারব না ভাই, ঐ ঘরে গিয়ে দেখে এস। সকলে নয়, দু-একজন শুধু যাও। খুব চুপিচুপি যাবে।' এই বলিয়া ফণীবাবু আঙ্গুল দিয়া যে ঘরটি দেখাইয়া দিলেন, সে ঘরটিতে থাকিতেন বয়োবৃদ্ধ শ্রীযুক্ত হেমচন্দ্র ঘোষ এবং তাঁহারই 'সোদরপ্রতিম' শ্রীযুক্ত আশুতোষ কালী মহাশয়।

চুপিচুপি যোগেশবাবু (শ্রীযুক্ত যোগেশ চক্রবর্ত্তী) সেই ঘরের দিকে গেলেন। যোগেশবাবু ছিলেন এইসব ব্যাপারে একেবারে সিদ্ধহস্ত, তাঁহাকে কিছু বলিতে হইত না, বলার আগেই কাজটি সুসম্পন্ন করিয়া তিনি ফিরিয়া আসিতেন। এবারও তাহাই হইল। নিমেষের মধ্যে যোগেশবাবু ফিরিয়া আসিলেন এবং একেবারে প্রায় একহাত জিব বাহির করিয়া সকলের সামনে দাঁড়াইলেন ! বুঝা গেল ব্যাপারটা গুরুতর কিছু নয়, তবু কি ব্যাপার জানিবার জন্য সকলেরই কৌতূহল চরমে উঠিয়াছিল, সকলেরই মুখে এক প্রশ্ন, 'কি, বলুন না যোগেশবাবু।'

যোগেশবাবু তবুও কিছু বলেন না, কেবল জিব কাটেন। অনেক সাধ্য-সাধনার পরে তিনি বলিলেন, 'সত্যি সর্ব্বনাশ হয়েছে, হেমদা গুণ-গুণ কোরে গান গাইছেন। আমি স্পষ্ট শুনলাম, হেমদা গাইছেন—

"বল, বল, বল সবে—
শত বীণা বেণুরবে,
ভারত আবার জগৎ সভায়
শ্রেষ্ঠ আসন লবে—"

কথাটা হয়তো সত্য, কিন্তু এই সামান্য ঘটনাটুকু এত আলোড়নের সৃষ্টি কেন করিল ? কারণ একটা অবশ্যই আছে। একটু বিস্তারিত করিয়া না বলিলে তাহা হৃদয়ঙ্গম করা যাইবে না।

দেউলী জেলের প্রথম দফায় যে-সব ডেটেনিউরা আসিয়াছিলেন শ্রীযুক্ত হেমচন্দ্র ঘোষ ও শ্রীযুক্ত হরিকুমার চক্রবর্ত্তী ছিলেন তাঁহাদের সকলের মধ্যে বয়োবৃদ্ধ। ইঁহাদের দুইজনের মধ্যে কর-গুণতিতে হরিদা কিছুদিনের বড় হইবেন, কিন্তু, তাঁহাদের দুইজনের মধ্যে যে সম্বন্ধ ছিল তাহাতে দুইজনকে সমবয়স্ক বলিলেও অত্যুক্তি হইবে না। এই বৃদ্ধদের কথা না বলিলে শুধু দেউলী জেল কেন, কোন, জেল-জীবনের কাহিনীই সম্পূর্ণ হয় না। কারণ, ইংরেজের আমলে প্রথম মহাযুদ্ধের পূর্ব্ব হইতে ইংরেজ রাজত্বের শেষ দিনটি পর্য্যন্ত রাজনৈতিক কারণে ধরপাকড় যতবার হইয়াছে ইঁহারা সে ধরপাকড়ের বেড়াজাল হইতে একবারও বাদ যান নাই।

সত্যকথা বলিতে কি, জেল-জীবনের বর্ষগণনা করিলে এই বৃদ্ধদের অনেকেরই হয়তো 'পেনসন্' লওয়ার সময় হইয়া গিয়াছিল, কিন্তু ইংরেজসরকার বড়ই সদাশয়, তাই দেখিয়াছি

মুক্তহস্তেই এই প্রবীণতম বিপ্লবীদের *Extension of service* তাঁহারা মঞ্জুর করিয়াছেন! তাহার ধাক্কায়, 'পেনসন্' ভোগ আর তাঁহাদের অদৃষ্টে জোটে নাই, ইংরেজ রাজত্বের শেষ অধ্যায়েও জেল-ভোগ তাঁহাদের করিয়া যাইতে হইয়াছে!

এই বয়োবৃদ্ধদের জন্য সমগ্র তরুণ ডেটেনিউদের প্রাণেই একটি শ্রদ্ধার আসন নির্দ্দিষ্ট ছিল। কারণ, ইঁহাদের জীবনের সব কথা না জানিলেও এই কথাটি তাহারা জানিত যে, বাংলার বিপ্লববাদের গোড়াপত্তনে ইঁহাদের ত্যাগ, ইঁহাদের অধ্যবসায়, ইঁহাদের নীরব নেতৃত্ব কী প্রেরণা জোগাইয়াছে। পরাধীনতার শৃঙ্খল যখন সমগ্র জাতিকে আষ্টেপৃষ্ঠে বাঁধিয়া নিশ্চিত মৃত্যুর পথে টানিয়া লইয়া যাইতেছিল তখন ইঁহাদের মতই গুটিকয়েক আপনভোলা, আত্মত্যাগী সন্ন্যাসী শৌর্য্য, সাহস ও চরিত্রবলে সকলের অলক্ষ্যে, শাসকের রক্ত-দৃষ্টির অন্তরালে বিপ্লবের বহ্নিশিখাটি জ্বালাইয়া রাখিবার কাজে সর্ব্বস্ব নিয়োজিত করিয়াছিলেন। পরাধীনতার অন্ধকার যখন সর্ব্বব্যাপী তখন ইঁহারা সে অন্ধতমসার তীরে একটি আলোর প্রদীপ জ্বালিয়া রাখিবার প্রয়াসে প্রাণের শেষ সম্বলটুকু লইয়া অগ্রসর হইয়া আসিয়াছিলেন।

ইংরেজদের চক্ষে সেদিন ইঁহারা ছিলেন, তস্কর—রাষ্ট্রদোহী। দেশবাসীর কাছেও সেদিন ইঁহাদের সত্যকারের রূপটি ছিল প্রচ্ছন্ন। তাই দেখিয়াছি, ইংরেজের পুলিশ যখন এই বিপ্লবী বীরদের জীবন অতিষ্ঠ করিয়া তুলিয়াছে—দিনের পর দিন,

রাতের পর রাত, আহার-নিদ্রা ত্যাগ করিয়া যখন তাঁহারা ঝোপঝাড়, বন-জঙ্গলে আশ্রয় গ্রহণের পরে ক্লান্ত অবসন্ন দেহে একটু নিরাপদ আশ্রয়ের জন্য দেশবাসীর কাছে গিয়া দাঁড়াইয়াছেন, তখনও এই দেশের অনেক নরনারী তাঁহাদিগকে এতটুকু আশ্রয় দেয় নাই, একটু সাহায্য দিয়া তাঁহাদিগকে রক্ষা করিতে চেষ্টা করে নাই! পরাধীনতার এই অভিশাপকে হৃষ্টচিত্তে গ্রহণ করিয়াই এই আত্মভোলা সন্ন্যাসীর দল আবার পথ চলিয়াছেন, একটু আলোকের জন্য, একটু আনন্দের জন্য। দুঃখ ইহাদিগকে ব্যাহত করে নাই, নৈরাশ্য ইহাদিগকে ব্যর্থ করে নাই, দেশবাসীর কৃতঘ্নতা ইহাদিগকে নিরাশ করে নাই। প্রতিকূল ঝড়ের অন্ধ-উজান বুকে ঠেলিয়া এ দেশেরই গুটিকয় বিপ্লবী তখন ছুটিয়াছেন নিজের বুকের পাঁজর জ্বালাইয়া সমগ্র ভারতবর্ষে স্বাধীনতার দীপ-শিখাটি জ্বালাইয়া রাখিবার সুকঠোর সঙ্কল্প সাধনে।

কীর্ত্তি তাঁহারা চাহেন নাই, নাম চাহেন নাই, প্রতিপত্তি চাহেন নাই। তাঁহারা চাহিয়াছিলেন নিস্পৃহ দেশ সেবার পথে নিঃসঙ্কোচ আত্মবিলুপ্তি। এই আত্মভোলা বীর ভিক্ষুদের নাম সেদিন কেউ জানিত না—আজই বা কতজন জানে? বিপ্লববাদের যে অধ্যায়গুলি আলোকে ও ঔজ্জ্বল্যে উদ্‌ভাসিত হইয়া আজ আত্মপ্রকাশ করিয়াছে, সেই ইতিবৃত্ত হয়তো আমরা অনেকে জানি, কিন্তু, এই আলোর প্রভাতের পেছনে যে অন্ধরাত্রির তপস্যা তাহার খোঁজ কি

আমরা রাখি—বাঙলা ও বাঙালী রাখে? তাহারা কি জানে সেই তাপসদের কাহিনী, যাঁহারা লোকচক্ষুর অন্তরালে থাকিয়া তিল-তিল করিয়া সারা জীবনের সঞ্চয়কে উজার করিয়া দিয়াছে অনাগত এক প্রভাতের আশায়? ভারতবর্ষের স্বাধীনতা সংগ্রামের ইতিহাসে ইঁহাদের একটু স্থান হইবে কিনা, কে জানে! কিন্তু, জাতির যে সত্যিকারের ইতিহাস আজও অলিখিত সেই ইতিহাসের অদৃশ্য পাতায় তাঁহাদের কাহিনী অমর হইয়াই থাকিবে।.........

বয়োবৃদ্ধদের কথা বলিতেছিলাম। জেলখানায় তাঁহাদের জীবন-যাত্রার ছন্দটি একটি নির্দ্দিষ্ট ছক বাহিয়া চলিত। সকাল হইতে সন্ধ্যা এবং সন্ধ্যা হইতে সকাল পর্য্যন্ত সেই যাত্রাপথের কোন ছেদ ছিল না। অবশ্য এমন কথা বলিতেছি না যে, জেলের সমগ্র জীবন-প্রবাহের উচ্ছল ধারার সঙ্গে তাঁহাদের জীবন-ধারার কোন যোগ ছিল না। কিন্তু, সে-সংযোগ রক্ষা করিয়াও যাত্রাপথটি ছিল তাঁহাদের স্বতন্ত্র। এই স্বতন্ত্র পথ-পরিক্রমায় হেমদা বা বড়দার পথটি ছিল আরো বৈশিষ্ট্য পূর্ণ।

ভোরবেলা আমাদের ঘুম ভাঙ্গিবার আগেই তাঁহার প্রাতর্ভ্রমণের কাজটি শেষ হইয়া আসিত, তাহারও পূর্ব্বে অবশ্য শেষ হইত তাঁহার প্রাতঃকালীন ব্যায়াম। তাহার পরে স্নান, খাওয়া, লেখাপড়া, বিশ্রাম, বৈকালিক ভ্রমণ ইত্যাদি সব কাজই ঘড়ির কাঁটার মত নিয়মিতভাবে ঘুরিয়া-ঘুরিয়া

চলিত। সে নিয়মের বাঁধন ছিল এত কঠিন যে, ঘড়ির কাঁটার গরমিল হইলেও তাঁহার রুটিনের কাঁটার এতটুকু গরমিল হওয়ার জো ছিল না। এমন অনেকদিন হইয়াছে যে, বিকাল বেলা বিছানা হইতে উঠি-উঠি করিতেছি, কিন্তু, ঠিক বুঝিয়া উঠিতে পারিতেছি না যে, ঘড়িতে কয়টা বাজিয়াছে এমন সময় বাহিরের দিকে চোখ পড়িতেই দেখিতে পাইলাম বড়দা চলিয়াছেন ঘটি হাতে—বুঝিলাম তখন অপরাহ্ন তিনটা। ঝড়-বৃষ্টি-বাদল যাহাই হউক না কেন, বড়দার রুটিনের কোন ব্যতিক্রম হইত না। এমন অদ্ভুত নিয়মনিষ্ঠা জীবনে খুব কমই দেখিয়াছি।

তাঁহার চরিত্রের আর একটি দিকও সকলেরই দৃষ্টি আকর্ষণ করিত সেটা তাঁহার আশ্চর্য্য স্মৃতিশক্তি। ইতিহাস অনেককেই পড়িতে দেখিয়াছি, ইতিহাসবেত্তা অনেকের সঙ্গে পরিচয়-ও ঘটিয়াছে কিন্তু, সমগ্র পৃথিবীর ইতিহাস ও ভূগোল একেবারে অমন করিয়া আয়ত্ত করিতে কাহাকেও দেখি নাই। শুধু নাম-নিশানা নয়, প্রতিটি ঘটনার পুঙ্খানুপুঙ্খ বিবরণ, সন তারিখ মিলাইয়া প্রশ্ন করামাত্র তিনি বলিয়া দিতে পারিতেন, এমনি অদ্ভুত ছিল তাঁহার স্মৃতিশক্তি। অথচ বাহিরের জগতে কিই-বা এঁদের পরিচয়!

সেই বড়দা'-র (শ্রীযুক্ত হেমচন্দ্র ঘোষ) গানের কথাটা কি ভাবে আসিয়া পড়িল এবং কেনই যে এত আলোড়নের সৃষ্টি করিল তাহাই বলিতেছি।

তাঁহাকে দেখিলে, তাঁহার কথাবার্ত্তা শুনিলে, সকলেরই মনে হইত, তাঁহার রুটিন-বাঁধা ঠাসবুনানীতে গান কিংবা সুর কিংবা অন্য কোন শিল্পরসের প্রবেশপথ ছিল না। গান তিনি যে না শুনিতেন এমন নয়, কিন্তু, তাহা গান ভাল লাগে বলিয়া নয়, লোকে আসিয়া গান শুনিতে তাঁহাকে ডাকিয়া লইয়া যাইত বলিয়া। তাঁহার বাল্য-বন্ধুদের মুখেও শুনিয়াছি গান গাওয়া তো দূরের কথা, গানের ধার ঘেসিয়াও তিনি বড় একটা যাইতে চাহিতেন না। কেহ নাকি কোনদিন তাঁহাকে কোন অসতর্ক মুহূর্ত্তেও গুনগুন করিয়া এক আধবার সুর ভাঁজিতে শুনে নাই। গানের সঙ্গে এত যাঁহার 'সদ্ভাব', তিনি গান গাহিতেছেন এটা শুধু অভাবিত নয়, অভূতপূর্ব্ব! তাই তাঁহার গানে সারা জেলময় সেদিন এত আলোড়ন পড়িয়াছিল। ইহার পরে সেদিন সকলের মুখেই শুধু ঐ একটি কথা ঃ

—'শুনেছিস? হেমদা আজ গান গেয়েছেন!'

—'অসম্ভব!'

এ গান যে স্বকর্ণে শুনে নাই সে সহসা বিশ্বাস করিতে পারিল না। কিন্তু বিশ্বাস যাহারা করিতে পারিল না তাঁহাদেরও এ সাহস হইল না যে, তাঁহার কাছে গিয়া জিজ্ঞাসা করিয়া আসে কথাটা সত্য কিনা! তাই একদল বিশ্বাস করিল এবং একদল করিল না, কিন্তু, তাহাতে কিছু আসে যায় না; দেউলীর সমগ্র আকাশে সেদিন একটি কথা জাগিয়া রহিল —'হেমদা গান গাহিয়াছেন!'

উনিশ

অনেকদিন সাধারণ কয়েদিমহলে ঢুকি নাই। এই অবসরে আর একবার ঐ দিকে দৃষ্টি দেওয়া যাক্। জেল-খানার এই কাহিনী ওদেরকে বাদ দিলে অসম্পূর্ণই থাকে, কারণ, দেউলীজেলের প্রতিদিনকার যে-সংসার আমরা পাতিয়া বসিয়াছিলাম তাহাতে ডেটিনিউদের সঙ্গে ওরাও ছিল আমাদের প্রতিদিনকার জীবন যাত্রার সাথী। কাজকর্ম্মের সময় কয়েদি-দের সাহচর্য্য ছাড়া তো চলিতই না; তাহা ছাড়া গল্পগুজবের আসরেও ওদের দান ছিল অসামান্য। আমাদের মধ্যে যেমন ছিলেন এমন সব খ্যাতনামা বিপ্লবী যাঁহাদের জীবনের এক-

একটি অধ্যায় এক-একটি বিপ্লব প্রচেষ্টার কাহিনী, তেমনি ওদের মধ্যেও ছিল এমন সব নামকরা ডাকাত-সর্দ্দার, দস্যু সর্দ্দার, যাহাদের দুর্দ্ধর্ষ জীবন যাত্রার বিচিত্র ঘটনাবলী যেমন রোমাঞ্চকর তেমনি দুঃসাহসিক।

বহুদিন একসঙ্গে জমাট হইয়া বসিয়া সে সব কাহিনী শুনিয়াছি। মাঝে-মাঝে মনে হইয়াছে কথাগুলি কি সত্য? কেননা, এ কাহিনী যে মাঝে-মাঝে রূপকথার গল্পকেও ছাড়াইয়া যায়। সুদূর পাহাড়ের ধারে তাঁবু গাড়িয়া, গভীর বনানীর বুকে আশ্রয় লইয়া এই দস্যুদল কখনও বা অশ্বপৃষ্ঠে, কখনো বা পদযুগলের উপর ভর করিয়াই যে কত জনপদ আক্রমণ করিয়াছে, কত বিত্তবানকে বিপর্য্যস্ত করিয়াছে তাহার ইয়ত্তা নাই!

'রামসিং'-এর কথা আজও মনে আছে। রাজপুতানার ক্ষুদ্র একটি সামন্তরাষ্ট্রের অধিবাসী ছিল সে। আমরা দেউলীতে যখন তাহাকে দেখিয়াছি তখন সে বৃদ্ধ। কিন্তু তাহার সুদীর্ঘ আকৃতি, বলিষ্ঠ দেহ, প্রশস্ত বক্ষ, উন্নত ললাট সেদিনও এই কথাটাই প্রমাণ করিত যে,—হ্যাঁ, দস্যু-সর্দ্দার যদি কাহাকেও হইতেই হয় তবে রামসিং-ই তাহার উপযুক্ত লোক। শুনিয়াছি রামসিংয়ের বাড়ী যে-অঞ্চলে, সে-অঞ্চল হইতে বিশ-পঁচিশ মাইল পর্য্যন্ত তাহার নাম একটা কিংবদন্তীর মত লোকের মুখে-মুখে ফিরিত। 'আমি রামসিং সর্দ্দারের লোক,' এই বলিয়া পরিচয় দিলে গৃহস্থ দিত তাহাকে আশ্রয়, বিত্তবান দিত আহার্য্য, এমনি ছিল তাহার প্রতিপত্তি। কত নরহত্যার অভিযোগ যে ছিল

রামসিংয়ের বিরুদ্ধে, কত রাহাজানির, কত ডাকাতির, তাহার কোন হিসাব নাই।

রামসিং কিন্তু, নিজের কাহিনী নিজে কখনও বলিত না। জিজ্ঞাসা করিলেই এই দুরন্ত, দুর্ম্মদ রামসিংয়ের মধ্যেই এমন একটি রমণী-সুলভ লজ্জা আসিয়া আশ্রয় করিত যে, তাহাকে তখন কোন কথা বলানোই সম্ভবপর হইত না। এই ছিল তাহার চরিত্র।

আমরা ওর অধিকাংশ গল্পই শুনিয়াছি, ওর শিষ্য-সামন্তের মুখে। সব হয় তো মনেও নাই, বলিতেও পারিব না। কিন্তু, দস্যু-সর্দ্দার রামসিংয়ের একটি বিজয় অভিযানের কাহিনী আজ কেন, কোনদিনই ভুলিতে পারিব না।

রাজপুতানার মরুভূমি, উত্তর-পশ্চিম প্রান্তে যেখানে আসিয়া শেষ হইয়াছে তাহারই অদূরে 'কুমায়ুন' নামে একটি ছোট জনপদ আছে। এই কুমায়ুনের যিনি ধন-কুবের তাঁহার বিত্তও যেমন ছিল, হাঁক-ডাক, নামধামও ছিল তেমনি। রাজপুতানার উত্তর-পশ্চিমে কুমায়ুন-কুবেরের নাম জানে না এমন লোক কেউ ছিল না। সেই কুমায়ুনের দিকে সেবার সর্দ্দার রামসিংয়ের দৃষ্টি পড়িল। কিন্তু মুস্কিল হইল এই যে, কুমায়ুন-কুবেরের শুধু অর্থই বেশি ছিল না, লোকজন, সিপাই-লস্কর, অস্ত্রশস্ত্রও ছিল প্রচুর। খোঁজখবর লইয়া রামসিং দেখিল কুমায়ুনের সে সিপাই-লস্করের সঙ্গে সম্মুখ সমরে কিছুতেই আঁটিয়া ওঠা যাইবে না। তা-ছাড়া

কিছুদিন পূর্ব্বেই একটা গুজব রটিয়াছিল যে, রামসিংয়ের দল এবার রাজপুতানার উত্তর-পশ্চিম প্রান্তে হাঙ্গামা সুরু করিবে, সেইজন্য শুধু নিজেদের সিপাই-লস্করের উপর নির্ভর না করিয়া কুমায়ুনের সেই ধনকুবের রাষ্ট্রেরও সাহায্য প্রার্থনা করিলেন। সে সাহায্যও অবিলম্বে আসিল, কারণ, রামসিংয়ের দৌরাত্ম্য পাশাপাশি কয়েকটি সামন্তরাষ্ট্র জুড়িয়া এমন ভীতির সঞ্চার করিয়াছিল যে, তাহাকে গ্রেপ্তার করিবার সামান্যতম সুযোগও কেউ হাতছাড়া করিতে চাহিতেন না।

কিন্তু রামসিংও ছাড়িবার পাত্র নয়। সব জানিয়া শুনিয়াও চূড়ান্ত বিপদের সম্মুখীন হওয়ার সিদ্ধান্তই সে গ্রহণ করিল। 'কুমায়ুন'-এর অদূরে ছোট একটী পাহাড়ের ওপারে রামসিংয়ের তাঁবু পড়িল। আর মাত্র তিনটি দিন বাকি। ইহারই মধ্যে অভিযানের সমস্ত আয়োজন শেষ করিয়া ফেলিতে হইবে। রামসিং তাহার দলকে দুইভাগে ভাগ করিয়া ফেলিল। প্রথম দলে রামসিং রহিল স্বয়ং আর তার বাছা-বাছা কিছু লোক। দ্বিতীয় দলের লোকসংখ্যা বেশী। সে দলের নেতৃত্ব করিবে কাল্লু-সর্দ্দার।

আয়োজন যখন সম্পূর্ণ হইয়া আসিল তখন সংবাদ পাওয়া গেল যে, কুমায়ুনে এ সংবাদ পৌঁছিয়া গিয়াছে যে রামসিংয়ের দল কাছেই কোথাও আসিয়া আড্ডা গাড়িয়াছে। রামসিংয়ের মুখে চিন্তার রেখা ঘনাইয়া আসিল, কিন্তু তাহা

ক্ষণিকের জন্য। সে ঠিক করিয়া ফেলিল খবর যখন পৌঁছিয়া গিয়াছে তখন আর কালবিলম্ব করিয়া কোন লাভ নাই। আজ রাত্রেই আক্রমণ সুরু করিতে হইবে। নির্দ্ধারিত দিন ছিল আগামীকাল, কিন্তু ঘটনাপরম্পরায় একদিন আগেই কাজ সুরু করিতে হইল। প্রথম রাত্রে দ্বিতীয় দলের পালা। কাল্লুসর্দ্দারের চেহারার ধরণ ও গঠন এমন ছিল যে, তাহাকে সাজাইলে গুছাইলে রাত্রির আলোকে 'রামসিং' বলিয়াই ভ্রম হয়। হইলও তাহাই। কাল্লুসর্দ্দার 'রামসিং' সাজিয়া তাহার দলবল লইয়া রাত্রির অন্ধকারে যাত্রা করিল কুমায়ুন অভিযানে। ধীরে-ধীরে গভীর বনপথ ধরিয়া দস্যুদল অগ্রসর হইল। কুমায়ুন-কুবেরের প্রবেশ দ্বারের কাছাকাছি যখন তাহারা আসিয়া পড়িয়াছে তখন অকস্মাৎ শব্দ শোনা গেল,—'হল্ট্! কোন্ হ্যায়!'

ব্যাস্, ঐ পর্য্যন্তই! কাল্লুসর্দ্দারের অব্যর্থ লক্ষ্য সেন্ট্রির বক্ষদেশ ভেদ করিল। মুহূর্ত্ত মধ্যে সেন্ট্রির রক্তাক্তদেহ ভূমিতে লুটাইয়া পড়িল। দস্যুদল বীরবিক্রমে প্রবেশদ্বার আক্রমণ করিল।

পরের ঘটনা খুব সংক্ষিপ্ত—অস্ত্রের ঝনঝনি, গোলাগুলির শব্দ আর আহতের চীৎকার নিশীথ গগন বিদীর্ণ করিয়া কুমায়ুন-কুবেরের প্রাসাদ-দুর্গ বিধ্বস্ত করিতে সুরু করিল। দুই পক্ষের অস্ত্রাঘাতে অবশেষে কাল্লুসর্দ্দারের দল পরাজিত হইল, দুইপক্ষেই হতাহত হইল অনেক। শত্রুর হস্তে কাল্লুসর্দ্দার 'রামসিং' নামে বন্দী হইল।

'রামসিং' বন্দী হইয়াছে। এতদিনের এত চেষ্টা, এত প্রাণহানি, এত অর্থক্ষয়েও যাহা সম্ভবপর হয় নাই, আজ কুমায়ুন-কুবেরের ভাগ্যে সেই অসম্ভই সম্ভব হইল, এতদিন পরে বন্দী হইল দুর্দ্ধর্ষ রামসিং। কুমায়ুন-কুবেরের প্রাসাদে আনন্দের রোল উঠিয়াছে,। যুদ্ধ অনেকক্ষণ থামিয়া গিয়াছে, সৈন্যসামন্তেরা গিয়াছে বিশ্রামস্থানে। সংবাদ পাইয়া দলে দলে লোক আসিয়া ভিড় করিয়াছে 'রামসিং'-কে দেখিবার জন্য।

রাত্রি প্রায় শেষ হইয়া আসিয়াছে। বিজয়ী ক্লান্ত সৈন্যদলের আঁখিপাতে নামিয়া আসিয়াছে নিশ্চিন্ত ঘুমের আমেজ। কিন্তু একি! অকস্মাৎ দর্শকমণ্ডলীর মধ্য হইতে একদল লোক অকস্মাৎ অস্ত্রের আঘাতে দিক্‌বিদিক কাঁপাইয়া তুলিল! কেহ কিছু বুঝিবার আগেই রামসিংয়ের প্রথম দলটি প্রাসাদ-দুর্গ আক্রমণ করিল। যে সামান্য কয়েকজন সান্ত্রী ছিল, অতর্কিত আক্রমণে তাহারা দিগ্‌বিদিক জ্ঞানশূন্য হইয়া এদিক্ ওদিক্ পলাইয়া গেল, কাল্লুসর্দ্দার ও অন্যান্য বন্দীরা হইল মুক্ত। যে সৈন্যদল জয়লাভের পরে নিদ্রায় অভিভূত হইয়া পড়িয়াছিল তাহারা কিছু বুঝিবার আগেই চূড়ান্ত নিষ্পত্তি হইয়া গেল। সর্দ্দার রামসিং কুমায়ুন-কুবেরের সমস্ত ধনসম্পত্তি লুণ্ঠন করিয়া তাঁহাকে বন্দী করিয়া বিজয়গর্ব্বে দলবলসহ প্রস্থান করিল, পেছনে পড়িয়া রহিল আহত, বিপর্য্যস্ত হতবুদ্ধি কুমায়ুন আর তাহার অধিবাসীবৃন্দ।

বুঝিতে আর বাকী রহিল না যে, কেন রামসিং তাহার দস্যুদলকে দুইদলে বিভক্ত করিয়াছিল। প্রথমবারে কাল্লু-সর্দ্দারের আক্রমণটা ছিল ভাঁওতা, দ্বিতীয়বারের আক্রমণই প্রকৃত আক্রমণ। বন্দী কাল্লুসর্দ্দারকে 'রামসিং' ভাবিয়া যখন কুমায়ুনের সকলে বিজয় উল্লাসে মত্ত এবং যখন গ্রামবাসীরা দলে-দলে কুমায়ুন প্রাসাদে ঢুকিতেছিল 'রামসিং' দর্শনে, তখন তাহারা বুঝিতেও পারে নাই যে, প্রকৃত 'রামসিং'-ও চলিয়াছে তাহাদেরই সঙ্গে ছদ্মবেশে !

রামসিংয়ের এ কাহিনীকে সত্য বলিয়া বিশ্বাস হয় তো কেহ করিবে, কেহ করিবেও না, কিন্তু যাহারা তাহার দলের তাহারা বলিয়াছে ঘটনাটা আদ্যোপান্ত সত্য, ইহাতে এতটুকুও অতিরঞ্জন নাই।

এমনি ছিল রামসিংয়ের চরিত্র। তাহার বিভিন্ন কাহিনী শুনিয়া একথা সকলেই একবাক্যে স্বীকার করিতেন যে, রামসিংয়ের শুধু সাহসই ছিল না, কৌশল এবং বুদ্ধিমত্তাও ছিল। কুমায়ুন অভিযানে রামসিং যে কৌশলের পরিচয় দিয়াছিল তাহা তো বর্ত্তমান যুদ্ধ শাস্ত্রের *Strategy* ও *tactics*-এর পর্য্যায়েই পড়ে।

* * *

জেলের রামসিং কিন্তু, বাহিরের রামসিং হইতে সম্পূর্ণ আলাদা। বাহিরে যে রামসিং ছিল দুর্দ্ধর্ষ, দুর্বিনীত এক

দস্যু-সর্দ্দার, জেলের ভিতরে সেই রামসিং স্নেহ ও মমতায় ভরা আমাদেরই একটি দরদী প্রতিবেশী। কি ভাবে যে রামসিং শেষ পর্য্যন্ত ধরা পড়িয়াছিল একমাত্র সেই তা জানে। ধরা পড়িবার পরে বিভিন্ন বিচারশালায় বিভিন্ন বিচারে তাহার যে সাজা হইয়াছিল একসঙ্গে তাহার যোগফল হইতেছে ৭৫ বছর। রামসিং একথা ভাল করিয়াই জানিত যে, এই ৭৫ বছর পরে বাইরের জগতের সঙ্গে পরিচয় তাহার কোনদিনই ঘটিবে না, তাই যতটা সম্ভব হাসি, কোলাহল ও আনন্দ বিতরণের মধ্য দিয়াই সে জেলখানার দিনগুলিকে কাটাইয়া দিতে চেষ্টা করিত। কিন্তু, তবু, এরই মাঝখানে এক-আধবার হঠাৎ চোখে পড়িয়াছে ওর বেদনাপাণ্ডুর মুখমণ্ডল। দেখিয়াছি, চিন্তার ঘনকালো ছায়া পড়িয়াছে শ্মশ্রুমণ্ডিত রামসিংয়ের সমস্ত মুখ খানিতে। তখন হয় তো ওর মনে পড়িত অতীতের উদ্দাম সে মুহূর্ত্তগুলি, কিংবা তারও আগে কোন এক ছায়া-শীতল গেহে দুইটি কোমল বাহুর নিবিড় পরশ, কিংবা হাস্যোজ্জ্বল কোন শিশুর উন্মুখ দুটি চোখ! আজ কোথায় তা'রা! সে অতীত আজ মিথ্যা—ব্যথা-বেদনার সে বিষণ্ণ-মধুর দিনগুলি আজ স্বপ্ন মাত্র। আজ তাহার কাছে একমাত্র সত্য, অনাগত যুগের কালপ্রবাহে সীমাহীন, অন্তহীন তাঁহার ঐ ৭৫ বছরের নিষ্করুণ পদধ্বনি!

রামসিং হয়তো বসিয়া-বসিয়া এই কথাগুলি ভাবে, কিন্তু তা ক্ষণিকের জন্য। চোখের পলক ফেলিতেই দূর হইতে আহ্বান শোনা যায়—'রামসিং'।

ডাক শুনিবামাত্র অকস্মাৎ সে সচকিত হইয়া ওঠে। ভাবনা তাহার কোথায় মিলাইয়া যায়। লাফ দিয়া উঠিয়াই রামসিং ছুটিতে আরম্ভ করে সেইদিকে, যেদিক হইতে তাহার ডাক আসিয়াছে।

রামসিং আমাদের একান্ত আপনার। তাই হামেশাই ওর ডাক পড়ে। না ডাকিয়াও পারা যায় না, ডাকিলেও বিপদ। ডাক শোনা মাত্রই যেখানে যেভাবেই থাকুক না কেন, রামসিং ছুটিয়া আসে। আসিয়া প্রথমেই, 'আরে মেরে বাবু, মেরে বাবু,' বলিয়াই আহ্বানকারীকে সে জড়াইয়া ধরে, তাহার-পরেই তার প্রেম-নিবেদনের পালা! কি দানবিক সে প্রেম! প্রেম-নিবেদনের পদ্ধতিটিও ওর নিজস্ব।

একগাল সযত্নবর্দ্ধিত দাড়ির কর্কশ সান্নিধ্য মুহূর্তের মধ্যেই আপনি অনুভব করিবেন, তা আপনি ষাট বছরের বৃদ্ধই হউন, কিংবা স্বল্পবয়সের যুবকই হউন! কবির কাব্যে, সাহিত্যিকের কাহিনীতে তো কত বিচিত্র প্রেম-নিবেদনের কাহিনীই আছে। কিন্তু, রামসিংয়ের এ প্রেম যেমন অদ্ভুত, তেমনি মারাত্মক! তাহার প্রেমের আর একটা বৈশিষ্ট্য এই ছিল যে, সে প্রেম কোন বিশেষ ব্যক্তি বা বস্তুকে আশ্রয় করিয়া বিকাশলাভ করে নাই, তাহার প্রেম ছিল সর্ব্বগ। দেউলীতে এমন লোক কমই ছিলেন যিনি রামসিংয়ের প্রেমের পসরা একবারও বহন করেন নাই!

রামসিংয়ের এই ভালবাসা যে শুধু রাজবন্দীদের উপরই বর্ষিত হইত তাহা নহে, অন্যান্য কয়েদিরাও ইহা হইতে বঞ্চিত হইত না। এত বড় দুর্দ্ধর্ষ দস্যু-সর্দ্দার, কে জানে কাহার যাদু-স্পর্শে, জেলখানায় একেবারে পরিবর্তিত হইয়া গেল। দেউলী জেলের দীর্ঘ জীবনে এমন একটি দিনের কথাও মনে পড়ে না যে-দিন তাহাকে দেখিয়াছি কাহারও সঙ্গে ঝগড়াঝাটি করিতে, দাঙ্গা-হাঙ্গামা তো দূরের কথা। অথচ, যাহারা সাধারণ চোর-ডাকাত তাহাদের কাছে একটু ঝগড়াঝাটি, এক আধটা দাঙ্গা-হাঙ্গামা, কিছু রক্তপাত, একরকম নিত্য নৈমিত্তিক কাজের মধ্যেই ছিল।

কুড়ি

রামসিংয়ের ঠিক বিপরীত আর একটি চরিত্রের সঙ্গে পরিচয় ইতিমধ্যেই আপনাদের হইয়াছে, নাম তাহার 'নকলী'। বিপরীত বলিতেছি এই জন্য যে, তাহার কথা বলার ভঙ্গী, চাল-চলতি, হাবভাব সবই ছিল নিতান্ত সাধারণ, কাহারও চোখে পড়িবার মতই নয়। অথচ এই ছয়-ছোট্ট, অতি সাধারণ, একান্ত নম্র লোকটির মধ্যে লুকাইয়া ছিল একটি দুর্দ্দম দুঃসাহসিক চরিত্র। বাহির হইতে নকলীকে দেখিয়া তাহার বিন্দুমাত্রও পরিচয় পাওয়া শুধু দুঃসাধ্য নয়, একেবারে অসম্ভব। ইতিপূর্ব্বে ক্যাপ্টেনের আজ্ঞাবহ হিসাবে নকলীর মাত্র একটি দিকের পরিচয়ই আমরা পাইয়াছি। নকলীর উহা

আংশিক পরিচয় মাত্র, উহার আসল রূপটির প্রকাশ আমরা দেখিয়াছি কিছুদিন পরে।

সে দিনটির কথা আজো আমার স্পষ্ট মনে আছে। সন্ধ্যার পরে খোলা মাঠে গোল হইয়া সকলে বসিয়াছি, চায়ের ঘণ্টা পড়িয়াছে, সন্ধ্যার চা আসিয়া পড়িল বলিয়া। এমন সময় দেখি, কয়েদ-খানার দিকে লোক ছুটিতে সুরু করিয়াছে। ব্যাপার কি জানিবার জন্য ঘটনাস্থলের দিকে অগ্রসর হইতেছি, বেশীদূর আর যাইতে হইল না, পথের মাঝখানেই দেখিলাম, দেউলীর সর্ব্বপ্রধান 'লম্বরদার'-কে দু'-তিন জনে ধরিয়া জেল-গেটের দিকে লইয়া, চলিয়াছে, ফিন্‌কি দিয়া রক্ত ছুটিয়াছে তাহার মাথা দিয়া, রক্তে সর্ব্বাঙ্গ ভিজিয়া গিয়াছে এবং তাহারই সাথে-সাথে বন্দী অবস্থায় নিশ্চিন্ত নির্ব্বিকার চিত্তে আর একটি লোক চলিয়াছে। সে আর কেউ নয়, নকলী!

কিন্তু এ কি করিয়া সম্ভব! একে তো জেলের সর্ব্বপ্রধান যে 'লম্বরদার' সে-ই কয়েদিদের সর্ব্বময় কর্ত্তা, তাহার উপর দৈত্যের মত তাহার চেহারা। তাহাকে নকলী আঘাত করিল কোন্ সাহসে, আর করিলেই বা নকলীর দুর্ব্বল আঘাতে এতটা ঘায়েল সে হইল কি করিয়া! কিন্তু তবুও অস্বীকার করিবার উপায় ছিল না যে, যাহা অসম্ভব মনে হইত, তাহা রীতিমত সম্ভব হইয়া গিয়াছে—দৈত্যকায় 'লম্বরদার' সত্যই সেদিন নকলীর আঘাতে ঘায়েল।

ঘটনাটি নাকি সামান্যই। চায়ের ঘণ্টা পড়িয়াছে। বাবুদের চায়ের অংশ হইতে এক পেয়ালা চা 'লম্বরদার'-কে দেওয়ার জন্য নকলী অনুরুদ্ধ হইয়াছিল। নকলী লম্বরদারের এ অনুরোধ রক্ষা করিতে রাজী হয় নাই বলিয়া লম্বরদার ওকে অশ্রাব্য ভাষায় গালি দেয়। নকলীর হাতে তখন ছিল একটা লোহার হাতা, সে সেই হাতিয়ার দিয়াই এ অপমানের জবাব দিয়াছে!

সেদিন সত্যই এ কাহিনীকে বিশ্বাস করিতে ইচ্ছা হয় নাই, কিন্তু পরে একাধিকবার দেখিয়াছি, নকলীর দ্বারা এ অসম্ভব কাজ শুধু সম্ভবই নয়, একান্ত সহজ। কথা নকলী কমই বলিত তাহার উত্তর-প্রত্যুত্তর সবই কাজের মধ্য দিয়া। তাই, এই ছায়ছোট্ট মানুষটিকে সাধারণ কয়েদিরা বড় ভয় করিয়া চলিত। হারাণের তো কথাই নাই। নকলী যে পথে চলিত সে-পথ সে কিছুতেই মাড়াইতে চাহিত না। একদিন কথায়-কথায় নকলীর কথা উঠিয়া পড়িল। হারাণ কিন্তু, কিছুতেই নকলী সম্বন্ধে ভালমন্দ কিছু বলিতে রাজি হইল না। অনেক সাধাসাধির পর হারাণ বলিল, 'নকলী লোক তো খারাপ নয় বাবু, তবে বড় বদ্‌রাগী।' এই বলিয়া সতর্কতার সঙ্গে হারাণ একবার চারিদিক দেখিয়া লইল, পাছে নকলী আবার কোন রকমে শুনিয়া ফেলে—এই তাহার ভয়! পরে গলার স্বর একটু নামাইয়া বলিল, 'না বাবু, ও কি আর মানুষ! এক জায়গায় থাকলে ঝগড়াঝাটি তো হতেই পারে। বেশ

তো ছুটো কথা কাটাকাটি হোক্, শরীরটা একটু গরম হোক্, তা না ! আগেই ও মেরে বসবে !' কথাটা হারাণ শেষ করিতে পারিল না, সঙ্গে-সঙ্গেই পেছন হইতে কে ডাক দিল—'হেরাণ।'

মুহূর্ত্তের মধ্যেই হারাণের চোখ ছুটি কপালে উঠিয়া গেল, পেছন ফিরিতেই সে দেখিতে পাইল—আর কেহ নয় স্বয়ং নকলী তাহার দিকে আগাইয়া আসিতেছে।

সে আবার ডাকিল, 'হেরাণ।' হারাণ ইতিমধ্যে নিজেকে অনেকটা সামলাইয়া লইয়াছে, মৃত্যুকণ্ঠে নকলীর দিকে মুখ ফিরাইয়া বলিল, 'আরে নকলী ভাই, তোম্ কি হামকো ডাকতা নাকি, এতক্ষণ বুঝতে নাহি পারতা হ্যায়।'

হারাণের হিন্দী শুনিয়া নকলী হাসিয়া ফেলিল। হাসিবার কারণও আছে। কারণ, হারাণ হিন্দুস্থানী কয়েদিদের সঙ্গে-ও বাংলাতেই কথা বলে কিন্তু ঠিক সেই মুহূর্ত্তে আকস্মিক নকলীর আহ্বানে হারাণের সবই তালগোল পাকাইয়া গিয়াছিল, তাই তাহার এ হিন্দীর কসরৎ ! হারাণকে লইয়া নকলী চলিয়া গেল। সে-যাত্রা আর হারাণের মুখে নকলীর কাহিনী শোনা হইয়া উঠিল না। তা না হউক। হারান যা বলিয়াছে তাহাই ওর প্রকৃতি বর্ণনায় যথেষ্ট ; কারণ সত্যই নকলী ছিল ঐ প্রকৃতিরই মানুষ, ঝগড়া-ঝাটি বাঁধিতে না বাঁধিতে শত্রুকে চরম আঘাত হানিয়া বসে সে। শত্রু যত দোর্দ্দণ্ড প্রতাপই হউক না কেন, এই অতর্কিত আঘাতে সে হতভম্ব না হইয়া পারে না ; তাই নকলীরই জয় হয়।

ইহার জন্য নকলীকেও কম নির্য্যাতন ভোগ করিতে হয় নাই। সেল-পানিসমেন্ট, হাতবেড়ি, পা-বেড়ি, ডাণ্ডা-বেড়ি প্রভৃতি সমস্ত রকম শাস্তি ভোগেই সে অভ্যস্ত হইয়া গিয়াছিল। কিন্তু, কি আশ্চর্য্য! এই দুর্দ্দান্ত নকলীকেও একদিন দেখিলাম ঘরের কোণে বসিয়া কাঁদিতেছে। জেল-কর্তৃপক্ষের এত মারপিট, এত নির্ম্মম শাস্তি-বিধানেও যে এতটুকু দমে নাই, সে অকস্মাৎ এত কাবু হইয়া পড়িল কেন? কিসের তাড়নায়? জিজ্ঞাসা করিলে নকলী কোন কথারই জবাব দেয় না, কেবলই বসিয়া-বসিয়া কাঁদে! এত কোমল ওর প্রাণ, এত নরম! বিশ্বাস হইতেছিল না। কিন্তু তবু, মানুষতো মানুষই।

সেদিন ওর আসল কথাটি শুনিলাম। নকলী যাহা বলিল তাহার মর্ম্মার্থ হইতেছে এই যে, ওদেরই গ্রামের একদল লোক ওর স্ত্রীকে ফুসলাইয়া লইয়া গিয়াছে। তাহাকে ওরা বুঝাইয়াছে যে, নকলী আর কোনদিনই জেলের বাহিরে যাইতে পারিবে না, শুধু-শুধু ওর স্বামীর জন্য প্রতীক্ষা করিয়া নিজের জীবনটা ও নষ্ট করিবে কিসের জন্য? স্ত্রী নাকি প্রথমটায় রাজি হয় নাই, পরে রাজি হইয়াছে এবং উহাদেরই একজনের সঙ্গে দস্তুরমত ঘর-সংসার পাতাইয়া বসিয়াছে। বলিতে বলিতে নকলীর কণ্ঠ গম্ভীর হইয়া আসিল। সে শুধু বলিল, 'আর কিছু নয় বাবু, একবারটি যদি বাইরে যেতে পারতাম'—নকলীর চোখ দুইটি দিয়া যেন আগুন ঠিক্‌রাইয়া

বাহির হইতেছিল। জেলখানার পরিবেশে মানুষের এ দিকটার কথা একেবারে যেন ভুলিতেই বসিয়াছিলাম। নকলী চোর, নকলী দাগী, নকলী খুনী, নকলী দুর্দ্ধর্ষ—কিন্তু, এ পরিচয়ই তো ওর সবখানি নয়, নকলী যে আবার একটি প্রীতি-মুগ্ধা রমণীর স্বামী, এই কথাটা কে কবে ভাবিতে পারিয়াছে?

নকলী জেলের বাহিরে গিয়াছে কি না, সেই দুর্ব্বৃত্তদের সন্ধান পাইয়াছে কি না, কে জানে? হয় তো পাইয়াছে, হয় তো বা পায়-ও নাই, কিন্তু, সেটা তত বড় কথা নয়। যাহা নকলীর জীবনে আর সব কিছুকেই ছাপাইয়া উঠিয়াছে তাহা হইতেছে, ওর ঐ সুদীর্ঘ জেল-জীবনের দুর্ম্মদ, দুর্বিনীত, কর্ম্মচঞ্চল দিনগুলির মধ্যে—একদিনের ঐ বিরল মুহূর্ত্তটুকু। সেই নিঃসঙ্গ অশ্রুজলে বেদনার যে-ভাষা সেদিন একান্ত হইয়া উঠিয়াছিল তাহা কি ভুলিবার?

একুশ

দেউলী জেলের সাধারণ কয়েদিদের মধ্যে আর একটি লোকের কথাও এই প্রসঙ্গে মনে পড়িতেছে, নাম তাহার কালুয়া। কালুয়া উত্তর প্রদেশের অধিবাসী। রামসিং যেমন ছিল রাজপুতানা অঞ্চলের খ্যাতনামা দস্যু-সর্দ্দার, কালুয়াও তেমনি ছিল বেরিলি অঞ্চলের নামজাদা চোর। এ পর্য্যন্ত চুরির দায়ে তাহার পঁচিশ বার জেল হইয়াছে, সুতরাং জেল-জীবনই কালুয়ার পক্ষে স্বাভাবিক জীবন, বাহিরটা নাকি তার মোটেই ভাল লাগে না। কালুয়াকে দেখিলে মনে হইত সে যেন সমস্ত জেলেরই অভিভাবক। বাবুদের কোথায় কি সুবিধা-অসুবিধা, সাধারণ কয়েদিদের কোথায় কি অভাব-

অভিযোগ, সব কিছু দেখিবার দায়িত্ব যেন ছিল ঐ কালুয়ার উপর। কয়েদিদের মধ্যে কেহ কিছু অন্যায় করিলে প্রথম বিচারের ভার পড়িত ওর উপর, তাহার পরে আসিতেন জেলকর্তৃপক্ষ। কালুয়ার বিচারে কাহারও উপর বেত্রদণ্ডের আদেশ হইত, কাহারও উপর বা ঘড়া-ঘড়া জল বহন করিবার, কেহ বা সারা রাত হাত দুটি উপরে তুলিয়া দাঁড়াইয়া থাকিত, কাহারও বা এক আধদিনের জন্য হইত আহার বন্ধ। এমনি বিচিত্র ছিল তাহার শাস্তি-বিধানের ধারা।

একদিন ভোরে ঘুম হইতে উঠিয়াই দেখি, রসিদ নামে একটি কয়েদিকে কালুয়া বেদম মারিতেছে। আশে-পাশে যেসব কয়েদি ছিল তাহারা সবাই দাঁড়াইয়া দাঁড়াইয়া শুধু দেখিতেছে, কেহই কিছু বলিতে সাহস পাইতেছে না। তাড়াতাড়ি কালুয়ার কাছে গিয়া আমরা কয়েকজন হাজির হইতেই কালুয়া ক্ষান্ত হইল।

জিজ্ঞাসা করিলাম, 'ব্যাপার কি কালুয়া, ওকে এমন ভাবে ঠ্যাঙ্গাচ্ছিলে কেন?'

উত্তরে কালুয়া বলিল—'বেটা, পাকা চোর, বাবু!'

কথাটা শুনিয়া কেমন যেন হকচকাইয়া গেলাম। মনে মনে ভাবিলাম রসিদ পাকা চোর, এই যদি ওর অপরাধ হইয়া থাকে, তবে তুমি তো বাপু আরো পাকা চোর, পঁচিশ বার তোমার চুরির দায়ে জেল হইয়াছে, রসিদের এমন কিই-বা অপরাধ!

কালুয়া আমার মনের কথাটা বুঝিল কি না, জানিনা। ফণীবাবু কাছেই ছিলেন। তিনি ঠিকই বুঝিলেন।

ফণীবাবু বলিলেন, 'বরাবরই দেখিয়া আসিয়াছি নিকুঞ্জবাবু, কালুয়া আর সবই সহ্য করিতে পারে, শুধু চোরকে সহ্য করিতে পারে না—চুরি ও পছন্দই করে না' এই বলিয়া ফণী বাবু এক রকম জোর করিয়াই আমাকে টানিয়া লইয়া গেলেন।

তাহার পরে অনেকদিন আর ওর সাক্ষাৎ পাই নাই। যে কালুয়াকে উঠিতে-বসিতে সব সময়ই দেখিতাম সে কালুয়াকে আর যেন চোখেই পড়িত না। কয়েদিদের গরাদে কালুয়ার কোন খবর পাওয়া গেল না। কে একজন বলিল, 'কালুয়া তো এখানে নেই, অনেকদিন হ'ল সে অসুস্থ হোয়ে হাসপাতালে চলে গেছে।'

কালুয়ার জন্য সত্যই একটু চিন্তিত হইয়া পড়িয়াছিলাম। ওর একটা সঠিক সংবাদের জন্য মনটা অধীর হইয়া উঠিয়াছিল। শুধু আমি একা নই, ফণীবাবুরও ঐ একই অবস্থা। বেশ বুঝিতে পারিলাম, সে দিনের সে ঘটনার পরে ফণীবাবু কালুয়া সম্পর্কে যে-মন্তব্য করিয়াছিলেন, তাহার মন হইতে তাহা মুছিয়া যায় নাই, তাই তাঁহারও কৌতূহল জন্মিয়াছিল কালুয়ার খবরের জন্য। অবশেষে দুইজনে গিয়া হাজির হইলাম হাসপাতালে।

একটি অন্ধকার ঘরের এক কোণে জানালার একটি গরাদ ধরিয়া দাঁড়াইয়া আছে কালুয়া।

'কেমন আছ এখন ?'

কালুয়া কোন উত্তর দিল না, শুধু একটু হাসিল ; শুষ্ক বিষণ্ণ হাসি।

ফণীবাবু বলিলেন, এখানে তোমার অসুখ সারবে না কালুয়া, তুমি ক্যাম্পে ফিরে চল।'

এবার কালুয়া কথা বলিল। কিন্তু কালুয়ার সে কণ্ঠ আর নাই, কথায় আর সে জোরও নাই। ধীরে-ধীরে ও বলিয়া চলিল, 'না বাবু, আর ক্যাম্পে ফিরে যাব না। কত লোকেই তো আমাকে কত কথা বলেছে, কত গালমন্দ দিয়েছে ; চোরকে গালমন্দ দিবেই বা না কেন কিন্তু কোন কথাই তো গায়ে মাখি নি। কিন্তু সে দিনের সেই একটি কথা—' এই বলিয়া কালুয়া আর কিছু বলিতে পারিল না। কণ্ঠ তাহার রুদ্ধ হইয়া আসিতেছিল।

বুঝিতে আর বাকি রহিল না যে, কালুয়া কি বলিতে চাহিতেছে। আমাদের দু'জনেরও কারো মুখেই কোন কথা ফুটিল না। নীরবে কিছুক্ষণ দাঁড়াইয়া রহিলাম। ঘণ্টা বাজিল, হাসপাতাল হইতে বিদায় লওয়ার ঘণ্টা। ধীরে-ধীরে ঘর হইতে বাহির হইয়া আসিলাম। মনে হইল একবার যেন পেছন হইতে কে ডাকিল,—'বাবু।'

কিন্তু, তখন আমরা বাহিরে আসিয়া পড়িয়াছি।

রামসিং, কালুয়া ও নকলী যেন আমাদের চোখ খুলিয়া দিল। সাধারণ কয়েদিদের মধ্যে অনেকের ব্যবহারই

আমাদের মুগ্ধ করিয়াছে সত্য কথাই ; কিন্তু, এমন ভাবে আমাদের মনে দোলা দেয় নাই। সত্য কথা বলিতে কি, এতদিন শুধু কয়েদিদের কয়েদিই ভাবিয়া আসিয়াছি। গৃহচ্যুত, সমাজচ্যুত তাহারা যেন আমাদের মধ্যে থাকিয়াও আমাদের নিকট হইতে অনেক দূরে ; তাহাদের যেন জাত আলাদা, সমাজ আলাদা। চোরকে শুধু চোরই ভাবিয়াছি, ডাকাতকে ভাবিয়াছি ডাকাত, কিন্তু, তাহারাও যে রক্ত-মাংসে গড়া মানুষ ; কৈ তাহা তো একদিনের জন্য-ও ভাবিতে পারি নাই ! গৃহের টান তাহাদিগকেও যে টানে, স্নেহের আকর্ষণে তাহারাও যে উন্মনা হইয়া উঠে, রমণীর প্রেম যে তাহাদের অন্তরেও এমন করিয়া বাসা বাঁধে তাহা আমাদের জানাই ছিল না। মান-অপমানবোধ, মনুষ্যত্ববোধ তাহাদেরও কোন এক বিরল মুহূর্ত্তে যে অমনভাবে জাগ্রত হইয়া উঠে তাহা বুঝিতেই পারি নাই। তাহা না হইলে ফণীবাবুর কি-ই বা কথা, তাহা এমন আলোড়নের সৃষ্টি কি করিয়া করিল আজীবন চৌর্য্যবৃত্তিতে আসক্ত ঐ কালুয়ার মনে ? এক-একবার হয়তো সন্দেহ হইয়াছে রামসিংয়ের ঐ ক্ষণিকের অন্যমনস্কতা, নকলীর ক্রন্দন, কালুয়ার পলায়ন এ সবই অভিনয়। কিন্তু পরক্ষণেই মনে পড়িয়াছে ওদের মুখ, মনে পড়িয়াছে ওদের কণ্ঠ, সবই কি কেবলি ফাঁকি, সবই কি মিথ্যা ? এ হইতেই পারে না। আসলে ওরা সকলেই ব্যথাবেদনায় ভরা আমাদেরই মত মানুষ। ওদের দস্যুপনা, ওদের চৌর্য্যবৃত্তি,

ওদের পাপাচার ঐ মনুষ্যত্বের উপর একটা ভারি যবনিকার আড়াল টানিয়া রাখে—সে যবনিকার পেছনে যে মানুষটি দাঁড়াইয়া থাকে তাহাকে আর তখন চোখেই পড়ে না।

এই সব কথাই বসিয়া-বসিয়া সেদিন ভাবিতেছিলাম। সত্যই কি বিচিত্র মানুষের প্রকৃতি, কি জটিল তাহার মনের গতি বিধি। সাধ্য কি যে, বাইরের মানুষ মনের গোপনপুরে প্রবেশ করে? বাহিরের দৃষ্টিতে যে মানুষ নিষ্ঠুর এক পাষাণ প্রতিমূর্ত্তি, কে বুঝিবে যে তাহারই অন্তরালে বহিয়া চলিয়াছে স্নেহ-মমতার অবারিত এক ফল্গুধারা? আবার যে মানুষ শক্তিমত্তার মূর্ত্ত প্রতীক তাহারই মধ্যে রহিয়াছে দুর্ব্বলতার একটা অন্ধ উৎস। মানুষ এত বিচিত্র বলিয়াই তো তাহার ব্যবহারে একবার আমরা মুগ্ধ হই আবার পরক্ষণেই বিচলিত হই; অসঙ্গত ব্যবহারের কোন সঙ্গত কারণ খুঁজিয়া পাই না।

এসব কথাবার্ত্তা জেলখানায় যে না উঠিত এমন নয়, তর্ক-বিতর্ক, আলাপ-আলোচনাও অনেক হইত, কিন্তু, দুর্জ্জ্যের এ রহস্যের দুর্ভেদ্য অন্ধকার হইতে এতটুকু আলোর কণাও বিচ্ছুরিত হইত না। হয়তো তাহাতে ভালই হইত, তাহা না হইলে সকল সমস্যারই সমাধানের পথ যদি সহজ হইয়া যাইত তাহা হইলে জেলের বাহিরে মানুষের দিন-যাপন সহজ হইত কিনা বলিতে পারি না, আমাদের যে হইত না, তাহা ঠিক।

বাইশ

আর কিছু না হউক, এই অন্তহীন ভাবনায় সময় তো অনায়াসে কাটানো যায়। জেলজীবনে এই সময় অতিবাহিত করিবার মূল্য অপরিসীম। সেদিনও এইভাবে বসিয়া-বসিয়া সময় কাটাইতেছিলাম, অকস্মাৎ বীরেনদার কণ্ঠস্বর কানে ঢুকিল। গলা ছাড়িয়া তিনি গান ধরিয়াছেন,—'রুমঝুম বাদল বরিষে।'

ঘরের বাহিরে আসিলাম। দেখিলাম বীরেনদা মিথ্যা বলেন নাই। বাহিরে রৌদ্রের লেশমাত্র নাই, নিবিড় মেঘ সমস্ত আকাশখানিকে ছাইয়া ফেলিয়াছে। দেউলীর আকাশে মেঘ—মরুভূমিতে যে মরুদ্যান!

সকলেই ঘর হইতে বাহির হইয়া পড়িয়াছেন, কিশোর, যুবক, বৃদ্ধ সকলেই! কেবল একটি লোক তখনও ঘর হইতে বাহির হন নাই, ছোট একটি ঘরে দরজা দিয়া তিনি তখনও পরীক্ষার পড়া পড়িতেছেন, "*French Revolution visited France like the tornado of the most violent type*".

বাহির হইতে ডাক উঠিল, '—বাবু' ও '—বাবু, দরজা খুলে একবার বাইরে আসুন, পরীক্ষার নম্বর হয়তো এতে কিছু কম পাবেন, কিন্তু এমন মুহূর্ত্তটি যে আর কখনও ফিরে পাবেন না।'

'—বাবু' দরজা খুলিলেন, কিছুক্ষণ কাহারও সঙ্গে কোন কথাই বলিতে পারিলেন না।

বেশ বুঝিতে পারিলাম ; অকস্মাৎ দেউলীর এ মেঘ-কজ্জল রূপ তাহার 'ফ্রেঞ্চ রেভলিউসন'-কেও একেবারে ঢাকিয়া ফেলিয়াছে।

তাঁহার মুখ দিয়া শুধু একটি কথাই বাহির হইয়া আসিল, —'আঃ!'

আকাশের দিকে সকলে তাকাইয়া আছি। এই বুঝি বর্ষা নামে, এই বুঝি বারিপাত হয়। মেঘের পরে মেঘ শুধু জমিতেছেই, অন্ধকার নিবিড় হইতে নিবিড়তর হইয়া উঠিতেছে, কিন্তু, কৈ, বৃষ্টির তো নামগন্ধও নাই! দেউলীর আকাশে বর্ষণ-সম্ভবা ঘন কালো মেঘ! আমরা সকলে চাতকের দৃষ্টি

লইয়া চাহিয়া আছি আকাশের দিকে, চাহিতে-চাহিতে ঘাড়ে ব্যথা ধরিয়া গেল; কিন্তু তবু বৃষ্টির নামগন্ধও নাই। হতাশ হইয়া ঘরে ফিরিয়া যাইব মনে করিতেছি, অকস্মাৎ পুষ্পবাবু দৌড়িয়া আসিলেন, বলিলেন, 'আর ভয় নেই, সত্যিই বৃষ্টি সুরু হয়েছে, এই দেখুন, আমার হাতে এক ফোঁটা জল, এই একটু আগেই পড়েছে।' এই বলিয়া হাতটি আমার দিকে তিনি আগাইয়া দিলেন, কিন্তু, কৈ, সে হাতে অনেক চেষ্টা করিয়াও জলের সেই ফোঁটাটি আবিষ্কার করিতে পারিলাম না। আরো ভাল করিয়া পরীক্ষা করিয়া দেখিতেছি, এমন সময় মনে হইল আমার হাতেও যেন এক ফোঁটা জল পড়িল। হ্যাঁ, বৃষ্টিই বটে, আরো এক ফোঁটা—আরো—আরো! সন্দেহের আর অবকাশ রহিল না।

বাহিরের মাঠে তখন বন্ধুদের কলকণ্ঠ উদ্দাম হইয়া উঠিয়াছে। কাহারও কণ্ঠে গান, কাহারও কণ্ঠে কবিতা, কাহারও কণ্ঠে শুধু আনন্দের শঙ্খ-নিনাদ। কে কি করিবে তাহার কোন ঠিক-ঠিকানা নাই, উদ্দাম নৃত্যে, অসম্বৃত সঙ্গীতে আর ভৈরব হুঙ্কারে দেউলী জেলটি আনন্দমুখর হইয়া উঠিল।

এবার আর দু'-চার ফোঁটা নয়, অঝোর ধারায় নামিল বৃষ্টি। আর তাহারই ছন্দে-ছন্দে উদ্দাম হইয়া উঠিল তৃষিত চাতকের দল। তৃষাদীর্ণ মরুপ্রান্তরে সত্যই কি সুরু হইল ভরা মেঘের বর্ষণ? "নামিয়া আসিল বৃষ্টি, পৃথিবীর কতদিনের পথ-চাওয়া বৃষ্টি—অরণ্যের কত রাতের স্বপন দেখা বৃষ্টি।"........

সেই ঝড়জলের মধ্যে বৃদ্ধেরা নামিয়া গেলেন তাঁহাদের বৈকালিক ভ্রমণে, যুবকেরা নামিয়া গেলেন 'ভলি-বল' লইয়া, আর উৎসাহ যাহাদের আরো বেশী, তাহারা একটি ভলিবলকেই ফুটবল বানাইয়া সারা জেলময় তুমুল কাণ্ড সুরু করিয়া দিলেন। যাহারা এই তিন দলের কোন দলেই যোগ দিতে পারিলেন না, তাহাদের সংখ্যা খুব কম, ডাক্তারের নির্দ্দেশে বন্দীশালার মধ্যেও তাহারা আর একবার বন্দী। ঝড়-জলে ভিজিবার না আছে তাহাদের আদেশ, না আছে সাহস। তাহারা তাহাদের ঘরের গরাদ ধরিয়া চাহিয়া রহিলেন বাহিরের দিকে, যেখানে 'উতলা কলাপী কেকা কলরবে বিহরে!'

এমনি করিয়াই দেউলী জেলে বর্ষা-মঙ্গল সুরু হইয়া গেল। কোন কর্ম্মতালিকা নাই, কোন নিয়মনিষ্ঠা নাই, হৃদয়ের উদ্বেলিত আনন্দে, বিচিত্র কর্ম্মধারার বিচিত্রতর প্রকাশের মধ্য দিয়াই আমরা বর্ষা-ঋতুকে আহ্বান জানাইলাম। দেউলীতে ইহার পরেও একাধিকবার আকাশ মেঘে ছাইয়া আসিয়াছে, বৃষ্টিও হইয়াছে; কিন্তু সেই প্রথম বর্ষণের স্বাদ আর গন্ধ তো ভুলিবার নয়।

দেউলী সম্পর্কে অনেক কিছু শুনিয়া, দেউলীর নিদাঘতপ্ত দিনগুলির সঙ্গে পরিচয় লাভ করিয়া এই ধারণাই বদ্ধমূল হইয়া গিয়াছিল যে, দেউলীতে শুধু যে বৃষ্টি হয় না তাই নয়, দেউলীর আকাশে কোনদিন জমে না নিবিড় মেঘ, মাটিতে কোনদিন পড়ে না সে মেঘের কালোছায়া।

মনে আছে প্রথম বর্ষণের পূর্ব্বে বহুদিন দেউলীর আকাশে এক টুকরা জলভরা মেঘের আশায় কতদিনই না শুধু চাহিয়া-চাহিয়া ব্যর্থ মনোরথ হইয়াছি। তাই সত্য-সত্যই যখন অসম্ভব সম্ভব হইয়া আসিল, সত্যই যখন দেউলীর আকাশে সেদিন বাংলার মেঘমেখলা আকাশ বর্ষার ঘনঘটায় আত্মপ্রকাশ করিল তখন তৃষাদগ্ধ চাতকের প্রাণ আনন্দে অধীর হইবে না কেন?

প্রথম দিনের বর্ষণ শেষ হইয়া গেল। ইহার পরে সুরু হইল সে বর্ষণের রেশ। ঘরের মধ্যে কেহ বা কাব্যচর্চ্চা সুরু করিলেন, কেহ বা সঙ্গীত, কিন্তু যাহা সকলেরই মনোযোগ আকর্ষণ করিল তাহা হইতেছে দেউলী জেলের গল্পের আসরটি। বীরেনদা ছিলেন এ আসরের প্রধান উদ্যোক্তা, গল্পের ভাণ্ডার যেমন ছিল তাহার অফুরন্ত, তেমনি ছিল উহা নানা বৈচিত্র্যে ভরা। সকলেই সেদিন ধরিয়া বসিল বীরেনদাকে—আজ আর ছাড়াছাড়ি নয়, আজ গল্প বলিতেই হইবে, বর্ষার এ সন্ধ্যাটি এমনভাবে ব্যর্থ হইতে দেওয়া কিছুতেই চলিতে পারে না। তিনি বলিলেন, 'না এখন গল্প নয়, একটু *serious* হোতে শেখ তোমরা, দেউলীর বর্ষা সম্বন্ধে একটা *Essay* লিখে ফেল।'

তাহার একথায় কেহ সায় দিল না, কোথায় বা বর্ষামুখর থমথমে সন্ধ্যায় দেশ-বিদেশের গল্প, আর কোথায়ই বা রচনা

লেখার কাঠখোট্টা 'গাম্ভিক' *suggestion*! অসহ্য! বলিলাম, 'না, রচনালেখা দুরুহ ব্যাপার তার চেয়ে গল্প ঢের ভাল।'

বীরেনদা বলিলেন, 'মোটেই দুরুহ নয়, রচনা লেখার একটা নূতন পদ্ধতি বেরিয়েছে, সেজন্যই তো রচনা লেখার কথাটা বললাম। সে পদ্ধতিটি জানা থাকলে, যে কোন বিষয়েই অতি সহজে রচনা লেখা শেষ করা যায়, বিশেষ কোরে পরীক্ষা হলে তো কথাই নেই।'

পদ্ধতিটি জানিবার জন্য সকলেই উৎকণ্ঠিত হইয়া রহিলাম।

বীরেনদা বলিলেন 'শোন, চন্দ্রশেখর মুখোপাধ্যায়ের 'শ্মশান' পড়া আছে এখানে সকলেরই; সেই শ্মশান প্রবন্ধটি একেবারে আগাগোড়া ঝাড়া মুখস্থ কোরে ফেলতে হবে, সেই যে 'এখানে আসিলে সকলেই সমান, ধনী বল, নির্ধন বল, রাজা বল, প্রজা বল সকলেই এক দল, সকলেই সমান' ইত্যাদি। তার পরের কাজটা খুবই সহজ। যে বিষয়েই রচনা লিখতে দেওয়া হউক না কেন, কোন প্রকারে তাকে শ্মশানে নিয়ে ফেলা চাই, তার পরে তো সহজ পথ, 'এইখানে আসিলে সকলেই সমান হয়' ইত্যাদি!"

একমনে বীরেনদার কথাগুলি শুনিতেছিলাম। পন্থাটি অভিনব সন্দেহ নাই, কিন্তু জীবজন্তু সম্বন্ধে রচনা লিখিতে দিলে না হয় তাহাদের কোন রকমে মারিয়া-কাটিয়া শ্মশানে নিয়া ফেলা যায়, কিন্তু দেউলীর বর্ষাকে কি করিয়া শ্মশানে নিয়া ফেলিব!

বীরেনদাকে প্রশ্ন করিতেই তিনি বলিলেন, 'কেন, বর্ষায় বজ্রপাত তো আর অসম্ভব কিছু নয়, আর সেই বজ্রপাতে আর কাউকে মারতে না চাইলেও অন্তত ফিণে সাহেবকে নিশ্চয়ই মারা যায় ; মারতে যদি একবার পার-ই তার পরের কাজটা তো সহজ ! শ্মশানে তাকে নিতে না পারলেও কবরখানায় তো নিতে পারবে—তা হলেই হল। তোমার রচনা লেখায় শ্মশানও যা আর কবরখানাও তাই।"

কথাটা শুনিয়া সকলেই বীরেনদাকে বাহবা দিতে সুরু করিলাম। কিন্তু বীরেনদার মুখে ঐ এক কথা, 'এই তো ! *serious* হোতে মোটে তোমরা চাও না !'

সকলে চাই না এমন কথা অবশ্য বলিতে পারি না। রচনার কথা উঠিতেই পুষ্পবাবু বলিলেন, 'রচনা লেখা সম্পর্কে আমার একটি ছাত্রেরও একটি দৃষ্টান্ত আছে। সেটা ওর খুব ছোট বয়সের কথা হোলেও ব্যাপারটাতে *Originality* আছে !

ছোট্ট বয়সে একটা পরীক্ষায় ওকে বলা হোয়েছিল, 'সিংহ' সম্পর্কে একটা রচনা লিখতে। পরীক্ষার পরে যখন ও বাসায় ফিরেছে, আমি জিজ্ঞেস করলাম, 'রচনা কেমন লিখলি ?' 'খুব ভাল লিখেছি মাষ্টার মশাই' ও উত্তর করল, বলল, 'বই থেকে একেবারে ঝাড়া মুখস্থ লিখেছি, আর তা ছাড়া বইতে যে কথাটা লেখা ছিল না তাও লিখে এসেছি।'

কথাটা শুনিয়াই কেমন যেন একটু খটকা লাগিল, জিজ্ঞাসা করিলাম, 'সে আবার কি?'

ছাত্রটি সগর্ব্বে উত্তর করিল, 'রচনার শেষে লিখে দিয়েছি, সিংহের দুইটি সিং আছে, সেইজন্যই উহাকে সিংহ বলা হয়। একথাটা বইতে লেখা নেই।'

পুষ্পবাবুর কথা আর শেষ হইল না। চারিদিকের হাসির রোলে সেই 'সিংওয়ালা সিংহ'-ও হয়তো ভড়কাইয়া গেল!

সেদিন সন্ধ্যায় বর্ষণ ক্ষান্ত হইল বটে, কিন্তু সমস্ত আকাশটিই মেঘ ভারাক্রান্ত হইয়া রহিল। রাত্রিতে হয়তো বা আরো দু-এক ঝলক বৃষ্টি হইবে এমনি একটি আশা, সকলের মনেই সজাগ হইয়া রহিল। শুধু আশা তো নয়, একটা আশঙ্কাও, কেননা আমাদের শয়ন ব্যবস্থা তো ঘরের বাহিরে—একেবারে উন্মুক্ত আকাশের নীচে। রাত্রিতে বৃষ্টি হইলে উপায়? গভীর নিশীথে ঐ ভারী লোহার খাট টানিবার জন্য তখন তো আর বটুকেও পাওয়া যাইবে না, নকলীকেও না। তাই একদিকে যেমন বর্ষণের আশা অন্যদিকে তেমনি খাট টানাটানি করিবার আশঙ্কা! এই আশা-আশঙ্কার মধ্যে দোল খাইতে-খাইতেই নিদ্রাও আসিল, রাত্রিও প্রভাত হইয়া গেল। দেখা গেল দেউলীর মেঘ অবিবেচক নয়, সারারাত শুধু হাঁক-ডাক করিয়া ভয়ই দেখাইল—কোন অনর্থ ঘটাইল না।

ভোরের আকাশে মেঘের লেশমাত্র নাই, মাটিতেও নাই বর্ষণের কোন চিহ্ন। বিগত দিনের কয়েক ঝলক বর্ষণই তো। তৃষিত ধরণী সে সামান্য জলধারাকে মুহূর্ত্তের মধ্যে কোথায় শুষিয়া লইয়া গিয়াছে কে জানে? বর্ষণ-স্নিগ্ধ প্রসন্ন আকাশে উঠিল দিবসের প্রথম সূর্য্য, ভোরের আলোতে ভরিয়া গেল সকল দিক, বর্ষা ও বর্ষণের কোন স্মৃতিই আর রহিল না। কিন্তু তবু বন্দীর মনে জাগিয়া রহিল প্রথম বর্ষণের সে আনন্দধ্বনি, মাটির সে গন্ধ, আকাশের সে চাহনি! বাহিরের মুক্ত আকাশে আবার কোনদিন জাগিবে কিনা বর্ষার সে ঘনঘটা—কে জানে? কিন্তু, বন্দীর আকাশে বর্ষার সে নুপুরধ্বনি চিরদিনের মতই বন্দী হইয়া রহিল।

বাহিরের আকাশ, সুদূরের স্বপ্ন, অতীতের ধ্বনিকে এমন ভাবে বন্দী করিয়া রাখিতে পারে বলিয়াই তো বন্দী আপনার শৃঙ্খলকে করিতে পারে অস্বীকার, তাই অনিশ্চিত ভবিষ্যতের পানে নিশ্চিত দৃষ্টিক্ষেপ করিয়া সে অনায়াসে কাটাইয়া দিতে পারে দুঃখের দীর্ঘ দিন, বেদনার ক্লান্ত রাত্রি। এমনি করিয়াই তো তাহার দিন যায়—যে দিন বন্দীত্বের সঙ্কীর্ণতায় সীমায়িত হইয়াও কালের পরিসরে সীমাহীন। এমনি করিয়া রুদ্ধ কারাকক্ষে বন্দীর রাত্রি নামে, যে-রাত্রি অন্ধ, যে-রাত্রি বন্ধ্যা। কিন্তু তবু-ও অন্তরে তার জ্বলে আলোর প্রদীপশিখা। সেই আলোয় দূরে চলিয়া যায়, কালো রাত্রির

অন্ধ যবনিকা, আলোকিত হইয়া ওঠে অন্ধকারের সমুদ্র। সেই সমুদ্রের দ্বীপ হইতে দ্বীপান্তরে তাহার যাত্রা—অজানা হইতে আরো অজানায়—সেই তো তার পথ, সেই তো আশা।

তেইশ

বাঙলার বুকে, বাঙালীর জীবনে এমনি করিয়াই একদিন সেই অজানার ডাক আসিয়াছিল, সেই দূরের আশাই অন্তরে তাহার তরঙ্গ তুলিয়াছিল। তাই তো পথে সে বাহির হইয়া পড়িয়াছিল পেছনের দিকে না চাহিয়া, ঘরকে সে পর করিয়াছিল বৃহত্তর ঘরের আশায়; দুঃখকে সে বরণ করিয়াছিল দুঃখাতীতের সন্ধানে। অমৃতের খোঁজে মৃত্যুকে সে পাথেয় বলিয়াই, গ্রহণ করিয়াছিল। সে আশা তাহার হয় তো পূর্ণ হয় নাই সে স্বপ্ন হয় তো তাহার সার্থক হয় নাই ; কিন্তু, সে অপরাধ তো তাহার নয়।

বাঙলার বন্দীরা সেই মানুষকেই দেখিয়াছে, প্রতি পদক্ষেপে যাহার পথ সৃষ্টি, প্রতিটি রক্ত বিন্দুতে যাহার ইতিহাস-রূপায়ণ। সেই মানুষের জন্যই সাজাইয়া রাখিয়াছে সে পূজার অর্ঘ্য একান্ত নিভৃতে, অন্ধকার কারাকক্ষে। সেই জন্যই কারাকক্ষ তাহার কাছে বন্দীর নির্ব্বাসন নহে, দেবতার আশীর্ব্বাদ। সেই জন্যই সুখে-দুঃখে, আনন্দে-বেদনায় হাসি-অশ্রুতে অন্ধ-কারা তাহার আলোকে ঝলমল করিয়া উঠিয়াছে। সেই আলোর মধ্য দিয়া সে দেখিয়াছে তাহার দিগন্ত, যেখানে মানুষ মুক্ত—দুর্ব্বার—স্বাধীন। সে দিগন্ত হয় তো বহু দূরে, বহু জীবনের ওপারে, বহু মৃত্যুর উর্দ্ধে, কিন্তু, তবু-ও তো তাহা তাহার দিগন্ত, সেই খানে তাহার সকল যাত্রার শেষ, সকল আশার সীমান্ত।

সেই সুদূর সীমান্তে কারাপ্রাচীরের এই অন্ধকার ভেদ করিয়াও জ্বলিয়া উঠিত এক-একটি আলোর মালা। চট্টগ্রাম, ঢাকা, মেদিনীপুর, কলিকাতা তো সীমান্তের সেই আলোকেরই নিশানা। বিভিন্ন জেলের বিচিত্র আলো-অন্ধকারের দিন-গুলিতেও মাঝে-মাঝে আঘাত হানিত সেই সীমান্তের এক একটি আলোর তরঙ্গ। তারপরে জেলের পাষাণ-প্রাচীর ভেদ করিয়া, রুদ্ধ কারাগারের লৌহ আগল পার হইয়া, আলোর সে তরঙ্গ জেলখানার শত সাবধানী দৃষ্টি এড়াইয়া, সশস্ত্র প্রহরীদের বাধা ডিঙাইয়া আসিয়া হাজির হইত একেবারে জেলের অভ্যন্তরে। বিস্ময়ে, আনন্দে, বেদনায় মুখর হইয়া

উঠিত প্রতিটি কারাকক্ষ—উন্মুখর হইয়া উঠিত বন্দীর মনোজগৎ।

এমনি একটি দিনের কথাই আজ মনে পড়িতেছে। দেশ ও সমাজ হইতে বহুদূরে যখন আমাদের নির্ব্বাসনকেই একমাত্র সত্য বলিয়া ধরিয়া লইয়া বাহিরের জগৎ ও জীবন হইতে ক্রমেই আমরা দূরে সরিয়া পড়িতেছিলাম ; একটা ঘন কালো যবনিকা বহির্জগতের প্রাণপ্রবাহকে যখন কেবলই আমাদের দৃষ্টিপথের আড়ালে লইয়া যাইতেছিল ঠিক সেই মুহূর্ত্তেই সেই অন্ধ যবনিকা ভেদ করিয়া দূরদূরান্তের মরু-কান্তার পার হইয়া একটি আলোর রেখা নূতন প্রভাতের বাণী লইয়া আসিয়া হাজির হইল। বন্দীর মন আবার সচকিত হইয়া উঠিল। অন্ধকার সমুদ্রের মাঝখানে তাহারই দৃষ্টি-দীপে ভাসিয়া উঠিল আর একটি আলোর প্রবাল-দ্বীপ, আর একটি আশার উজ্জ্বল তটরেখা। মেদিনীপুর—হ্যাঁ মেদিনীপুরই বটে। প্রভাতী সংবাদপত্র মেদিনীপুরের আরো একটি গৌরবময় কাহিনী বহন করিয়া আনিল। সংবাদটি সংক্ষিপ্ত ঃ

"মেদিনীপুরের জেলা ম্যাজিষ্ট্রেট ডগলাস বিপ্লবীদের গুলিতে নিহত হইয়াছেন।"

তিনছত্রের এই সংবাদটি বহির্জগতে কি প্রতিক্রিয়ার সৃষ্টি করিয়াছিল জেলে বসিয়া সেদিন তাহা বুঝিতে পারি নাই কিন্তু, বন্দীর মন সেদিন এই একটি কথা ভাবিয়াই আনন্দে অধীর হইয়া উঠিয়াছিল যে, ইংরেজের এত তোড়জোড়, এত

অত্যাচার-অনাচার, এত সৈন্যসামন্তের সমাবেশও বাঙলার বিপ্লব-জীবনকে প্রতিহত করিতে পারে নাই; বাঙালীর দুঃসাহসিক জীবনযাত্রাকে নিশ্চিহ্ন করিতে পারে নাই। ইংরেজের অমানুষিক অত্যাচারের নির্ম্মম নৃশংসতার সম্মুখে কোনদিন অবনত হয় নাই বিপ্লবীর উচ্চশির। নারীর লাঞ্ছনায়, শিশুর অত্যাচারে, অসহায়ের উৎপীড়নে, মেদিনীপুরের যে জেলা ম্যাজিষ্ট্রেট একদিন পশুশক্তির হিংস্রতায় উন্মত্ত হইয়া উঠিয়াছিল, সেই প্যাডিকেও বিপ্লবী বাংলা ক্ষমা করে নাই—মেদিনীপুরের বীর তরুণদের গুলির আঘাতে তাঁহাকে সে পাপের প্রায়শ্চিত্ত একদিন মেদিনীপুরের মাটিতেই করিতে হইয়াছিল। আজ আবার ডগলাসের দিন যখন আসিল, পাপের প্রায়শ্চিত্ত তাঁহাকেও করিতে হইল। ডগলাস হত্যাকাণ্ডের পূর্ণ বিবরণ সেদিন জানা সম্ভব ছিল না। যে তরুণ দুঃসাহসিক এই হত্যাকাণ্ডের পরে ধৃত হয় তাহার নাম প্রদ্যোৎ ভট্টাচার্য্য এইটুকুই মাত্র জানা গিয়াছিল। কিন্তু ইহাই সম্পূর্ণ খবর নয়।

ডগলাসকে হত্যা করা হয় মেদিনীপুর জেলাবোর্ডের একটি সভায়। জেলাবোর্ডের তিনি ছিলেন সভাপতি। প্যাডি হত্যার পরে জেলা ম্যাজিষ্ট্রেটদের চাল-চলতি ছিল অত্যন্ত সতর্ক। তাঁহারা কবে কোথায় যাইবেন, কি করিবেন, এসব সংবাদ বাহিরের কেহ তো জানিতেনই না, ভিতরেরও দু-চারজন বিশ্বস্ত কর্ম্মচারী ছাড়া তাহা কেহ জানিতে

পাইত না। তাহা ছাড়া যেখানে তাঁহারা যাইতেন সেখানে পুলিশের কড়া পাহাড়া ও সতর্ক দৃষ্টি এড়াইয়া কাহারও যাওয়া সম্ভবপর ছিল না। এত যেখানে সতর্কতা সেখানে দুইটি তরুণ ছাত্র কি করিয়া ঐ জেলাবোর্ডের সভার সংবাদ ও সেই সভায় জেলা-ম্যাজিষ্ট্রেটের উপস্থিতি এত পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে জানিতে পারিলেন এবং জানিয়াও কি ভাবে সেই সভাকক্ষে প্রবেশ করিলেন তাহা শুধু তাঁহারাই জানেন, স্বীয় উদ্দেশ্য সিদ্ধির জন্য কোন বাধাই যাহাদের কাছে বাধা বলিয়া গণ্য হইত না—কোন কাজই যাহাদের কাছে অসাধ্য ছিল না।

জেলাবোর্ডের সভা বসিয়াছে। বাহিরে ভিতরে সর্ব্বত্রই সতর্ক প্রহরী মোতায়েন। জেলাম্যাজিষ্ট্রেট সভাপতির মঞ্চে বসিয়া সভার কাজ সবে মাত্র সুরু করিয়াছেন। এমন সময় অকস্মাৎ কোথা হইতে একটী গুলি আসিয়া তাঁহার বক্ষভেদ করিল, সঙ্গে-সঙ্গেই পর পর কয়েকটি গুলির আওয়াজ হইল। রক্তাক্ত কলেবর ডগলাস ভূমিতলে পড়িয়া গেলেন। তাহার পরে তো দৌড়াদৌড়ি, ছুটাছুটির পালা, কে কোথা দিয়া পলাইবে তাহারই জন্য ব্যস্ততা। গুলির পূর্ব্ব-মুহূর্ত্তে কিংবা গুলি করিবার সময় কেহ লক্ষ্য করিয়াছিল কি না বলিতে পারি না; লক্ষ্য করিলে দেখিতে পাইত যে, দুইটি কিশোর বালক দুই দিক হইতে ডগলাসকে লক্ষ্য করিয়া গুলি ছুড়িতেছে। সভা পণ্ড হইয়া গেল। প্রদ্যোৎ ও তাহার সাথীটি সভাকক্ষের

দুইদিক দিয়া বাহির হইয়া আসিল পথে। সেই ভিড়ের মধ্য হইতে ডগলাসের জন দুই সশস্ত্র দেহরক্ষী এবং তমলুকের এস্. ডি. ও. 'জর্জ্জ' সাহেব উহাদের পশ্চাদ্ধাবন করিলেন। প্রদ্যোতের সাথীটি হৈ-হল্লার মধ্যে অদৃশ্য হইয়া গেল, কিন্তু, প্রদ্যোৎ পড়িয়া গিয়াছিল ভিড়ের মধ্যে। অত লোকের ভিড় ঠেলিয়া পলাইয়া যাওয়া আর তাহার পক্ষে সম্ভবপর হইল না, প্রদ্যোৎ ধরা পড়িল।

হত্যার কারণ সম্পর্কে প্রশ্ন করা হইলে, প্রদ্যোৎ বলিয়াছিল—'*Hizli killing cannot go unanswered*' তাহার বক্তব্যের মূল কথা হইল এই যে, ১৯৩১ সালের সেপ্টেম্বর মাসে হিজলী জেলে যে হত্যাকাণ্ড অনুষ্ঠিত হয় এবং যাহার ফলে শ্রীযুক্ত সন্তোষ মিত্র ও শ্রীযুক্ত তারকেশ্বর সেন নিহত হন তাহার জন্য হিজলী জেলের কম্যাণ্ডেন্ট 'বেকার' প্রত্যক্ষভাবে দায়ী হইলেও বেকারের মূল প্রেরণার উৎস ছিলেন মেদিনীপুরের এই খ্যাতনামা জেলা-ম্যাজিষ্ট্রেট ডগলাস। সুতরাং বন্দীশিবিরে যে দুইটি বিপ্লবী বিনা কারণে সান্ত্রীর গুলিতে প্রাণবলি দিলেন এবং যে নিষ্ঠুর হত্যাকাণ্ডের জন্য ঐ জেলা ম্যাজিষ্ট্রেট পরোক্ষভাবে দায়ী, সে পাপের প্রায়শ্চিত্তও বিপ্লবীদের গুলিতেই তাহাকে করিতে হইবে; ইহাই ছিল ডগলাস হত্যার কারণ। অসহায় মানুষের উপর উন্মত্ত দানবিকতার প্রত্যুত্তর বাংলার বিপ্লবীরা কী ভাবে দিয়াছে মেদিনীপুর তাহার সাক্ষী আজও বহন করিতেছে। আজও

চট্টগ্রাম, ঢাকা, কলিকাতা ও বাংলার অন্যান্য অঞ্চলে বিপ্লবীদের সে রক্তাক্ত ইতিহাস অমর হইয়াই আছে।

নিজের রক্ত দিয়া অক্ষম উপায়হীন মানুষের রক্তরেখাকে মুছিয়া ফেলিবার দুর্জ্জয় সঙ্কল্প এমন দুর্দ্ধর্ষ সাধনায় সেদিন ভাষা পাইয়াছিল বলিয়াই বাহিরের এমনি এক-একটি ঘটনা, এমনি এক-একটি আলোর রেখা, অন্ধকার কারাকক্ষকে আলোকোজ্জ্বল করিয়া তুলিত। মনে আছে মেদিনীপুরের এই ডগলাস-হত্যার কাহিনী দেউলী জেলে যে আশা ও উদ্দীপনার সৃষ্টি করিয়াছিল তাহার কাছে নির্ব্বাসন মিথ্যা, কারাগার মিথ্যা। মনে হইয়াছিল যদি বছরের পর বছর এমনি ভাবে দেশ ও সমাজ হইতে নির্ব্বাসিত হইয়া দিন কাটাইতে হয়—হউক না, তবু জাগিয়া থাক বাংলার যৌবন, ব্যক্ত হউক বাংলার বিপ্লবী শক্তি, ভারতবর্ষের স্বাধীনতা সংগ্রামে রক্তদানের এ অভিযান সার্থক হউক!

মেদিনীপুরের ঘটনার পরে কিছুদিন কাটিল মহা উৎসাহ ও উদ্দীপনার মধ্য দিয়া। বাংলাদেশ হইতে বহুদূরে রাজপুতানার এক কোণে যে আমরা নির্ব্বাসিত, এ কথাটা যেন তখনকার মত মনেই রহিল না। ভোরবেলা ডাক আসিত। ডাক আসিলেই সংবাদপত্রের জন্য কাড়াকাড়ি পড়িয়া যাইত, ডগলাস হত্যাকাণ্ডের বিস্তারিত সংবাদের জন্য সকলেই উন্মুখ! কিন্তু সংবাদপত্রের স্তম্ভ তন্ন-তন্ন

করিয়াও যখন কোন সংবাদ পাওয়া যাইত না, তখন নিরাশহৃদয়ে যে যার ঘরের দিকে রওয়ানা হইত।

মনে আছে ডগলাস হত্যাকাণ্ডের প্রথম সংবাদ আমরা পাইয়াছিলাম, এলাহাবাদ হইতে প্রকাশিত '*Leader*' কাগজে। যে খবরের কাগজগুলি আমাদের জন্য তখন বরাদ্দ ছিল তাহার মধ্যে ঐ '*Leader*'-ই ছিল একমাত্র কাগজ যাহাতে দেশী সংবাদ কিছু-কিছু পাওয়া যাইত। কিন্তু এই '*Leader*' কাগজটিও প্রতিদিন অক্ষত দেহে জেলের অভ্যন্তরে প্রবেশ করিতে পারিত না। যেদিন দেশের কোন 'মারাত্মক' সংবাদ উহাতে থাকিত সেদিন সেন্সর বিভাগের কাঁচি উহার উপর নির্দ্দয় হইয়া উঠিত। কাগজটি ভিতরে আসিত বটে, কিন্তু সেন্সর বিভাগের কৃপায় যে কয়টি 'জানালা-কপাট' উহাতে কর্ত্তিত হইত তাহারই ফাঁক দিয়া আমাদের প্রয়োজনীয় সমস্ত সংবাদগুলি বাহির হইয়া যাইত। কিছু একটা গুরুত্ব পূর্ণ সংবাদ যে সেদিন কাগজে ছিল এই ধারণা লইয়াই আমাদের সন্তুষ্ট থাকিতে হইত। তাহার পরে চলিত জল্পনা কল্পনা; কোন জেলে হয় তো বা কোন হাঙ্গামা হইয়াছে, অনশন ধর্ম্মঘট হয়তো হইয়াছে কোনখানে, কোথাও লাঠি চার্জ্জ কিংবা গুলি চলিয়াছে কিনা তাই বা কে জানে? প্রত্যক্ষ দুর্ঘটনার চেয়ে অপ্রত্যক্ষ কিংবা অজানিত দুর্ঘটনার ভাবনাও যেমন বেশী, আশঙ্কাও তেমনি। তাই '*Leader*'

পত্রিকায় 'জানালা-কপাট' দেখিলেই কিছুদিন পর্য্যন্ত বুকের ভিতরটা আমাদের দুর-দুর করিত!

এত যেখানে কড়াকড়ি, সেখানে ডগলাস হত্যাকাণ্ডের সংবাদটা কি করিয়া ভিতরে আসিয়া পড়িল একথাটা ওঠা স্বাভাবিক। এটা আর কিছুই নয়, ইংরেজীতে বলিতে গেলে বলিতে হয় *pure accident.* সেন্সর-বিভাগ এই সংবাদটির উপরও কাঁচি ঠিকই চালাইয়াছিলেন, কিন্তু তাড়াতাড়ি করিতে গিয়া বুঝিতে পারেন নাই যে, কাগজটির সঙ্গেই কাটা জানালাটিও ঝুলিয়া রহিয়াছে! এইভাবে সেন্সর বিভাগের অসাবধানতায় কিছু-কিছু সংবাদ ভিতরে আসিয়া পড়িত। এ ছাড়া জেল কর্ম্মচারীদের সঙ্গেও কিছু একটা বিলি-ব্যবস্থা করিয়া লইতে হইত এবং তাহা করাও খুব একটা কষ্টসাধ্য ছিল না। কারণ একে তো জেল কর্ম্মচারী তাহার মধ্যে আবার ইংরেজ আমলের নিম্ন বেতনভুক কর্ম্মচারী, লোভে পড়িয়া তাহারা না করিতে পারিত কি? তাই তাহাদের মারফৎও কিছু-কিছু সংবাদ আমরা যে সংগ্রহ করিতে না পারিতাম এমন নয়। আর এ পথ ছাড়া আমাদের গত্যন্তরই বা কি ছিল! দীর্ঘ কারাজীবনের সুদূর নির্ব্বাসনে বসিয়া সকল কষ্টই সহ্য করা যায়, কিন্তু বাহিরের রাজনৈতিক ঘটনাবলীর কোন সংবাদ বহুদিন না পাইলেই প্রাণটা আইঢাই করিতে থাকে। সেই জন্যই বাহিরের একটু সংবাদ জানিবার জন্য এত চেষ্টা, এত কারসাজি করিতে হইত। কেন না, আমরা

যে সংবাদের জন্য উন্মুখ সে-সংবাদ যে-সংবাদপত্রে পরিবেশিত হয় তাহাদের জন্য দেউলী জেলের দরজা ছিল চিরদিনের জন্য বন্ধ।

দৈনিক সংবাদ পত্রের মধ্যে আমরা পাইতাম, *Statesman*, *Times of India*, ও *Leader* '*Statesman*'-এরও আবার দিল্লী-সংস্করণ। অনেক লেখালেখির পর কলিকাতা সংস্করণের ব্যবস্থা করা গিয়াছিল বটে, কিন্তু, ডাকের সে কাগজ আসিতে অনেক দিন লাগিয়া যাইত। বাংলা দেশের কিছু-কিছু সংবাদ তাহাতে থাকিত। আমাদের মনোমত সংবাদ হয়তো থাকিত না তবু তো বাংলা দেশের সংবাদ, বাংলা দেশের কাগজ! শুধু এইটুকুর জন্যই আমাদের কাছে সে কাগজের মূল্য ছিল অপরিসীম।

আর একটি বাংলা দেশের কাগজ আমরা পাইতাম, তাহার নাম 'সঞ্জীবনী'। 'সঞ্জীবনী' সপ্তাহিক কাগজ, বাহিরে সে কাগজ একবার চোখবুলাইয়াও দেখি নাই। কিন্তু, জেলের মধ্যে 'সঞ্জীবনী' লইয়া কাড়াকাড়ি পড়িয়া যাইত। ইহার কারণও অবশ্য ছিল। শুধু বাংলা দেশের কাগজ বলিয়াই নয় 'সঞ্জীবনী' কাগজের যে বিভিন্ন বিভাগগুলি ছিল তাহাদের তিনটি যথা—(১) বোমা, রিভলভার ও কার্ত্তুজ (২) খানাতল্লাস ও গ্রেপ্তার, (৩) বন্দীর কথা—বহু সংবাদই আমাদের জন্য বহন করিয়া আনিত।

প্রথমটিতে থাকিত কোথায়-কোথায় আগ্নেয়াস্ত্র ধরা পড়িয়াছে তাহারই বিস্তৃত বিবরণী, দ্বিতীয়টিতে খানাতল্লাশী কোথায়-কোথায় হইয়াছে এবং কে ধরা পড়িয়াছে এবং তৃতীয়টিতে রাজবন্দীদের কোথায় স্থানান্তরিত করা হইয়াছে, কাহাকে কোথায় অন্তরীণ করা হইয়াছে ইত্যাদি। বলা বাহুল্য যে, *The Statesman, The Times of India* কিংবা *The Leader*-এ উক্ত সংবাদগুলি পাওয়া যাইত না।

ইহাদের দুইটি তো ছিল ভারতে ইংরেজ সমাজের মুখপত্র, তৃতীয়টিও জাতীয়তাবাদী ছিল না, ছিল উদারনৈতিক—তাও আবার যুক্ত প্রদেশের। বাংলার সংবাদ আর তাহাতে কতটুকু থাকিবে? তাই 'সঞ্জীবনী' আমাদের কাছে ছিল এত আদরের।

দেউলী জেলের প্রথম ভাগে জেলকর্ত্তৃপক্ষ 'সঞ্জীবনী'-কে একটু নেকনজরে দেখিতেন, তাই সেন্সর-কাঁচি সঞ্জীবনীর অঙ্গে একটি আঁচড়ও প্রথম দিকে কাটেন নাই। ইহার কারণ হইল এই যে, 'সঞ্জীবনী'-কে কেহ কোনদিন রাজনৈতিক সংবাদ পরিবেশনের মুখপত্র হিসাবে গণ্যই করে নাই। 'সঞ্জীবনী' অবশ্য সে দিক দিয়া যায়ও নাই। জেলের বাহিরে 'সঞ্জীবনী'-কে যাঁহারা ভালবাসিতেন তাঁহারা 'সঞ্জীবনী'-র ঐ বোমা, রিভলভার কার্ত্তুজ, ইত্যাদির জন্য তাহাকে ভালবাসিতেন না। তাঁহাদের কাছে সঞ্জীবনীর মূল্য সেদিন ছিল, দেশের মধ্যে নারীহরণ প্রভৃতি যাবতীয় দুর্নীতি দমনের মুখপত্র হিসাবে, এই দুর্নীতি দমনের জন্য 'সুনীতিসঙ্ঘ' নামে কলিকাতায় যে প্রতিষ্ঠান

গড়িয়া উঠিয়াছিল, 'সঞ্জীবনী' সম্পাদক শ্রীকৃষ্ণকুমার মিত্র ছিলেন তাঁহার প্রতিষ্ঠাতা। এক কথায় বলিতে গেলে 'সঞ্জীবনী' ছিল এই সুনীতি সঙ্ঘেরই মুখপত্র। ইহার স্তম্ভে 'খানাতল্লাস ও ও গ্রেপ্তার' 'বোমা রিভলভার ও কার্তুজ' কিংবা 'বন্দীর কথা' নামক যে তিনটি বিভাগ ছিল ইহা তেমন কাহারও চোখেই পড়িত না। নারীহরণ কিংবা অন্যান্য দুর্নীতিঘটিত লোমহর্ষক কাহিনীর চাপে ঐ বিভাগগুলি থাকিত ঢাকা পড়িয়া। এই জন্যই জেল-কর্তৃপক্ষও সঞ্জীবনীকে অক্ষত দেহেই জেলের মধ্যে পাঠাইয়া দিতেন।

বন্দীদের কিন্তু তাহাতে হইয়াছিল প্রচণ্ড লাভ। কারণ, ঐ তিনটী সংবাদ বিভাগে যে সংবাদ পরিবেশিত হইত বাহিরের লোকের কাছে ঐ টুকরা-টুকরা বিচ্ছিন্ন সংবাদগুলি হয়তো কোন মূল্যই বহন করিত না, কিন্তু যাঁহারা বাংলার বিপ্লব আন্দোলনের সঙ্গে একান্ত ঘনিষ্ঠ ভাবেই জড়িত ছিলেন তাঁহাদের নিকট ঐ সংবাদগুলির মূল্য ছিল অপরিসীম। কারণ, ঐ পরিবেশিত সংবাদগুলির বিশিষ্ট কোন সংবাদের সূত্র ধরিয়া অনেক কিছুরই আভাস তাঁহারা পাইতেন। শুধু তাই নয় ঐ বিভিন্ন সংবাদের সূত্র গাঁথিয়া তাঁহারা আঁচ করিতে পারিতেন বাংলা দেশের বিপ্লব প্রচেষ্টা তখন কোন খাতে বহিতেছে।

সঞ্জীবনীর এ সুযোগও কিন্তু আমরা বেশিদিন উপভোগ করিতে পারি নাই। এই সংবাদপত্রটির উপর রাজ-বন্দীদের

অত্যধিক উৎসাহের সংবাদ জেল-কর্ত্তৃপক্ষ একদিন আবিষ্কার করিয়া ফেলিলেন। এই আবিষ্কারের সঙ্গে-সঙ্গে কাজও সুরু হইয়া গেল। একদিন ভোরে উঠিয়া আমরা দেখিলাম যে, 'সঞ্জীবনী' ভিতরে আসিয়াছে বটে, কিন্তু, অক্ষত দেহে আসে নাই ; তিনটি বড়-বড় 'গবাক্ষ' সমগ্র সংবাদপত্রটিকে একটি নব কলেবরে পরিণত করিয়াছে আর সেই গবাক্ষের বিস্তৃত পথে বাহির হইয়া গিয়াছে সেই তিনটি সংবাদ বিভাগ। মনে আছে আমাদের সেদিনকার নৈরাশ্য। সেদিনই আমাদের মনে হইয়াছিল মুহূর্ত্তের মধ্যে কে যেন বাহির বিশ্বের উপর একটা কালো পর্দ্দা টানিয়া দিয়া গেল! কিন্তু জেলখানা তো জেলখানা-ই। এখানে কর্ত্তার ইচ্ছায় কর্ম্ম। মুখে বলিয়া অন্য ব্যাপারেই যেখানে কিছু লাভ হয় না, সেন্সরের ব্যাপারে সেখানে আর কি লাভ হইবে? আমরা যাহাতে বাহিরের কোন সংবাদ না পাই বা বাহিরে কোন সংবাদ না পাঠাইতে পারি সেই জন্যই নাকি সেন্সর-বিভাগ! তাই, বলিয়া আর কি হইবে?

সেন্সর-বিভাগের সর্ব্বশ্রেষ্ঠ বৈশিষ্ট্য ছিল এই যে, নিজেদের বুদ্ধি খাটাইয়া তাঁহারা কিছু করিতেন না। হুকুম যাহা আছে, আইন যাহা আছে, বর্ণে-বর্ণে তাহা পালন করিতে হইবে ইহাই ছিল তাঁহাদের বদ্ধমূল ধারণা। চিঠিপত্র সেন্সরের ব্যাপারে এই সেন্সর-বিভাগের পরিচয় আপনারা কিছু পাইয়াছেন, তাঁহাদের প্রতিভা অম্লান দীপ্তিতেই প্রতিভাত। বর্ষ-বর্ষ ধরিয়া যাহা

চলিয়া আসিতেছে তাহা মানিতেই হইবে, কারণ কিছু তাহার থাকুক আর নাই বা থাকুক। এই ধারণার বশবর্ত্তী হইয়াই সমস্ত কাগজেরই '*Social & Personal*' এই কলম-টি তাঁহারা যত্ন সহকারে ছাঁটিয়া দিতেন। কেন যে দিতেন তাহা তাঁহারা নিজেরাই জানেন না। প্রচলিত প্রবাদ এই যে, কোন দেশের কোন জেল হইতে নাকি এই '*Social & Personal*' কলমের ব্যবস্থা অনুযায়ী একটি বিজ্ঞপ্তি অনুসরণ করিয়া কোন রাজবন্দী জেল হইতে পলায়ন করিয়াছিল। সেইজন্য এই '*Social & Personal*' বিভাগটি সেন্সর বিভাগের কাঁচি এড়াইতে পারে নাই। উক্ত বিভাগের মাথায় কিন্তু এ কথাটা ঢোকে নাই যে, ব্যবস্থা যদি পাকাপাকি থাকেই তবে '*Social & Personal*' বিভাগ কেন, অনেক *unsocial* এবং *impersonal* বিভাগের সূত্র ধরিয়াই সংবাদ আদান-প্রদানের ব্যবস্থা হইতে পারে। কিন্তু, এত মাথা খাটাইবার প্রয়োজন কি! '*Social & Personal*' সাহায্যের সূত্র ধরিয়াই যখন একদা এক বন্দী পলায়ন করিয়াছিল তখন উক্ত বিভাগটি ছাঁটিয়া দিলেই আর কোন ভয়ের কারণ থাকে না!

এই প্রসঙ্গে সেন্সর-বিভাগের আরো একটি কর্ম্মতৎপরতার দৃষ্টান্ত উল্লেখযোগ্য। সংবাদটি অবশ্য দেউলীজেল সম্পর্কিত নহে। কেন্দ্রীয় পরিষদের সভাপতি শ্রীযুক্ত বিঠলভাই প্যাটেলের একটি সিদ্ধান্তের উপর মন্তব্য করিয়া

কান ইংরেজী দৈনিকপত্র সংবাদের শিরোনামায় একদা লিখিয়াছিলেন, '*Another Bombshell in the Assembly*' আর যায় কোথা? *Bombshell*! সর্ব্বনাশ! এ সংবাদ তো আর জেলের মধ্যে পাঠান যায় না, সুতরাং, লাগাও কাঁচি! সেন্সর-বিভাগের কাঁচির কৃপায় সে-যাত্রা আর দিল্লীর সেই '*Another Bombshell in the Assembly*' বিশেষ একটি জেলের অভ্যন্তরে প্রবেশপথ পাইল না! কর্ত্তৃপক্ষ সংবাদটি পড়িয়াও দেখিলেন না যে, এ বোমা ভগবৎসিং-বটুকেশ্বর দত্তের বোমা নয়, এইটা শ্রীযুক্ত বিঠলভাই প্যাটেলের কথার 'বোমা'! 'বোমা' শব্দটি যখন আছে তখন আর অত ভাবাভাবির কাজ কি! কাটিয়া ফেলিলেই গোল চুকিয়া যায়। এমনি কত কীর্ত্তি যে তাঁহাদের অক্ষয় হইয়া আছে, তাহার ঠিকানা নাই!

সেন্সর-বিভাগের এই অত্যুগ্র কর্ম্মতৎপরতার জন্য রাজ-বন্দীদেরও কিছু-কিছু কর্ম্মতৎপর না হইলে চলিত না। কারণ, যে করিয়াই হউক বাহিরের সংবাদ তো পাওয়া চাই। তাই তাঁহারাও এই সংবাদ-সংগ্রহের কাজে বিভিন্ন পন্থা অবলম্বন করিতেন। এই পন্থাগুলিকে কার্য্যকরী করিবার জন্য সাধারণ কয়েদিদের উপর নির্ভর করিতে হইত অনেকখানি। কারণ নানাকাজে অফিসঘরে তাহাদের যাইতে হইত এবং এই অছিলায় কিছু কাগজপত্র না হইলেও সংবাদ তাহারা কিছু-না-কিছু সংগ্রহ করিয়া আনিতে পারিত। এ পন্থায় বিপদ-ও

যে মাঝে-মাঝে দেখা না দিত এমন নয়। একটি দিনের ঘটনা বলিতেছি।

'পাঁচু'-র সঙ্গে তো ইতিমধ্যেই আপনাদের পরিচয় হইয়াছে। পাঁচুর উপরই প্রধানতঃ এই সংবাদ সংগ্রহের ভার ছিল, কারণ, ও ইংরেজীও কিছু-কিছু শিখিয়াছিল আর তাছাড়া গান-বাজনা করিতে পারিত বলিয়া ওর আনাগোনাও ছিল সর্ব্বত্র। যে *cutting*-গুলি সেন্সর-বিভাগ কাটিয়া রাখে, অফিসে তাহার সন্ধান পাইলে উহার *Main head line*-গুলিই পাঁচু টুকিয়া আনিবে। একদিন সন্ধ্যার পর পাঁচু চুপি-চুপি একটি কাগজের টুকরা আমাদের হাতে দিয়া বলিল, 'আজকের কাগজের টুকরো থেকেই টুকে এনেছি বাবু!'

কাগজটিতে লেখা—'*Mohan Bagan defeated but not disgraced-Mahatmaji's gallant defence.*' একি কাণ্ড! মোহন-বাগানের খেলায় আবার মহাত্মাজী কোথা হইতে আসিলেন! সেদিন এই সংবাদটির মর্ম্ম উদ্ধার করিতে গলদ্‌ঘর্ম্ম হইয়া গিয়াছিলাম। কয়েকদিন পরে অবশ্য সমস্ত ব্যাপারটিই পরিষ্কার হইয়া গেল। পাঁচুর বিশেষ দোষ নাই। সংবাদপত্রের পৃষ্ঠায় মোহনবাগান ও মহাত্মাজীর দুইটি পৃথক সংবাদ পাশাপাশি ছিল। পাঁচু নির্ব্বিবাদে দুইটী সংবাদের দুইটী *headline* পর-পর টুকিয়া আনাতেই এই বিপত্তি ঘটিয়াছে। অবশ্যতই এটা পাঁচুর অনিচ্ছাকৃত এবং অনবধনতা-প্রযুক্ত!

চব্বিশ

হাতে যাহার কাজ থাকে তাহার তো কথাই নাই, হাতে যাহার কাজ না থাকে ; তাহারও কাজ সৃষ্টি করিয়া লইতে হয়, তাহা না হইলে চলে না। শূন্য হাতে আর সময় কি করিয়া কাটে। জেলখানায় এ কথাটা বিশেষভাবে উপলব্ধি না করিয়া উপায় ছিল না, এত প্রচুর অবসর বাহিরে খুব কম লোকের ভাগ্যেই ঘটে। তাই জেলজীবনের দীর্ঘদিনগুলি জুড়িয়া কাজ-ই হউক আর অকাজ-ই হউক একটা কিছু করিতেই হইত। লেখাপড়া হইতে সুরু করিয়া খেলাধূলা পর্য্যন্ত এই যে দীর্ঘপথ, এ পথে কাহারও থামিবার উপায়

ছিল না। থামিলেই বিপদ, কারণ থামিলেই জেল-জীবন পরিক্রমা দীর্ঘ হইতে দীর্ঘতর হইতে বাধ্য!

তাই, এই পথ ধরিয়াই দেউলী জেলে যখন একদিন 'ফুট-বল' খেলিবার সুযোগ আসিয়া হাজির হইল, উৎসাহের তখন আর অবধি রহিল না। শুধু খেলা তো আর নয়, এই খেলাকে উপলক্ষ্য করিয়া যে মাঠের আয়োজন বন্দীদের জন্য করা হইয়াছিল জেলখানার সীমান্ত পার হইয়া সে মাঠ। সেই জন্যই উদ্দীপনা আরো বেশী। জেল-সীমান্তের বাহিরে যাইতে পারিব, এই বাহিরে যাওয়ার মূল্য কি কম? অবশ্য সেখানেও আছে চারিদিকের নিষ্ঠুর বাঁধন, মাঠটিকে ঘিরিয়াও সুসমৃদ্ধ একটি বেড়ার ঘর, কিন্তু তবু-ও তো সীমা একটু বাড়িল। সেই জন্যই খেলার মাঠের সংবাদ এত আশা ও আনন্দের তরঙ্গ সেদিন তুলিয়াছিল। সীমান্তের মানুষের কাছে সে যে সীমা ডিঙানো দিগন্তের ডাক!

প্রথম দিনটিতে খেলার মাঠে ভিড় হইল খুব। কে ফুটবল খেলিতে পারে আর পারে না, সে কথাটা সেদিন গৌণ। সেদিন সকলেরই একটু ডানা মেলিবার অদম্য আগ্রহ। এই আগ্রহের আতিশয্যেই ফুটবল মাঠে যুবক-বৃদ্ধ, খেলোয়াড়-অ-খেলোয়াড় প্রায় সকলেরই ভিড়। 'বল' মাত্র একটি, কিন্তু লোক পঞ্চাশ জনেরও বেশি। তাছাড়া বলটিও এমনি 'শিক্ষিত' যে, সে শুধু খেলোয়াড়দের পায়ে-পায়েই ঘুড়িয়া বেড়ায়, আনাড়ীদের কাছে বড় একটা ঘেঁসিতে চায় না। যদি কখন

ঘেঁসেও তখন মারমুখী হইয়াই ঘেঁসে! ফলে কাহারও হাঁটুতে লাগে, কাহারও পেটে-পিঠে, কাহারও বা কানের কাছ ঘেঁসিয়া কোথায় গিয়া যে হাজির হয় তাহা বুঝিতে-বুঝিতেই বলটি বহু দূরে চলিয়া যায়। তবু চেষ্টার অন্ত নাই, কর্ম্মোদ্যমের ত্রুটি নাই। বলের পেছনে-পেছনে ছুটিয়া, হোঁচট খাইয়া, আছাড় পড়িয়া বৃদ্ধ-যুবক সকলেই হন্তদন্ত হইতেছেন! কেবল মাঝ-খানে গুটিকয় পাকা খেলোয়াড় বলটিকে লইয়া নিজ-নিজ কৃতিত্ব প্রদর্শন করিতেছেন।

কিন্তু না, এ অবস্থা অসহ্য! ফণীবাবু ভয়ানক চটিয়া গেলেন। মনের ভাবটি তাঁহার বোঝা কঠিন নয়, আমরা শুধু মারধর খাইয়াই মরিব আর মজা শুধু লুটিবে সুধীর আইচ, যোগেশ চক্রবর্ত্তী, অমূল্য মুখার্জ্জী আর অমলেন্দু দাসগুপ্ত। হইতেই পারে না, ফণীবাবু ঠিক করিলেন, বল যেখানে ইচ্ছা যাউক এবার লক্ষ্য রাখিতে হইবে মানুষের প্রতি, অর্থাৎ উক্ত চারিজনের যে কেহ একজনের প্রতি। কিন্তু, পারিবেন কেন! ফণীবাবুর যে বিরাট বপু! কোন একটি দিক বরাবর হয়তো তিনি ছুটিতে পারেন, কিন্তু, মোড় একবার ঘুরিতে হইলেই বিপদ। তিন কাঠা জমি লইয়া তবে মোড় ঘুরিতে হয়। এই ফাঁকে তাঁহার লক্ষ্য বস্তু যে কোথায় মিলাইয়া যায়, তাহার কোন কিনারাই তিনি করিতে পারেন না। সেদিন ফণীবাবু ব্যর্থ মনোরথ হইয়াই ফিরিলেন, কিন্তু, খেলার শেষে শাসাইয়া দিয়া আসিলেন যে, আগামী দিন তিনি যোগেশ বাবুকে কিছুতেই

ছাড়িবেন না। ইহার সরলার্থ হইল এই যে, যদি তিনি সেদিন যোগেশ বাবুকে 'লইয়া' না পড়িতে পারেন, তবে তাঁহার নাম ফণী দত্তই নয়! শুনিয়া যোগেশ বাবু একটু মুচকি হাসিলেন, ভাবটা এই যে—'আচ্ছা সে দেখা যাবে।'

এইভাবে উৎসাহ-উত্তেজনার মধ্যেই প্রথম দিনের ফুটবল খেলা শেষ হইয়া গেল। খেলার শেষে দেখা গেল, কাহারও বা হাঁটুর ছাল গিয়াছে, কাহারও বা নাকের, কাহারও বা দাঁত একটা নড়িয়াছে, কাহারও বা কাটিয়াছে ঠোঁট! গুরুতর আহত অবশ্য কেহ হয় নাই। তবে সবিস্ময়ে সবাই দেখিল যে, চার পাঁচজনে শ্রীমণীন্দ্র রায়কে কাঁধের উপর তুলিয়া অতি কষ্টে ধরাধরি করিয়া ক্যাম্পের মধ্যে লইয়া যাইতেছে। এ কি ব্যাপার! সকলেই বলাবলি করিতে লাগিল, কৈ মণীবাবুকে তো একটি বলেও লাথি মারিতে দেখি নাই, কাহারও সঙ্গে সংঘর্ষও তাঁহার হয় নাই; তবে এমন আঘাত তিনি কি করিয়া পাইলেন যাহাতে একেবারে ধরাধরি করিয়া তাঁহাকে জেলের মধ্যে লইয়া যাইতে হইল! মণীবাবু ছাড়া এ কথার উত্তর কেহ দিতে পারিবে না, তাই জেলের মধ্যে গিয়া মণীবাবুকে জিজ্ঞাসা করা হইল কি করিয়া তিনি এত গুরুতর আঘাত পাইলেন? মণী বাবুকে ততক্ষণ একটি ডেক-চেয়ারে শায়িত করা হইয়াছে, ডাক্তারের কাছে সংবাদও নাকি গিয়াছে, বরফও আসিয়া পড়িল বলিয়া। কিন্তু, যাঁহাকে লইয়া এত কাণ্ড, তিনি কিন্তু একেবারে নির্ব্বিকার, নির্ব্বিকল্প! কথা

জেলখানা—কারাগার

একটিও তিনি বলিতেছেন না, মুচকি-মুচকি শুধু একটু হাসিতেছেন।

অনেক ঝকাঝকির পরে, মণীবাবু মুখ খুলিলেন। তিনি যাহা বলিলেন তাহার মর্ম্মার্থ হইল এই যে, অতি প্রাচীনকালে ফুটবল নামক কোন খেলা সত্যই তিনি খেলিতেন এবং ভালই খেলিতেন বলিয়া লোকে বলিত। তাহার পরে দেশের যখন দুর্দ্দিন ঘনাইয়া আসিল, স্বাধীনতা-সংগ্রামে আত্মনিবেদনের আহ্বান যখন আসিল ; ফুটবল খেলা তো দূরের কথা খেলার মাঠের ত্রিসীমানায়-ও তিনি যান নাই। কিন্তু আজ অকস্মাৎ দেউলী জেলে ফুটবল এবং ফুটবল মাঠটিকে এত কাছে পাইয়া পুরানো দিনের স্মৃতিটি তাঁহার জাগরিত হইল। তিনি বেমালুম মাঠে নামিয়া পড়িলেন। অতীতে তিনি ভাল খেলিতেন এ খেয়াল তাঁহার ছিল, তাই আনাড়ীর মত দৌড়া-দৌড়ি না করিয়া জায়গায় দাঁড়াইয়া খেলিতে সুরু করিলেন। দু-তিনবার মাত্র তিনি বলটিকে লক্ষ্য করিয়া লাথি মারিতে চেষ্টা করিলেন, কিন্তু অনেক দিনের অনভ্যাস, তাই তাহার লাথি বলে লাগিয়াও লাগিল না। দু-তিনবার সজোরে শূন্যের বুকেই তিনি লাথি মারিলেন ; তাহারই ফলে তাঁহার এই দুরবস্থা ! হাঁটু তাঁহার আগে জোড়া লাগানোই ছিল, হাওয়ায় লাথি মারিতে গিয়া সে জোড়া খুলিয়া গিয়াছে, তেমন বেশি কিছু হয় নাই। তেমন কিছু সেদিন হইয়াছিল কি না বলিতে পারি না, কিন্তু এই না হওয়ার দাপটেই পুরাপুরি তিনটি মাস তিনি শয্যাশায়ী ছিলেন !

এইভাবে দেউলীতে ফুটবল মরশুম সুরু হইয়া গেল। ফুটবল মরশুমে আর সময় কাটাইবার কথা কাহারও ভাবিতে হইল না। কারণ, ফুটবল খেলার একটা মজা এই যে, প্রত্যক্ষ খেলায় সময় হয়তো কাটে এক ঘণ্টা, কিন্তু খেলার পরে এবং প্রায় সারাদিন ভরিয়া খেলার বিষয়বস্তু লইয়া এত গাল-গল্প সুরু হইয়া যায় যে, তাহার ফাঁকে সময় যে কখন চলিয়া যায়, দিন যে কখন কাটিয়া যায়, টেরই পাওয়া যায় না।

মনে আছে, প্রথম দিনের খেলার পরে যে গল্পের আসর বসিয়াছিল তাহা ভাঙ্গিতে প্রায় রাত দুপুর হইয়াছিল। কে কবে খেলিয়াছে, কে কোন্ বড় টীমে খেলিতে-খেলিতেও একটুর জন্য চান্স পায় নাই, কে কত বড়-বড় খেলা দেখিয়াছে এই সব বিস্তারিত বর্ণনায় প্রথম ফুটবল খেলার আসরটি এত জমিয়া গেল যে, কখন যে রাত এত গড়াইয়া গিয়াছে তাহা কেহ বুঝিতেই পারে নাই।

সে-গল্পের আসরের একটি গল্পের কথা আজো মনে আছে। গল্প বলিলে অবশ্য ভুল বলা হইবে; ইহা 'দ' বাবুর জীবনের একেবারে প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতাপ্রসূত বর্ণনা। তিনি ঠিক যে ভাবে আমাদের কাছে কথাগুলি বলিয়াছেন, হু-বহু সেই কথাগুলিই আপনাদেরকে উপহার দিতেছি। 'দ' বাবু বলিয়া চলিলেন, "খেলার কথাই যখন উঠিয়াছে তখন আমার কথাও একটু আপনারা শুনুন। শ্বশুরালয়ে গিয়া সে যাত্রা কি বিপদে পড়িয়াছিলাম তাহাই আজ বলিতেছি। মনে আছে সেদিন

প্রতিজ্ঞা করিয়াছিলাম, কোন দিন 'ফুটবল সিজনে' আর শ্বশুর বাড়ী যাইব না। কেন, সেই কথাই বলিতেছি।

মাদারীপুর মহকুমায় কোন এক গ্রামে বহুদিন পরে শ্বশুর বাড়ীতে যাওয়ার সৌভাগ্য আমার হইয়াছিল। হ্যাঁ, সৌভাগ্যই বলিতে হইবে। কারণ, একে বর্ষাসমাগম তাহাতে শ্বশুরালয়, তাহাতেও আবার অনেকদিন পরে। সৌভাগ্য নয় তো কি! কিন্তু সে সৌভাগ্য কি করিয়া চরম দুর্ভাগ্যে পরিণত হইতে চলিয়াছিল তাহাই আমার বক্তব্য। সেখানে পৌঁছিবার দিন দুই পরে একদিন দুপুরে গ্রামের ছেলেরা একেবারে সটান আমার কাছে আসিয়া হাজির। ব্যাপার কি জিজ্ঞাসা করিবার পূর্ব্বেই আগন্তুকদের মধ্যে একজন আগাইয়া আসিল, বলিল, 'আজ আমাদের ফাইন্যাল ফুটবল খেলা, পাশের গ্রামের সঙ্গে। গত বছর আমাদের সঙ্গে এরা হেরেছে এবার বাইরের খেলোয়াড় এনে অধিকতর শক্তিশালী হোয়ে এসেছে। এবার যদি ওদের কাছে আমরা হারি তবে আর গ্রামে মুখ দেখানো যাবে না। এ-বিপদে আপনি ছাড়া আর কেউ আমাদের উদ্ধার করতে পারবে না। আপনাকে আজ আমাদের হোয়ে খেলতেই হবে।'

আমি তো শুনিয়া অবাক! ফুটবল জীবনেও খেলি নাই, তাহাতে আবার যে-সে খেলা নয়, একেবারে ফাইন্যাল খেলা! বলিলাম, সবই আমি করিতে পারি, কিন্তু খেলার মাঠে নামিতে পারিব না, ফুটবল খেলিতে আমি মোটেই জানি না।' শুনিয়া ছেলের দল হো-হো করিয়া হাসিয়া উঠিল।

চরম অবিশ্বাসের হাসি। একজন বলিল, 'মিছে কথা বলছেন, এ হোতেই পারে না! কলকাতায় থাকেন, অথচ ফুটবল খেলা জানেন না—এ অসম্ভব!'

কি করিয়া তাহাদিগকে বুঝাইব যে, ইহা শুধু সম্ভবই নয়, একেবারে খাঁটি সত্য। কি বলিব ভাবিতেছি, কিন্তু ভাবিবার অবসর কোথায়! অমনি আর একজন উৎসাহী যুবক বলিয়া উঠিল, 'ফুটবল খেলা না জানলে কখনও অমন চেহারা হয়, ফাঁকিতে আর চলবে না, আপনাকে নামতেই হবে আজ!' শুনিয়া কিছুটা আশ্বস্ত হইলাম। কারণ আমার চেহারা দেখিয়া এ পর্য্যন্ত কেহ বলে নাই যে চেহারাটা আমার খেলোয়াড়-মাফিক! ডনগীর, কুস্তিগীর কিংবা বৈঠকগীর এমন একটা বিশেষণে যদি কেহ আমাকে অভিহিত করিত আপত্তি তবে ছিল না, কিন্তু একেবারে ফুটবল খেলোয়াড়! ভাবিয়া পাইলাম না ইহা শ্বশুরালয়ে আসিবার গুণ কি না! কিন্তু তাই বা হইবে কি করিয়া! শ্বশুর বাড়ীর লোকেরা না হয় আমার চেহারার প্রশংসা করিল, কিন্তু গ্রামের ছেলেরা করিতে যাইবে কেন? সে যাই হউক নিজের প্রতি একটু বিশ্বাস ফিরিয়া আসিল যেন! বেশ বুঝিতে পারিলাম, গ্রামের ফুটবল খেলায় দেহের ওজনের-ও দাম আছে যথেষ্ট। আর কিছু না ভাবিয়াই বলিয়া দিলাম, বেশ, যাওয়া যাইবে।

ছেলের দল তো মহা খুশি হইয়া চলিয়া গেল। কলিকাতার খেলোয়াড় খেলিবে, তবে আর চিন্তা কি!

জেলখানা—কারাগার

বলিয়া তো দিলাম, কিন্তু, সময় যত যাইতে লাগিল, হাত-পা আমার ততই অসাড় হইয়া আসিতে লাগিল। কিন্তু, বাহিরে তাহা প্রকাশ করা যায় না। জোর করিয়াই 'স্বাভাবিক' হইয়া থাকিতে চেষ্টা করিলাম। এদিকে গ্রামময় রাষ্ট্র হইয়া গিয়াছে কলিকাতার খেলোয়াড় আজ খেলিবে! দলে দলে লোক মাঠের দিকে যাইতে লাগিল। যাহারা কোনদিন খেলার মাঠ-ও দেখে নাই তাহাদেরও আজ পরম উৎসাহ, কলিকাতার খেলোয়াড়ের খেলা দেখিবে! কিন্তু, তাহারা যদি কোনক্রমে কলিকাতার খেলোয়াড়টির বুকের মধ্যে ঢুকিতে পারিত তাহা হইলে দেখিতে পাইত কী খেলা সেখানে চলিয়াছে!

নির্দ্দিষ্ট সময়ে হ্যাফপ্যাণ্ট এবং 'জারসি' পরিয়া খেলার মাঠে উপস্থিত হইলাম। মাঠে তখন লোকে লোকারণ্য! মাঠে আসিয়া কিন্তু অনেকটা আশস্ত হইলাম, দেখিলাম, সারামাঠেই প্রায় এক হাঁটু জল। ভাবিলাম, ভগবান্ এবার সত্যই মুখ তুলিয়া চাহিয়াছেন। কেন না, এক হাঁটু জলের মধ্যে কেহ বুঝিতে পারিবে না, কে ভালো খেলোয়াড় আর কে খারাপ।

খেলা সুরু হওয়ার পূর্ব্বমুহূর্ত্তে বিরুদ্ধ দলের একটি খেলোয়াড়ের দিকে অঙ্গুলি নির্দ্দেশ করিয়া আমাদের দলের এক-জন বলিয়া দিয়া গেল, ঐ হচ্ছে ওদের দলের শ্রেষ্ঠ খেলোয়ার। 'চক্রবর্ত্তী' নাম, ওকে বসাতে পারলেই—' আর বলিতে হইল না। বুঝিতে আর বাকি রহিল না যে, আমার চেহারা দেখিয়া

কেন ইহারা মন্তব্য করিয়াছিল যে, আমরা চেহারাখানি ঠিক একেবারে ফুটবল খেলোয়াড়ের মত !

খেলা সুরু হইয়া গেল। খেলা তো নয় যেন জল-যুদ্ধ! কয়েকবার ইতিমধ্যেই আছাড় খাইলাম, কিন্তু সেই চক্রবর্ত্তীকে বাগে পাইতেছি না। অকস্মাৎ একবার আমার দেহের অতি সন্নিকটেই দেখি, 'চক্রবর্ত্তী' পড়িতে-পড়িতে উঠিবার চেষ্টা করিতেছে। আর যায় কোথা। চোখ-মুখ বুজিয়া, বরাতের উপর ভর করিয়া, সমগ্র দেহভারটি আমার এলাইয়া দিলাম 'চক্রবর্ত্তী-র' উপর। 'চক্রবর্ত্তী' আর উঠিতে পারিল না। ধরাধরি করিয়া তাহাকে মাঠের বাহিরে লইয়া যাওয়া হইল। পা তাহার ভাঙ্গিয়া গিয়াছে! তাহার পরের কাজ সহজ। বিরুদ্ধপক্ষে 'চক্রবর্ত্তী'-ই নাই আর খেলিবে কে? আমাকে আর কিছু করিতে হইল না, আমাদের দলই জিতিয়া গেল।

খেলার শেষে আমার চারিদিকে ভিড় জমিয়া গেল। 'চক্রবর্ত্তীর' মত খেলোয়াড়কে বসাইয়া দিয়াছি, আমার মত শ্রেষ্ঠ খেলোয়ার আর কে আছে! কে একজন বলিল, 'তবে যে বলেছিলেন আপনি ফুটবল খেলতে জানেন না!' আজ আর এ কথার কি উত্তরই বা আছে!

শ্বশুরবাড়ীতে আর থাকা হইল না। পরের দিনই ভোরের ষ্টীমারে কলিকাতা রওনা হইলাম। কি জানি, এর মধ্যে যদি আবার মাঠের জল শুকাইয়া যায়! এই বলিয়া 'দ' বাবু থামিলেন, কিন্তু, বৈঠকের হাসি আর থামিল না।

পঁচিশ

ফণীবাবু হইতে সুরু করিয়া সুধীর বাবু পর্য্যন্ত, শ্রীহরিদাস সেন হইতে সুরু করিয়া শ্রীহরি কুমার চক্রবর্ত্তী মহাশয় পর্য্যন্ত, তরুণ আর বৃদ্ধ সকলের মধ্যেই তুমুল উন্মাদনার সৃষ্টি করিয়াছিল দেউলী জেলের ফুটবল খেলা। ইহার কারণও অবশ্য ছিল, খেলায় বন্দী-জীবনের রুদ্ধ ছন্দের আত্মপ্রকাশ, অবরুদ্ধ গতির মুক্তি-চাঞ্চল্য। তাই জেলের সে-খেলার আনন্দ আর সকল আনন্দকেই ছাপাইয়া উঠিয়াছিল। মূক হঠাৎ মুখর হইয়া উঠিলে যে-আনন্দ, পঙ্গু অকস্মাৎ চঞ্চল হইয়া উঠিলে যে-আনন্দ, এ-ও অনেকটা সেই ধরণের। তাই, ঐ একটি

ফুটবলকে কেন্দ্র করিয়া সকলই এত উন্মত্ত হইয়া উঠিল। কে আর বসিয়া থাকিবে ঘরে, কে শুইয়া থাকিবে শয্যায়? চলার আবেগ জাগিয়াছে রক্তে, রক্ত চঞ্চল হইয়া উঠিয়াছে ধমনীতে। পর্ব্বত যেন হইয়া উঠিয়াছে 'বৈশাখের নিরুদ্দেশ মেঘ।'

এত উত্তেজনা, এত হৈ-হল্লা, এত উৎসাহও কিন্তু একজনের মনে কোন দাগই কাটিতে পারে নাই। তাঁহার নির্ব্বিকল্প সাধনায় তিনি ছিলেন একান্ত।

বরিশাল তথা সারা বাংলায় শ্রীযুক্ত সতীন সেনকে সেদিন কে না চিনিত? দেউলী আসার আগে তাঁহার নামই শুধু শুনিয়াছিলাম, তাঁহার সঙ্গে সাক্ষাৎ পরিচয় ঘটিল দেউলীতে আসিয়া। ঋজু বলিষ্ঠ গঠন, দোহারা চেহারা, সমস্ত চোখে মুখেই ব্যক্তিত্বের একটা সুস্পষ্ট ছাপ। সকলের মধ্যে থাকিয়াও সকলের হইতে আলাদা থাকিবার যে-বৈশিষ্ট্য তাহা যেন তাঁহার জন্মগত। তাঁহার প্রতিটি কথা, প্রতিটি পদক্ষেপ ও প্রতিটি আচরণ এই সব কিছু মিলিয়া এমন একটি পরিবেশের সৃষ্টি করিত যে, মানুষ সহজেই তাহাতে আকৃষ্ট না হইয়া পারিত না।

দেশের জনসাধারণের কাছে তাঁহার প্রথম পরিচয় পটুয়াখালি সত্যাগ্রহে, কিন্তু তাঁহার সংগ্রামশীল জীবনের ইহা একটা বহিঃপ্রকাশ মাত্র। ইহার বহুদিন পূর্ব্ব হইতেই বাঙলা দেশের বিপ্লব-পন্থায় স্বীয় সঙ্কল্প ও কর্ম্ম প্রচেষ্টার মধ্য দিয়া তিনি তাঁহার জীবনটিকে একটা সার্থক পরিপূর্ণতার দিকে অগ্রসর করিয়া লইয়া যাইতেছিলেন।

বৃটিশ সরকার ও সরকারী কর্ত্তৃপক্ষের বিরুদ্ধে তাঁহার বিরামহীন সংগ্রাম ভারতবর্ষের স্বাধীনতা সংগ্রামের ইতিহাসে তাঁহার জন্য একটা স্থায়ী আসন প্রতিষ্ঠিত করিয়া রাখিয়াছে। সে-ইতিহাস কবে লেখা হইবে কে জানে? হউক আর নাই হউক, স্বাধীনতা-সংগ্রামে তাঁহার দান কেহ কোন দিনই অস্বীকার করিতে পারিবে না।

কি জেলখানায় আর কি জেলখানার বাহিরে, একটি কথাই তাহার জীবনের মূলমন্ত্র ছিল—সংগ্রাম। শোষণ, অত্যাচার আর অনাচারের প্রতীক বৃটিশ সরকারের বিরুদ্ধে আজীবন বিরামহীন সংগ্রাম করিয়া যাইতে হইবে, ইহাই ছিল তাঁহার সমস্ত কর্ম্মজীবনের একমাত্র বাণী, ইহাই তাঁহার সারা জীবনের সাধনা, সারাদিনের চিন্তা, সারা রাত্রির স্বপ্ন। তাঁহার এই স্বপ্নকে কার্য্যে রূপায়িত করিতে যাইয়া জেল জীবনে যে একাধিক সংগ্রাম তিনি জেল-কর্তৃপক্ষ তথা সরকারের বিরুদ্ধে ঘোষণা করিয়াছেন, সেই সংগ্রামের অসংখ্য চিহ্ন বহন করিতেছে তাঁহার সমস্ত দেহ, সমগ্র মন। জেল কর্তৃপক্ষের অবিচারের প্রতিকারকল্পে বহুবার দীর্ঘকালব্যাপী অনশন ব্রত উদ্‌যাপন করিয়া তাঁহার দেহ-যন্ত্র এত বিকল হইয়া গিয়াছিল যে, সামান্য কিছু তরিতরকারী সিদ্ধ ছাড়া অন্য কিছু তিনি হজমই করিতে পারিতেন না।

ইহা ছাড়া, অত্যাচার-উৎপীড়ন কত যে তিনি সহ্য করিয়াছেন তাহার তো ইয়ত্তাই নাই। আইন অমান্য

আন্দোলনের একটি ঘটনার কথা আজো অনেকেই হয় তো জানেন। তিনি তখন ছিলেন প্রেসিডেন্সী জেলে। সেই আন্দোলনে যাহারা বিচারাধীন বন্দী ছিলেন তাঁহাদের মধ্যে শ্রীযুক্ত সতীন সেন ছিলেন অন্যতম। আইন অমান্য আন্দোলনে যাঁহারা যোগ দিয়াছিলেন তাঁহাদের প্রতি নির্দ্দেশ ছিল—ইংরেজের আইন, আদালত সব কিছুকেই অস্বীকার করা। তাই, কোর্টে যাওয়ার যখন সময় হইত, বন্দীদের কোর্টে লইয়া যাওয়া ছিল এক বিষম সমস্যা। কারণ, ইংরেজ সরকারের কোর্টই যাঁহারা স্বীকার করেন না, তাঁহারা বিচারের জন্য কোর্টে যাইতে রাজি হইবেন কেন? তাই জোর-জবরদস্তি করিয়া তাঁহাদের *Prison Van*-এ তোলা হইত এবং জোর-জবরদস্তি করিয়াই তাঁহাদের কোর্টে লইয়া যাওয়া হইত। এমনি ভাবে জোর-জবরদস্তি, টানা হ্যাঁচড়া রোজই হইত।

কিন্তু, মুস্কিল বাঁধিল শ্রীযুক্ত সতীন সেনের বেলায়। তিনি বলিয়া বসিলেন, কোর্টে তিনি কিছুতেই যাইবেন না। জেল-কর্ত্তৃপক্ষ মহা ভাবনায় পড়িলেন। শ্রীযুক্ত সতীন সেনকে তাঁহারাও যে না চিনিতেন এমন নয়। তাঁহার কথার অর্থ যে কি তাহা তাঁহারা ভাল করিয়াই জানিতেন। কিন্তু, ওদিকে আবার সরকারের আদেশ। পালন না করিলেই নয়। ইংরেজ সরকারের আমলে কর্ম্মচারীরা আর কিছু জানুক আর নাই জানুক একটা কথা তাহারা ভাল করিয়াই

জানিত—কি করিয়া সরকারের আদেশ অক্ষরে-অক্ষরে পালন করিতে হয়। সে আদেশ পালন করিতে গিয়া যদি জঘন্য পথে যাইতে হয়—যাইতে হইবে, যদি অমানুষিক অত্যাচার অনুষ্ঠান করিতে হয়, করিতে হইবে ; তবু সরকারী আদেশ পালনে যেন কিছুমাত্র ত্রুটি না হয়! শুধু তাই নয়, তাহাদের হাতে ক্ষমতাও ছিল অপরিসীম। সুতরাং সরকারী আদেশ পালনের নামে, আইন ও শৃঙ্খলা রক্ষার নামে, প্রতিহিংসা ও প্রতিশোধ গ্রহণ-ও তাহারা অবাধে করিয়া যাইত।

ইংরেজের জেলে বহুবর্ষ যাপনের সৌভাগ্য যাহাদের হইয়াছিল তাঁহাদের অনেকেরই এই প্রতিশোধ গ্রহণের কাহিনীর সঙ্গে পরিচয় আছে।

শ্রীযুক্ত সতীন সেনের সময়েও ইহার কিছুমাত্র ব্যতিক্রম ঘটিল না। জেল-কর্তৃপক্ষ সেদিন বিরাট এক ফৌজ লইয়াই শ্রীযুক্ত সেনের কক্ষে হাজির হইল। তাঁহার মুখে ঐ একটি কথা, 'আমি কোর্টে যাইব না, যদি পার তোমরা আমাকে লইয়া যাও।'

অনুরোধ-উপরোধে যখন কোন ফলই হইল না, তখন সুরু হইল টানাটানি। কিন্তু, দু-চার জন সিপাই হাত ধরিয়া তাঁহাকে টানিয়া বাহির করিতে পারিবে কেন? অনন্যোপায় হইয়া তাহারা তাহাদের শেষ অস্ত্র প্রয়োগ করিল।

শ্রীযুক্ত সেন মাটিতে শুইয়া পড়িলেন, জেল কর্তৃপক্ষের অত্যাচারের বিরুদ্ধে প্রতি-অত্যাচার তিনি করিবেন না, এই ছিল তাঁহার ধর্ম্ম। কারণ, তিনি যে সত্যাগ্রহী। কিন্তু, জেলকর্তৃপক্ষের কাছে মনুষ্যত্বের কোন মূল্য নাই, মহত্ত্বের মর্য্যাদা রক্ষা তাহাদের কাছে দুর্ব্বলের দুর্ব্বলতা মাত্র! তাই শক্তিমত্তার সদ্ব্যবহার করিতে এবার তাহারা সঙ্কল্পারূঢ় হইল। বহু জেল সিপাই মিলিয়া শ্রীযুক্ত সেনকে হেঁচড়াইয়া টানিয়া লইয়া চলিল জেল গেটের দিকে। দেহ তাঁহার ক্ষতবিক্ষত হইতে লাগিল, রক্তে ভিজিয়া গেল জেলের মাটি আর তাঁহার দেহ, কিন্তু, তবু যন্ত্রণার লেশমাত্র চিহ্ন পরিস্ফুট হইল না তাঁহার আননে, প্রতিহিংসার একটা কথা-ও উচ্চারিত হইল না তাঁহার মুখে! জেল-কর্তৃপক্ষ কিন্তু তবু-ও নির্ব্বিকল্প! কর্ত্তব্য সাধন তাহাদেরও করিতে হইবে যে! সরকারের আদেশ যে পালন করিতে হইবে।

এমনিভাবে পশুত্বের চরম নিদর্শন দেখাইয়া সেদিনের জেল কর্তৃপক্ষ শ্রীযুক্ত সেনকে কোর্টে লইয়া গেল। সরকারের আদেশ পালিত হইল অক্ষরে অক্ষরে! সুসভ্য ইংরেজ জাতি! সভ্যতা-চিহ্নিত তাঁহাদের ইতিহাস! তাহা না হইলে কে কবে শুনিয়াছে দেশের অগণিত মানুষের শ্রদ্ধার আসনে যিনি অধিষ্ঠিত তাঁহার প্রতি অমন নিষ্ঠুর ব্যবহার, এমন হৃদয়হীন পাশবিকতা? আর, এমন দৃষ্টান্ত কি শুধু ইংরেজ সরকারের শাসনে সেদিন ঐ একটিই ঘটিয়াছে? ইংরেজ চলিয়া গিয়াছে,

ভাল কথা। কিন্তু পেছনে রাখিয়া গিয়াছে এমনি অনেক অক্ষয় ঐতিহ্য, এমনি অনেক উদার কর্ম্মচারী, যাহারা আজও অনেক সরকারী আসনই অলঙ্কৃত করিয়া আছেন ; সেইখানেই ভয়!

শ্রীযুক্ত সতীন সেনের সারা জীবনই এমনিভাবে সংগ্রামের মধ্য দিয়া অতিবাহিত হইয়াছে। দেউলীর সংগ্রামে-ও তাঁহার নেতৃত্বের কথা ইতিপূর্ব্বে উল্লেখ করিয়াছি। সংগ্রামই ছিল তাহার জীবনের চিন্তা, ধর্ম্ম এবং তপস্যা। তাই তাঁহাকে খেলাধূলা কিংবা অন্য কোন আনন্দের আসরে তেমন উৎসাহশীল দেখি নাই। নিমন্ত্রণ করিলে তিনি যাইতেন এবং হয়তো আনন্দ কিছু উপভোগ-ও করিতেন, কিন্তু, তাঁহাকে দেখিলে মনে হইত, এ যেন তাঁহার জন্য নয়, জোর করিয়া তাঁহাকে এই উৎসব-বাসরে বসানো হইয়াছে।

তাঁহার সঙ্গে আলাপ-আলোচনা খুব কমই করিয়াছি, কিন্তু, যতটুকু করিয়াছি তাহাতে এ কথাই বুঝিয়াছি যে, জীবনে তাঁহার একটি মাত্র দিকই আছে, অন্যায় ও অবিচারের বিরুদ্ধে বিরামবিহীন সংগ্রাম। অনেকে এ জন্যে ভয়ে তাঁহার কাছে বড় একটা যাইতেও চাহিতেন না। তরুণরা তো নয়ই, বড়দের মধ্যে-ও দু'এক জনকে বলিতে শুনিয়াছি, 'না সতীনের কাছে গেলেই বিপদ, কথা শুরু হইলেই ও বলিতে সুরু করে উত্তুঙ্গ পাহাড়, অবাধ জলস্রোত, অনলবর্ষী আগ্নেয়গিরি, এই সব! দৈনন্দিন কথাবার্ত্তায় ও ধরাছোঁওয়া দিতেই চায় না'।

কথাটা যিনি বলিয়াছিলেন তিনি সতীনদা'র প্রতি অত্যন্ত স্নেহপরবশ হইয়াই কথাটা হাসিঠাট্টার সূত্রে বলিয়া ছিলেন, কিন্তু ঐ রস পরিবেশনের মধ্যে একটা গভীর সত্য নিহিত ছিল। একথা মিথ্যা নয় যে, সতীনদার সঙ্গে কথা বলিতে গেলেই কিছুক্ষণের মধ্যেই অনুভব করিতে হইত একটা রুদ্ধ জলস্রোত যেন অকস্মাৎ উন্মুখর হইয়া উঠিয়াছে। কোথায় যে তাহার শেষ কে জানে?

এত অনন্যমনা যিনি, তিনি যে আমাদের খেলার উত্তাপ-উত্তেজনায় ধরা দিবেন না ইহাতে বিস্ময়ের কিছু ছিল না। কিন্তু, তবু-ও মাঝে-মাঝে মনে হইয়াছে যে, ধরা দিলেও কি-ই বা এমন ক্ষতি? খেলাটা তো আর বন্দীজীবনের সবখানি নয়, ইহা তাহার বন্দীত্বের একটা ক্ষণিকের বিস্মরণ মাত্র। ইংরেজীতে বলিতে গেলে বলিতে হয় *diversion* —মানুষের জীবনে এই *diversion*-এরও তো প্রয়োজন আছে। কারণ ইহা তো মানুষের কর্ম্মশক্তি ও সঙ্কল্পকে হ্রাস করে না, বরং এই ক্ষণিকের বিস্মৃতি মানুষের কর্ম্মপ্রেরণাকে নূতন প্রাণশক্তিতেই সঞ্জীবিত করে। ইহাই তো সাধারণ নিয়ম। কিন্তু, নিঃসন্দেহে একথা বলা চলে যে, সতীন-দা ছিলেন ইহার ব্যতিক্রম। তাই কোন দিনই জেলখানায় এমন কোন কাজে তাঁহার উৎসাহ দেখি নাই যাহাতে কোন সংগ্রামের সংস্পর্শ না ছিল। ক্রীড়াকৌতুক কিংবা অন্য কোন আনন্দ-উৎসবে সকলেই যোগদান করুক, ইহাতে

তাঁহার আপত্তি কোন দিনই ছিল না, কিন্তু তিনি নিজে বরাবরই ইহাদের আওতার বাহিরে থাকিতেন। সত্য কথা বলিতে কি, জেলখানায় এবং জেলের বাহিরে স্বদেশানুরাগী বহু ব্যক্তিরই সাক্ষাৎ মিলিয়াছে, কিন্তু, এমন নিষ্ঠা, এমন একাগ্রতা খুব কমই চোখে পড়িয়াছে।

ছাব্বিশ

সুখ-দুঃখ, আলো-ছায়া, জীবন-মৃত্যু, এই লইয়াই তো মানুষের প্রতিদিনের পথ চলা। জেলখানায়ও তাহার বিন্দুমাত্র ব্যতিক্রম হওয়ার যো ছিল না। কারণ যত শক্তিমান হউক না কেন জেল-সুপার মিষ্টার ফিগে, যত জাঁদরেলই হউক না কেন তাঁহার সিপাই সান্ত্রীরা, যত কঠিনই হউক না কেন জেলের পাষাণ-প্রাচীর, দ্বারের লৌহ-নিগড়, সুখ-দুঃখের, আলো-ছায়ার প্রবেশ পথ রোধ করিয়া রাখিবে এমন সাধ্য তাহাদের ছিল না। সুতরাং, স্বাভাবিক নিয়মানুসারেই জেলের অভ্যন্তরেও তাহারা

অনায়াসেই প্রবেশ করিত এবং স্বাভাবিক ভাবেই দোল দিয়া যাইত বন্দীদের জীবন প্রবাহে।

রাজবন্দীদের জীবন-যাত্রা দেউলী জেলে ছিল একান্তই সমষ্টিগত। একই সঙ্গে থাকিবার ব্যবস্থা, একই সঙ্গে খাওয়া-পড়া, খেলাধুলা এবং একই সঙ্গে সুবিস্তৃত মাঠে খাটের পর খাট বিছাইয়া রাত্রি যাপনের ব্যবস্থা। সমষ্টির এই ভিড়ের মধ্যে ব্যষ্টিকে আর মনেই পড়িত না। ব্যক্তিগত অভাব-অভিযোগ, ব্যক্তিগত সুখ-স্বাচ্ছন্দ্য মানুষ যেন ভুলিয়াই যাইত। নদীর অগণিত ঢেউয়ের মধ্যে কোন ঢেউকেই যেমন আলাদা করিয়া দেখিবার সুযোগ হয় না, এ ও যেন তাই। প্রত্যেকের সমবেত পদক্ষেপে চলার যে ধ্বনি উঠিত, তাহাই দেউলীর জীবন যাত্রার সমন্বিত পদধ্বনি, বন্দীজীবনের রুদ্ধ, সংহত প্রবাহ। কিন্তু, এই সামষ্টিক জীবন যাত্রারও যে মাঝে-মাঝে ব্যতিক্রম না ঘটিত এমন নয়। ব্যক্তির জীবনে এক-একটি আঘাত সমস্ত সমষ্টি জীবনকেই তোলপাড় করিয়া তুলিত। সেদিন বন্দীজীবনের বড় দুর্দিন, সামষ্টিক জীবনের সেদিন ছন্দপতন।

বন্দীদের কাছে বাহিরের জগৎটা যবনিকার অন্তরালে ঢাকা থাকিলেও যে-জগৎটা দুর্ঘটনার, দুঃসংবাদের, সে জগৎটা একেবারে মসীলিপ্ত ছিল না এবং তাহারই মধ্য হইতে মাঝে-মাঝে এমন এক-একটি সংবাদ আসিত যাহা কোন বিশেষ বন্ধুর একান্ত ব্যক্তিগত হইলেও তাহার ঢেউ আসিয়া

লাগিত সকলেরই জীবনে এবং কিছুদিনের জন্য সকলেই যেন কেমন একটু উদাস, একটু খাপছাড়া হইয়া পড়িতেন। এমনি একটি ঘটনার কথা বলিতেছি।

খেলার পরে সান্ধ্য বৈঠক জমিয়া উঠিয়াছে, হৈ-চৈ, আনন্দ উল্লম্ফনের অন্ত নাই, এমন সময় হঠাৎ হন্তদন্ত হইয়া সন্তোষদা আসিয়া হাজির। তাঁহার চেহারা দেখিয়া বুঝিতে কাহারও বাকি রহিল না যে, সন্তোষদা কোন সুসংবাদ লইয়া আমাদের কাছে হাজির হন নাই। ঐ ভাবে এত ব্যস্তসমস্ত হইয়া তাঁহাকে আসিতে দেখিয়া, সকলেই চুপ করিয়া রহিল।

সন্তোষদা বলিলেন,—'খবর খুব খারাপ, '—র' বাবা মারা গেছেন।'

শুনিয়া চমকিয়া উঠিলাম। এত দূরদেশে, বন্দী অবস্থায় পিতার মৃত্যু সংবাদ যে কত সাংঘাতিক তাহা শুধু ভুক্ত-ভোগী যে সেই অনুভব করিতে পারে। '—র' কথা কথা ভাবিতে-ভাবিতে হঠাৎ নিজের বাড়ীর কথা মনে পড়িয়া গেল। বাড়ীতে বৃদ্ধা মাতা, রুগ্ন পিতা বছরের পর বছর যাপন করিতেছেন হয় তো একটি ভবিষ্যৎ দিনের আশায়! কিন্তু, সেদিন আসিবে কি না, সে আশা পূর্ণ হইবে কি না, কে জানে? কে জানে হয়তো বা এমনি একদিন বাহির হইতে—কিন্তু থাক সে কথা।

সভা ভাঙ্গিয়া গেল, সকলেই একে একে গেলাম, '—র' ঘরের দিকে। দেখিলাম খাটের উপর চুপ করিয়া বসিয়া আছেন

—বাবু। হাতে তাঁহার এক টুকরা কাগজ, তাহাতে লেখা—'*Father expired yesterday. Start immediately. Mantu.*'

তারিখ মিলাইয়া দেখিলাম, টেলিগ্রামটি আসিতে লাগিয়াছে পাঁচদিন। তাহা তো লাগিবেই, পৃথিবীর এক প্রান্ত হইতে অপর প্রান্ত পর্য্যন্ত সংবাদ আদান-প্রদান যখন এক দিনেই হইতে পারে তখন বরিশাল হইতে দেউলি যাইতে একটি টেলিগ্রামের পাঁচদিন যদি না লাগে তাহা হইলে জেলখানা ও বাহির এই দুইয়ের মধ্যে পার্থক্য রহিল কোথায়? সেন্সর বিভাগ আছে, তাহাদের কর্ম্মতৎপরতা আছে, *I. B. C. I. D.* আছে, জেল সুপারিণ্টেণ্ডেণ্ট আছেন এতগুলি বাধাবিপত্তি পার হইয়া তবে তো জেলখানার প্রবেশ পথ!

তবু ভাগ্য, পাঁচ দিনেই হউক, আর সাত দিনেই হউক, টেলিগ্রামটি ভিতরে আসিয়াছে এবং অক্ষত দেহেই আসিয়াছে।

বহরমপুর ক্যাম্পে অনুরূপ একটি ঘটনায় নাকি একটি টেলিগ্রামের অর্দ্ধেকটা মাত্র ঢুকিতে পারিয়াছিল। সেখানেও কোন রাজবন্দীর আত্মীয়-বিয়োগের সংবাদের পর '*Come immediately*' শব্দ দুইটি লেখা ছিল। সেন্সর-বিভাগ পরম যত্ন সহকারে '*Come immediately*' শব্দ দুইটি কাটিয়া দিয়াছিলেন! পরে অনুসন্ধান করিয়া জানা গিয়াছে যে,' এই দুইটি শব্দ কাটিয়া দেওয়ার কারণ হইতেছে এই যে, শব্দ দুইটি নাকি *Provocative*—অর্থাৎ আত্মীয়-বিয়োগের

সংবাদের সঙ্গে ঐ শব্দ দুইটি যুক্ত করিলে বন্দীর মনে এমন *provocation*-এর সৃষ্টি হইতে পারে যে, সংশ্লিষ্ট বন্দী উত্তেজনার মুখে ঐ '*Come immeditely*' শব্দ দুইটিকে কাজে পরিণত করিয়া ফেলিতে পারেন! সত্যই, এ হেন সেন্সর-বিভাগকে তারিফ না করিয়া থাকা যায় না।

দেউলীর সেন্সর-বিভাগ কিন্তু, ব্যাপারটা অত তলাইয়া দেখেন নাই এবং সেইজন্যই অক্ষত দেহেই তারবার্ত্তাটি ভিতরে আসিতে পারিয়াছিল।

—র বাবু টেলিগ্রামটি হাতে করিয়া বসিয়াই রহিলেন। কেহ তাঁহার ধ্যান ভাঙাইতে সাহস করিল না। সামান্য ঐ কাগজের টুকরাটি একটা বিরাট বিশ্বের ঢাকা আজ তাঁহার কাছে খুলিয়া দিয়াছে। '*Father expired*' দুইটি তো মাত্র কথা, কিন্তু কত বড় একটা নিষ্ঠুর সত্যের বাহক এই শব্দ দুইটি কত মর্ম্মান্তিক এক দুর্ঘটনার প্রতিচ্ছবি। মা চলিয়া গিয়াছেন বহুদিন পূর্ব্বেই আজ বাবাও চলিয়া গেলেন। কিন্তু সত্যই কি পিতা তাঁহার মৃত, সত্যই কি ঐ দুইটি শব্দ তাহাকে এমন করিয়া অনাথ করিয়া ফেলিল? আজ তাঁহার দৃষ্টিপথে শুধু ভাসিয়া আসিতে লাগিল দূরের সংসারটি আর তাহারই মধ্যে ছোট দুইটি ভাই-বোনের দুটি শোক-বিষণ্ণ মলিন মুখ! কে তাহাদের পাশে আসিয়া আজ দাঁড়াইবে, কে উচ্চারণ করিবে দুইটি সান্ত্বনার বাক্য? কাছে আসিয়া যে দাঁড়াইতে পারিত, বুকে জড়াইয়া ধরিয়া যে দিতে পারিত আশ্বাস, যে

দিতে পারিত সান্ত্বনা, সে দাদা আজ কোথায়, কিই বা জানে তাহারা ? আবার তিনি চাহিলেন ঐ টেলিগ্রামটির দিকে, *'Come immediately-Mantu'* আঁখি-দুইটি তাঁহার সজল হইয়া উঠিল। এই শব্দ দুইটির মধ্যে তিনি যেন শুনিতে পাইলেন উপায়হীন, অসহায়, তাঁহার দুইটি ভাই বোনের আকুল ক্রন্দন!

পাঁচদিন হইল বাবা মারা গিয়াছেন, মণ্টু আর ছন্দা হয়তো তাহারই আশাপথ চাহিয়া বসিয়া আছে। পাড়া-পড়শীরা হয় তো সান্ত্বনা দিতেছে, টেলিগ্রাম যখন গিয়াছে দাদা আসিয়া পড়িল বলিয়া! ছোট দুইটি ছেলে-মেয়ে, তাহারা কি জানে জেলের আইন-কানুন। তাহারা কি জানে শুধু *'Come immediately'* লেখা থাকিলেই জেল হইতে যাওয়া যায় না। তাহারা তো আর জানে না যে, সরকারের কাছে, জেল কর্তৃপক্ষের কাছে, মা বাবা নাই, স্ত্রী পুত্র নাই, ভাই-বোন নাই—আছে শুধু আইন ও শৃঙ্খলা যাহা শুধু বন্দীর জন্য, মানুষের জন্য তো নয়!

এই শাসন ও শৃঙ্খলার পথ ধরিয়াই একদিন তাঁহার কাছে খবর আসিল যে, সরকার তাঁহার ছুটির দরখাস্ত মঞ্জুর করেন নাই! এ সংবাদটি যেন তাঁহার বুকে শেলের মত বিঁধিল। পিতার মৃত্যু-সংবাদ তাঁহাকে তেমন আঘাত করে নাই যেমন করিয়া আঘাত করিল বন্দীজীবনের আজিকার এই অসহায় অক্ষমতা। আজ শুধু তাঁহার মনের কোণে ভাসিয়া আসিতে

লাগিল দুইটি নিঃসহায় মুখ, দুইটি নিষ্করুণ ছবি, মন্টু আর ছন্দা—ছন্দা আর মন্টু। সমস্ত পরিবেশ তাঁহার কাছে আজ মিথ্যা। মনে হইল আকাশ মিথ্যা, বাতাস মিথ্যা, পৃথিবী মিথ্যা। এই মিথ্যা জগতের মধ্যে একমাত্র সত্য দয়াহীন, ক্ষমাহীন নিষ্ঠুর বন্দীশালার দুর্নিবার এ বন্ধন-শৃঙ্খল।

বেলা ডুবিয়া কখন সন্ধ্যা হইয়া গিয়াছে, সন্ধ্যার পর আসিয়াছে রাত্রি, খেয়ালই ছিলনা। হঠাৎ—বাবু সচকিত হইয়া উঠিলেন কাহার যেন পদশব্দে। পেছনে চাহিলেন, ঘরের কয়েদি আসিয়া হাতে একটি চিঠি দিয়া গেল, খামের চিঠি। রুদ্ধ নিশ্বাসে চিঠিখানি তিনি খুলিলেন। যাহা ভাবিয়াছিলেন তাহাই—মন্টুর চিঠি। মন্টু লিখিয়াছে ঃ

"দাদা, তুমি আজো আসিলে না। আমরা কি করিব? বাবা মারা গিয়াছেন অনেকদিন, আমরা দুইজনে এখন একা! ছন্দা কেবল বাবার জন্য কাঁদে। ও ছেলেমানুষ, কিছু বোঝেনা, কেবল বাবাকে খোঁজে. আমি ওকে ভুলাইয়া রাখি। বলি, দাদা আজই আসিবে। বাবাও আসিবে। রোজই এক কথা বলি, তবু তুমি আস না। ছন্দা বলে, কই, দাদা আসিল কই? আমি আর কি বলিব? তুমি আর দেরি করিও না। গাড়ীর শব্দ শুনিয়া আমি ও ছন্দা দরজা খুলিয়া বাহিরে আসি, গাড়ী চলিয়া যায় আমাদের দরজায় থামে না। ছন্দা শুধু বলে, গাড়ী থামেনা কেন, দাদা আসেনা কেন? দাদা, তুমি কি আসিবে না? তুমি না আসিলে আমরা কি করিব? কোথায় যাইব?"

ছোট্ট দুইটি অনাথ শিশুর অসহায় মনের অভিব্যক্তি। সেন্সর-বিভাগ এ চিঠি পড়িয়াছেন, কর্তৃপক্ষ পড়িয়াছেন,

সরকার জানিয়াছেন সবই। কিন্তু তবু তাহারা নির্ব্বিকার! নিষ্ঠুর ভাগ্য নিষ্ঠুর এ পৃথিবীর বুকে দুইটি অসহায় শিশুকে এমন করিয়া ফেলিয়া রাখিয়া গেল। কে তাহাদের আছে? কেহ নাই। এক দাদা আছেন, তাঁহারই পথ চাহিয়া তাহারা বসিয়া থাকে। দাদা আসেন না। কত গাড়ী আসে, কত গাড়ী চলিয়া যায়, দাদা তবু আসে না! এই আকুলতার কি মূল্য আছে ইংরেজের কাছে, সরকারের কাছে, জেল কর্ত্তৃপক্ষের কাছে? তাঁহাদের কাছে যে এই দুইটি শিশুর প্রাণের মূল্য অপেক্ষা ভারত-সাম্রাজ্যের মূল্য অনেক বেশী। কি জানি,— বাবুকে কিছুদিনের ছুটি দিলে যদি ইংরেজ রাজ্যের ভিৎ টলিয়া যায়, যদি মাটি ধ্বসিয়া পড়ে? তাহার চেয়ে মরুক না দুইটি অনাথ শিশু! এমনি কত ব্যথা, কত মৃত্যুর উপরেই তো গাঁথা আছে ইংরেজের সাম্রাজ্যবাদের বনিয়াদ। তাহারই চাপে যদি মরে আজ মণ্টু, যদি না বাঁচে ছন্দা তাহা হইলে এমন কি-ই বা ইংরেজ সরকারের আসে যায়?

ডেটিনিউ সরকারের চোখে তাঁহারা তো ইংরেজ গভর্ণমেণ্টের চরমতম শত্রু। দেশে যত বৈপ্লবিক কার্য্যকলাপ তখন সংঘটিত হইতেছিল, এই ডেটিনিউদের সঙ্গেই নাকি তাহাদের পরোক্ষ তো বটেই, প্রত্যক্ষ যোগাযোগও বর্ত্তমান। সে যুগের '*Statesman*' পত্রিকার সম্পাদকীয় স্তম্ভ হইতে কয়েকটি লাইন উদ্ধৃত করিলেই ডেটিনিউদের সম্পর্কে তদানীন্তন ইংরেজ সমাজের মনোভাবের পরিচয় কিছুটা পাওয়া যাইবে। '*Statesman*' পত্রিকা সতের

বছর আগে লিখিতেছেন, '*The Govt. obviously believes that a considerable number of detenus are actually guilty of encouraging political murders and in some cases of directly concerned in them, but it cannot submit its proof in court. It has not accepted the position that innocent persons are suffering.*'

অর্থাৎ, ইংরেজ সরকার কেবল কোর্টে প্রমাণ দাখিল করিতে চাহেন না বলিয়াই ডেটিনিউরা বিনা বিচারে বন্দী, আসলে ইহাদের অনেকেই রাজনৈতিক হত্যাকাণ্ডের প্ররোচক তো বটেই, এমনও কিছু লোক আছেন যাঁহারা সত্যসত্যই হত্যাকাণ্ডে লিপ্ত।'

এই যেখানে মনোভাব সেখানে ইংরেজ সরকারের কাছে ডেটিনিউরা মানবিক ব্যবহার পাইবে কি করিয়া ? ঐ সময়েরই উক্ত পত্রিকার আর একটি সম্পাদকীয় প্রবন্ধের কয়েকটি লাইন শুনুন, '*A correspondent lately urged that if another European was murdered, detenus should be shot* (*Statesman, Sept. 1933*)

আর একজন ইউরোপীয়কেও যদি হত্যা করা হয় তাহা হইলে ডেটেনিউদের গুলি করিয়া মারা উচিত।

পত্রলেখক ভদ্রলোক অবশ্য অতিমাত্রায় সভ্য এবং অতি-মাত্রায় *British*, কারণ তাহার পরেই '*Statesman*' লিখিতেছেন, '*but he admitted that this was not*

the British way and he did not expect his advice to be taken." ডেটিনিউদের গুলি করার কথা বলিলেও তাহা যে বৃটিশ জাতির পন্থা নহে সে সম্বন্ধে তিনি সজাগ এবং তাঁহার উপদেশ যাহাতে গৃহীত না হয় তাহাই তাঁহার ইচ্ছা!

পত্রলেখক ভদ্রলোকের মনোভাব সম্বন্ধে ভুল বুঝিবার কোন অবকাশ নাই। তাঁহার ভাবখানা এই যে, উপদেশ আমি দিলাম, সে উপদেশ মানিবার দরকার নাই, তবে ভুলিয়া যাইও না! আর *Statesman* পত্রিকা একেবারে সম্পাদকীয় স্তম্ভে সে চিঠির মর্ম্মাংশ, '*detenus should be shot,*' ছাপাইয়া বলিলেন, '*but he did not expect his advice to be taken*' ইহার অর্থ আরো পরিষ্কার, অর্থাৎ, লোকে যে বলিতেছে ডেটিনিউদের গুলি করিয়া মারা উচিত, তাহা তোমরা শুনিতেছ তো? অবশ্য সে অনুসারে কাজ করিতে হইবে এমন কথা বলি না, কিন্তু শুনিয়া রাখা দরকার!

সাতাশ

জেল-কর্তৃপক্ষ আইনের মর্য্যাদা রাখিতে জানেন না, একথা তাহাদের পরমশত্রুও তাহাদের বিরুদ্ধে বলিতে পারিবে না। সেই আইন অনুসারে জেলের মধ্যেই হিন্দু বিধানমতে '—বাবুর' পিতৃ-শ্রাদ্ধ অনুষ্ঠানের ব্যবস্থা হইয়া গেল। পুরোহিত আসিল, মন্ত্র উচ্চারিত হইল, গীতাপাঠ হইল, ব্রাহ্মণ-ভোজনও বাদ গেল না। তবে, রাজপুতানার পুরোহিত! কি যে তিনি করিলেন এবং কি করিলেন না, তাহা তিনি ছাড়া আর কেহ বুঝিতে পারে নাই। কেবল ভোজ্য এবং দক্ষিণা বুঝিয়া লওয়ার সময় এবং শ্রাদ্ধের পরে ভূরি ভোজনের

সময় দেখা গেল বাংলার পুরোহিত ও রাজপুতানার পুরোহিতের সঙ্গে কোন পার্থক্য নাই! ব্রাহ্মণ পুরোহিতদের মধ্যে এই একটি জায়গায় ঐক্য হয় তো ভারতবর্ষের সর্ব্বত্র বিরাজমান।

তবু রাজপুতানার এই পুরোহিতটিকে আমাদের খুব খারাপ লাগিয়াছিল এমন কথা কিছুতেই বলিতে পারি না। তাহার কারণ হইতেছে এই যে, উক্ত পুরোহিতটি ছিলেন সর্ব্বজ্ঞ, যে কোন বিষয়ে যে কোন কথাই উঠুক না কেন, এক নিমেষেই তিনি তাহার সমাধান করিয়া ফেলেন এবং তাঁহার চোখে মুখে এমন ভাব প্রকাশ পায় যে, তিনি যাহা বলিতেছেন সেটা তাঁহার কথা নয়, স্বয়ং ভগবানেরই কথা! তাঁহার মুখ দিয়া কথাগুলি শুধু বাহির হইতেছে মাত্র! সুতরাং বহুক্ষণ তাঁহার সঙ্গে কাটাইয়া, বহু কথা শুনিয়া এবং কিছু কথা বলিয়া পুরোহিতকে আমরা বিদায় দিলাম। যাওয়ার সময় জিজ্ঞাসা করিলাম, 'কবে আপনার সঙ্গে আবার দেখা হইবে?'

নির্ব্বিকার চিত্তে তিনি বলিলেন, 'ভগবানের যদি দয়া হয় তাহা হইলে আবার তিনি শীঘ্রই এখানে আসিবেন এবং আবার আমাদের সঙ্গে দেখা সাক্ষাৎ করিয়া খাওয়া-দাওয়া করিয়া আর একদিন আনন্দে কাটাইয়া যাইবেন।'

বুঝিতে আর বাকি রহিল না যে, পুরোহিতটি আমাদের পরম হিতাকাঙ্ক্ষী! কারণ, ভগবানের যদি দয়া হয় তাহা হইলেই ঘন-ঘন ডেটিনিউদের মাতাপিতার মৃত্যু-সংবাদ আসিতে

পারে এবং তাহা হইলেই কাহারও না কাহারও মাতৃশ্রাদ্ধ কিংবা পিতৃশ্রাদ্ধ উপলক্ষ করিয়া পুরোহিত ঠাকুরও আমাদের ঘন-ঘন দর্শন দিতে পারেন। আত্মীয়-স্বজন-হীন দূর-দূরান্তের কারাবাসে বসিয়া এমন শুভাকাঙ্ক্ষীর সান্নিধ্যলাভ সত্যিই ভাগ্যের কথা!

অনেকদিন পার হইয়া গিয়াছে। '—বাবুর' কথা প্রায় ভুলিতেই বসিয়াছিলাম এমন সময় একদিন অকস্মাৎ সংবাদ আসিল '—বাবুকে' বাংলার জেলে বদলী করিবার হুকুম আসিয়াছে। বাংলার জেলে বদলী! তাও আবার দেউলীজেল হইতে! একথা যে সেদিন ছিল দেউলী-বন্দীদের চিন্তার-ও বাইরে। ভাবিলাম, বহুদিন পরে হয় তো বা '—বাবুর' বরাত ফিরিল, হয় তো বা সরকার এতদিনে তাঁহার প্রতি মুখ তুলিয়া চাহিলেন। কারণ, ছুটিছাটার ব্যাপারে সরকারের বরাবরই একটু নড়িতে-চড়িতে সময় লাগে। প্রথম করিতে হয় দরখাস্ত, সে দরখাস্ত তো সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষ গ্রাহ্যই করেন না যতদিন একাধিক *reminder* না যায়! এসম্পর্কে একটি ঘটনাও জেলখানায় ঘটিয়াছিল তাহার উল্লেখ যদি না করি, অন্যায় হইবে।

শ্রীযুক্ত কালীপদ বন্দ্যোপাধ্যায়ের কথা নিশ্চয়ই আপনারা ভুলিয়া যান নাই। সেই কালীপদ বাবুর (মালুবাবু) মাতৃ-দেবীর অসুখ, ছুটির দরকার। তিনি করিলেন কি, জেল কর্তৃপক্ষের মারফৎ সরকারের কাছে ছুটির দরখাস্ত না করিয়াই

দরখাস্তের একটি *reminder* আগে পাঠাইয়া দিলেন। *reminder*-টির শেষে লিখিয়া দিলেন, '*application follows*' জেল কর্ত্তৃপক্ষ তো অবাক! দরখাস্ত নাই, আগেই তার *reminder*! ব্যাপার কি!

মালুবাবুকে অফিসে ডাকিয়া পাঠান হইল। মালুবাবু জেলকর্ত্তৃপক্ষকে বুঝাইয়া দিলেন, 'দরখাস্ত পাঠাইয়া লাভ কি? *reminder* না যাওয়া পর্য্যন্ত তো আপনারা দরখাস্তটি পড়িয়াও দেখিবেন না। সেই জন্যই এবার ঠিক্ করিয়াছি আগে *reminder* দিব, পরে দরখাস্ত!' মালুবাবুর কথাটা যে কত সত্য তাহা জেল-কর্ত্তৃপক্ষ জানিতেন।

তাঁহারা মালুবাবুকে বলিলেন, 'দরখাস্তটি পাঠিয়ে দিন, আজই আমরা তা সরকারের কাছে পাঠিয়ে দিচ্ছি।'

মালুবাবু বলিলেন, 'তা না হয় দিলাম, কিন্তু সরকারের দপ্তরের তো ঐ একই অবস্থা, তাই দরখাস্তটি আর *reminder* -টি একসঙ্গেই পাঠিয়ে দেবেন।'

কর্ত্তৃপক্ষ শেষ পর্য্যন্ত মালুবাবুর অনুরোধ রক্ষা করিয়াছিলেন কি না জানি না, তবে মালুবাবু যে ছুটি পান নাই সে-কথাটা বেশ মনে আছে।

জেল-কর্ত্তৃপক্ষ হইতে সরকারী দপ্তর পর্য্যন্ত এই গড়িমসির কথাটা রাজবন্দীদের সকলেরই জানা ছিল। কারণ, এমন ঘটনাও ঘটিতে দেখিয়াছি যে, তিনমাস অতীত হইয়া যাইবার পর, কোন রাজবন্দীর পিতৃশ্রাদ্ধের ছুটির দরখাস্ত মঞ্জুর

হইয়াছে। তাই '—বাবুর' যখন বাংলায় বদলী হওয়ার আদেশ আসিল ভাবিলাম, এবার বোধ হয় সত্যই তিনি মুক্তি না পাইলেও অন্তত কিছুদিনের ছুটি পাইবেন। মণ্টু ও ছন্দার শেষ পর্য্যন্ত একটা ব্যবস্থা তিনি করিয়া আসিতে পারিবেন।

কিন্তু, তাহা হইল না। কিছুদিন পরেই তিনি আবার বাংলার জেল হইতে দেউলীতে ফিরিয়া আসিলেন। তাঁহার মুখে যে-কথাগুলি শুনিলাম তাহাতে একদিকে সরকারের প্রতি যেমন জন্মিল বিদ্বেষ, অপরপক্ষে তাঁহার প্রতি অকপট শ্রদ্ধায় মনটা ভরিয়া উঠিল।

বাংলাদেশে যাওয়ার পরে সরকার তাঁহার প্রতি মুক্তির আদেশ দেন। সে আদেশে ছিল:

'তোমার পিতার মৃত্যুর পরে, তোমার ভাই বোন ও বাড়ী ঘরের অসহায় অবস্থার দিকে চাহিয়া সরকার তোমার প্রতি মুক্তির আদেশ দিতেছেন এই সর্ত্তে যে, মুক্তির পরে তুমি আর রাজনৈতিক আন্দোলন কিংবা ক্রিয়াকলাপের সঙ্গে প্রত্যক্ষ কিংবা পরোক্ষভাবে যোগ দিতে পারিবে না।'

'—বাবু' বলিলেন, 'আদেশ-পত্রের প্রথম কয়টি লাইন পড়িয়া যতটা খুসি হইয়াছিলাম, শেষের কয়টি ছত্রে ততটা বিস্মিত হইলাম। যে সরকারী কর্ম্মচারীটি আদেশ জারি করিতে আসিয়াছিল, তাহারই সম্মুখে আদেশ-পত্র টুকরা টুকরা করিয়া ছিঁড়িয়া ফেলিলাম। বলিলাম, 'চলে যাও, চাই না আমি মুক্তি।'

কর্ম্মচারী চলিয়া গেল। তাহার তিনদিন পরে আর একটি সরকারী আদেশ আমার উপর জারি হইল। তাহা মুক্তির আদেশ নয়, দেউলী প্রত্যাবর্ত্তনের আদেশ। চলিয়া আসিলাম। একটু থামিয়া '—বাবু' বলিলেন, 'ওরা ভেবেছিল, আমার এই অসহায় অবস্থার সুযোগে, এই দুর্ব্বলতার সুযোগে আমাকে দিয়ে মুক্তির নামে আর একটা দাসখত লিখিয়ে নেবে। ভেবেছিল, আমার যা অবস্থা তাতে মুক্তি আমি ক্রয় করব যে কোন মূল্য দিয়ে, আমার আত্মসম্মান, বিবেক, দেশসেবা সবকিছুর বিনিময়ে আমি বেছে নেব ইংরেজের দেওয়া এই ঘৃণিত মুক্তি, মুক্তির নামে আর একটা দাসত্ব-শৃঙ্খল। তাতে মণ্টু আর ছন্দা হয় তো বাঁচত, কিন্তু, এই দুইটি বালক বালিকার বাঁচার পথে আমি খুলে দিতাম কতনা মণ্টু আর ছন্দার মৃত্যুর পথ, কত দেশবাসীর শ্মশান-যাত্রার পথ। মৃত্যু যদি লেখা থাকে ওরা তো মরবেই। ভাববে হয় তো, দাদা ওদের নিষ্ঠুর। কিন্তু ওরা তো বুঝবে না, সরকারের এই কারসাজির মধ্যে রয়ে গেছে সমগ্র মানুষের কত বড় একটা মৃত্যুর ফাঁদ।" এই বলে '—বাবু' থামিলেন। হয় তো বা দু' ফোঁটা চোখের জল তাঁহার গড়াইয়া পড়িল মণ্টু আর ছন্দার উদ্দেশ্যে। ওরা তা টের-ও পেল না। বুঝিতে পারিল না ওদের দাদার ঐ বিরাট প্রাণের মধ্যে কত স্নেহ জমা আছে ওদের জন্য, কত দুঃখ, কত বেদনা। ওদের কাছে শুধু সত্য হইয়া রহিল দাদার একটি নিষ্ঠুর প্রতিচ্ছবি, যেমন নিষ্করুণ

তেমনি ভীষণ। সরকার হয় তো বলিয়াছেন, তোমার দাদাকে তো মুক্তির আদেশ-পত্র দেওয়াই হইয়াছিল, কিন্তু দাদা তাহা ছিঁড়িয়া ফেলেন। একদিক দিয়া কথাটা সত্যই। কিন্তু সে যে কি মুক্তি, কিসের মূল্যে, তাহা ওরা কি বুঝিবে? ওদের কাছে শুধু একটি কথাই সত্য হইয়া থাকিবে, দাদা আসিলেন না। কতবড় একটা প্রাণ যে, একদিকে স্নেহের টানে ও অপর দিকে কর্ত্তব্য বুদ্ধির আকর্ষণে জ্বলিয়া পুড়িয়া ছাই হইয়া গেল তাহা তাহারা বুঝিতেও পারিবে না।

ইহার পরে এই বিষয় লইয়া তাঁহার সঙ্গে আর বড় একটা আলাপ হয় নাই। ইচ্ছা করিয়াই এ প্রসঙ্গ আর তুলি নাই। যে-ব্যথা, যে দুঃখের কোন নিরসনই আমরা করিতে পারিবনা, সে-কথা বারে বারে তুলিয়া লাভ কি? মণ্টু আর কোন চিঠি লিখিয়াছে কিনা তাহাও জানিনা। হয় তো লেখে নাই। হয়তো লিখিয়াছে:

'দাদা, শুনিলাম মুক্তির আদেশ পাইয়াও তুমি আস নাই, এ কথা কি সত্যি? আমার বিশ্বাস হয় না। মুক্তি পাইলে তুমি আসিবে না কেন? আমরা কি তোমার কেউ নই?'

বলিতে ইচ্ছা হয়, সত্যিই তোমরা '—বাবুর' কেউ নও। কেউ যদি হইতেই, তবে তো দাদা তোমাদের কাছে ছুটিয়াই যাইতেন, যে কোন মূল্যে মুক্তিক্রয় করিয়া দাদা গিয়া দাঁড়াইতেন তোমাদের কাছে। কিন্তু তাঁর কাছে তো তোমরাই শুধু তার ভাইবোন নও, সমগ্র দেশ জুড়িয়া যে মণ্টু ও ছন্দার

দল, তিনি যে ভাল বাসিয়াছেন তাদের সবাইকে, তাই তোমাদের ছুটি ভাই-বোনের জন্য আর সমস্ত ভাইবোনকে মৃত্যুর পথে ঠেলিয়া দিবেন তিনি কোন্ অপরাধে?

এই একটি ঘটনায় শুধু '—বাবুর' নয়, বাংলার সমগ্র বিপ্লবীদের আত্মপরিচয়ই লেখা রহিয়াছে, দেশকে তাঁহারা ভালবাসিয়াছিল সমগ্র সত্তা দিয়াই, তাই সেই ভালবাসার মূল্য হিসাবে তাঁহারা বিসর্জ্জন দিয়াছিল সবই, বাপ, মা, ভাই, বোন, আত্মীয়, পরিজন, বাড়ীঘর—সব। অথচ ইহাদের প্রতিও যে তাঁহাদের ভালবাসা তাহার কি কোন তুলনা আছে?

কিন্তু, এ ভালবাসা বীর্য্যবানের ভালবাসা, সৈনিকের ভালবাসা—দুর্ব্বল, অক্ষমের ভালবাসা নয়। সেইজন্যই আহ্বান যখন আসিয়াছে তখন সমস্ত মায়ামমতা, স্নেহ-ভালবাসার বন্ধন ছিন্ন করিয়া তাঁহারা নিষ্ঠুর পৃথিবীর পথে পা বাড়াইয়াছে, সেইজন্যই সমগ্র জীবনের যাহা আরাধ্য, তাহার পরিবর্ত্তে মুক্তি তাঁহারা ক্রয় করেন নাই। হয়তো ইহাতে ঘর গিয়াছে, সংসার গিয়াছে, বাপ মা, আত্মীয় স্বজন সবই গিয়াছে, কিন্তু তবু রহিয়াছে মানুষ আর তাহার মনুষ্যত্ব। এমনি করিয়া বাঙলা ও বাঙালীর বিপ্লবীরা, ভারতবর্ষের বিপ্লবপন্থীরা সর্ব্বস্ব ত্যাগের পথে, মনুষ্যত্বের পথে, সমগ্র জাতিকে আহ্বান জানাইয়াছে। ইংরেজ এই সাধনায় বাদ সাধিতে বারম্বার চেষ্টা করিয়াও ব্যর্থ হইয়াছে। '—বাবুর' মুক্তির আদেশ সরকারের বহু ব্যর্থ প্রয়াসের একটি মাত্র কাহিনী।

'—বাবুর' ব্যাপারে শুধু নয়, এমনি অনেক ব্যাপারেই সরকার এমনই চুক্তি-পত্রে স্বাক্ষর করিয়া মুক্তির আদেশ দিতে চেষ্টা করিতেন। কিন্তু, কেন করিতেন? সরকার কি জানিতেন না যে 'রাজনীতিতে প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষভাবে যোগ দিওনা' এই কথা কয়টি দ্বারা কোন মুক্ত রাজবন্দীকেই তিনি ভবিষ্যতের রাজনৈতিক কর্ম্ম হইতে দূরে রাখিতে পারিবেন না। সরকার কি জানিতেন না যে, চুক্তি-পত্রে স্বাক্ষর করিলেও সে-স্বাক্ষরের মর্য্যাদা তাঁহারা নাও রাখিতে পারেন। শুধু তাই নয়, রাজবন্দীদের উপর সরকারের অবিশ্বাসটা ছিল চরম। তাহা হইলে, সরকার ঐ চুক্তি-পত্রের স্বাক্ষরের উপর এত জোর দিতেন কেন? জোর দিতেন এইজন্য যে, ভবিষ্যতে এই চুক্তি-পত্রের স্বাক্ষর দেখাইয়া হয় তো বা বিপ্লবীদের মেরুদণ্ড সরকার ভাঙ্গিয়া দিতে পারিবেন। দেশের সামনে, জাতির সামনে বলিতে পারিবেন যে, মেরুদণ্ড তাঁহাদের এমন করিয়া ভাঙ্গিয়া দিয়াছি যে, মুক্তির জন্য আজ তাঁহারা পাগল, আজ যে-কোন মূল্যেই মুক্তি ক্রয় করিতে তাঁহারা বদ্ধপরিকর। এইজন্যই ইংরেজ সরকারের এত কারসাজি। রাজবন্দীরা যে এ সম্পর্কে কত সজাগ ছিল তাহা '—বাবুর সঙ্কল্প ঘোষণাতেই বোঝা গিয়াছে। তিনি বলিয়াছিলেন, 'এ ঘৃণিত মুক্তি আমি ক্রয় করিব, আমার আত্মসম্মান বিবেক এবং দেশ সেবার মূল্যে—এ কি করিয়া সম্ভব?'

আটাশ

বাহিরের জীবনে যেমনি, ঠিক তেমনি জেল জীবনেও দুঃখ সুখের মধ্য দিয়াই দিনগুলি আমাদের কাটিয়া যাইত। তবে বাহিরের জীবনের সঙ্গে জেল-জীবনের পার্থক্য ছিল এই যে, বাহিরে যেমন দুঃখকে ভুলিবার কিংবা সুখকে উপভোগ করিবার সুযোগ ছিল প্রচুর; জেলখানায় তাহা ছিল না। এখানে সুযোগ আপনা হইতে আসিত না, বন্দীদেরকেই তাহা সৃষ্টি করিয়া লইতে হইত।

দেউলী জেলে ফুটবল খেলা প্রবর্তনের সঙ্গে সঙ্গে তাহার সুযোগ আসিয়াছিল বটে, কিন্তু, তাও আপনা হইতে আসে

নাই, ইহার জন্যও বহু মেহনৎ করিয়া জেল-কর্তৃপক্ষের সঙ্গে বহু বাদানুবাদ এবং সরকারের সঙ্গে বহু ঝগড়াঝাটি করিয়াই এ সুযোগ আমাদের আদায় করিতে হইয়াছিল। ইংরেজের জেলের একটা নিয়ম সকলেই লক্ষ্য করিয়া থাকিবেন। তাহা হইতেছে এই যে, অনেক কিছুই শেষ পর্য্যন্ত তাহারা দিয়াছে তবে অনেক জল ঘোলা করিয়া তবে দিয়াছে। সহজে কোন কিছুর অনুমতি দেওয়া, এ ছিল ইংরেজ সরকারের প্রকৃতি বিরুদ্ধ।

কিন্তু তবুও একথা সত্য যে, শেষ পর্য্যন্ত খেলার মাঠ আমরা পাইয়াছিলাম এবং সত্যি কথা বলিতে কি আমরা তাহাতে বাঁচিয়া গিয়াছিলাম। ফুটবল খেলার প্রথম দিনটির কথা বলিয়াছি। দ্বিতীয় দিনে মাঠে লোক কিছু কম নামিল, কিন্তু তাহাতে উৎসাহ কিংবা উদ্দীপনার অভাব দেখা গেল না একটুও। লোক কম নামিবার কারণ হইল এই যে, প্রথমদিন যাঁহারা নামিয়াছিলেন অনেকদিনের অনভ্যাসের পরে তাঁহারা মাঠে নামিয়াছিলেন বলিয়া প্রথম ধাক্কাটা অনেকেই সামাল দিয়া উঠিতে পারেন নাই। কিন্তু যাঁহারা পারিয়াছিলেন, তাঁহাদের সংখ্যাও একেবারে কম হইবে না।

দ্বিতীয় দিনে একটি নূতন খেলোয়াড়ের সাক্ষাৎ পাওয়া গেল। নাম তাঁহার শ্রীযুক্ত রসময় শূর। রসময় বাবু ধীর স্থির মানুষ, কিন্তু, বেশ স্বাস্থ্যবান্। চুল তাঁহার অনেকগুলি পাকিয়া গেলেও দেহের মাংসপেশীগুলি তাঁহার অতীত

গৌরবের সাক্ষ্য তখনও বহন করিতেছিল। কিন্তু তাহা হইলেও একথা কেহ ভাবে নাই যে, রসময় বাবু হঠাৎ ফুটবল খেলায় নামিয়া পড়িবেন। কোন জটিল দার্শনিক তত্ত্ব কিংবা কঠোর কোন বিষয়বস্তু সম্পর্কে আলাপ-আলোচনায় রসময় বাবু প্রত্যক্ষভাবে যোগ না দিলেও একবার কান প্যাতিয়া না শুনিয়া পারিতেন না। এ কথা তাঁহার সম্বন্ধে সকলেই বিশ্বাস করিত, কিন্তু, দর্শনের আসর ছাড়িয়া একবারে ফুটবল মাঠ—এ কি করিয়া সম্ভব? আমাদের হারাণ শুনিলে নিশ্চয়ই বলিত, 'জেলখানা-কারাগার বাবু এখানে কি আর সম্ভব অসম্ভব বলে কিছু আছে? এখানে যা ঘটে তাই সম্ভব।'

সে যাহাই হউক না কেন রসময়বাবু খেলার মাঠে সত্যই নামিলেন। হৈ-হৈ রব পড়িয়া গেল। যাঁরা খেলায় সেদিন আসেন নাই তাঁহারাও খবর শুনিয়া মাঠে আসিয়া দাঁড়াইলেন। কারণ, রসময়বাবু খেলিতে নামিয়াছেন! এ ব্যাপারে রুণুদার (শ্রীযুক্ত শৈলেন দাসগুপ্ত) উৎসাহই সব চেয়ে বেশী। রুণুদা ঝানু হকি খেলোয়াড়। ফুটবল ভাল খেলিতে না পারিলেও লোকে বলিত যে 'জাজমেন্ট'-টী তাঁহার চমৎকার। কথাটা একেবারে মিথ্যা নয়, কারণ, পরে খেলায় দেখিয়াছি, রুণুদা হয় তো সমস্ত খেলায় দু-তিনবার মাত্র বল স্পর্শ করিলেন, কিন্তু সকলেই বলিল, ঐ দু'-তিনটি বলই তিনি যে ভাবে দিয়াছেন তাহা একমাত্র রুণু দাসগুপ্তের পক্ষেই নাকি সম্ভব। তাঁহার খেলা যাঁহারা আগে দেখিয়াছেন তাঁহারা

বলিলেন, 'কেমন বলেছিলাম না যে, '*Once upon a time*' —কিন্তু রুণুদার উপর কোন অবিচার না করিয়া এ কথা বলিতে পারি যে, হকি খেলায় তাঁহার যত কৃতিত্বই থাকুক না কেন, ফুটবল খেলায় সত্যিই তিনি ছিলেন, '*Once upon a time*'-এর লোক। কিন্তু সে কথা থাক। যে কথা বলিতেছিলাম সে-কথাই বলি।

রুণুদা রসময়বাবুকে ডাকিয়া বলিলেন, 'কৈ দু-একটা বল মারুন রসময় বাবু, গোল পোষ্টে।'

রসময় বাবু একটা বল মাত্র ৩।৪ গজ দূর হইতে গোলে মারিলেন, কিন্তু বলটি গোল-পোষ্টের ১০।১২ হাত উপর দিয়া নির্ব্বিবাদে চলিয়া গেল। সঙ্গে সঙ্গে রুণুদা চিৎকার করিয়া উঠিলেন, 'ই কোন্ হ্যায় রে!' কিন্তু রুণুদা চিৎকার করিলে কি হইবে! সুধীর বাবু (শ্রীযুক্ত সুধীর আইচ) একেবারে রসময় বাবুকে পাইয়া বসিলেন।

'আপনি সুরু করে দিন রসময় বাবু, আপনার হবে।'

দেউলী ফুটবল খেলার মাঠে সুধীর বাবুর কথাও যা, কলিকাতার খেলার মাঠে গোষ্ঠ পালের কথাও তা! রসময় বাবু তো পরম উৎসাহ পাইয়া গেলেন এবং যখন খেলা সুরু হইল তিনি সুধীর বাবুর প্রতিপক্ষ দলে *Centre-half*-এর *position*-এ খেলিতে সুরু করিলেন। রুণুদাও ছিলেন রসময় বাবুর পক্ষের লোক। তিনি রসময় বাবুকে বলিয়া দিলেন, '*Centre-half*' হিসাবে আপনার কাজ হইবে প্রতি-

পক্ষের *Centre forward* অর্থাৎ সুধীর বাবুকে বল লইয়া বাহির হইতে না দেওয়া। রুণু দা তো বলিয়াই খালাস!

কিন্তু, সুধীর বাবুর মতো সুদক্ষ একজন *Centre-forward*-কে রাখা অনেকের পক্ষেই অত্যন্ত কঠিন—রসময় বাবু তো নূতন খেলোয়াড়, তিনি পারিবেন কেন?

প্রতিবারই সুধীর বাবু বল লইয়া তাঁহাকে কাটাইয়া বাহির হইয়া যাইতেছেন দেখিয়া রসময় বাবু এবার এক কাজ করিলেন, বলের প্রতি লক্ষ্য না রাখিয়া রাখিলেন সুধীর বাবুর কোমরের প্রতি। রসময় বাবু জানিতেন, একবার কোন প্রকারে যদি সুধীর বাবুর কোমরের নাগাল নিজের কোমর দিয়া তিনি পাইতে পারেন তবে আর ওঁর বল লইয়া অত কায়দা করিতে হইবে না। একবার সত্য সত্যই সে সুযোগ রসময় বাবুর মিলিয়া গেল। সুধীর বাবু রসময় বাবুর একান্ত কাছেই প্রতিপক্ষকে কাটাইয়া যাইবার চেষ্টা করিতেছেন, অকস্মাৎ কাহার যেন কোমরের ধাক্কা খাইয়া তিনি ভূতলে পড়িয়া গেলেন। কিন্তু, সেটা ক্ষণিকের জন্য, পলকের মধ্যেই আবার উঠিয়া বল লইয়া অগ্রসর হইতে চেষ্টা করিলেন, কিন্তু একি! মাজা যেন ক্রমেই তাঁহার ভারি হইয়া উঠিতেছে, মনে হইল কে যেন পেছন হইতে কেবলই তাঁহাকে টানিতেছে, তিনি আর আগাইতে পারিতেছেন না। ইহার পরে সুধীর বাবু কয়েকদিন মাঠে নামিতে পারেন নাই এবং পরে যতদিন খেলিয়াছেন সম্ভবপর হইলে আর রসময় বাবুর বিপক্ষে খেলেন নাই।

শুধু তাই নয়, সুধীর বাবু বলিয়াছেন, ইহার পরেও দেউলী যতদিন তিনি ছিলেন, খেলার মাঠে কিংবা বাহিরে তাঁহার সে কোমর লইয়া কোন অসুবিধা না হইলেও, অমাবস্যা কিংবা পূর্ণিমার দিনে নাকি তাঁহাকে প্রতিবারই তাঁহার কোমরটি রসময় বাবুর কথা স্মরণ করাইয়া দিয়া যাইত !

লোকে বলে, শুধু সুধীর বাবুই নয়, পঞ্জিকা ছাড়াও যাহাতে কেহ কেহ অমাবস্যা-পূর্ণিমার সন্ধান পাইতে পারে তাহার ব্যবস্থা নাকি তিনি আরো দু'-একজনের করিয়াছেন ! কিন্তু সে তো শোনা কথা। শোনা কথার সব কিছু বিশ্বাস না করাই ভাল। তাই তাঁহার সম্পর্কে চোখে যাহা দেখিয়াছি তাহাই বলি। সেটাও খেলারই কথা, তবে ঘটিয়াছিল প্রায় আরো দশ বছর পরে, হিজলী জেলে। দেউলীর সঙ্গে ইহার কোন সম্পর্ক না থাকিলেও ইহার উল্লেখ অপ্রাসঙ্গিক হইবে না।

হিজলীর ছোট জেলে, অর্থাৎ ১৯৩৭ সালে *State prisoner*-দের যে জেলটিতে আনিয়া রাখা হইয়াছিল, সেখানে ১৯৪০-৪১ সালে অল্প কিছুদিনের জন্য থাকিবার সৌভাগ্য আমাদের হইয়াছিল। অল্প কয়েকজন রাজবন্দী আমরা তখন ছিলাম, মোট ৩৫ জনের বেশি হইবে কিনা সন্দেহ। সে জেলে না ছিল খেলার কোন মাঠ, না ছিল কোন ব্যবস্থা। তাই শুইয়া-বসিয়াই আমাদের দিনের অধিকাংশ সময় কাটাইতে হইত।

একদিন অকস্মাৎ জেল-প্রাঙ্গণের একধারে অনেক দিনের পুরনো একটি টেনিস বল আবিষ্কার করিয়া ফেলিলেন আমাদেরই একজন বন্ধু। আর কি রক্ষা আছে! সেই টেনিস বল লইয়া ছোট্ট ঐ জেল-প্রাঙ্গণের মধ্যেই ফুটবল খেলা সুরু হইয়া গেল। আমাদের সঙ্গে সে জেলে ছিলেন তখনকার কমিউনিষ্ট নেতা মিঃ বাটলিওয়ালা। খেলাধূলা, হৈ-হল্লা ইত্যাদি ব্যাপারে ছিল ও'র পরম উৎসাহ। আমাদের খেলিতে দেখিয়া তিনিও পাজামা গুটাইয়া মাঠে নামিয়া গেলেন। মিঃ বাটলিওয়ালার তখন পূর্ণ যৌবন, তাহা ছাড়া শক্তিমান পুরুষ বলিয়া খ্যাতি তাঁহার যথেষ্ট ছিল। কিন্তু, তাহা হইলে কি হইবে, খেলা তিনি মোটেই জানিতেন না, তাঁহার খেলার লক্ষ্য ছিল বল নহে, লোক। কিছুক্ষণের মধ্যেই তাঁহার খেলার চোটে মাঠের লোক অর্দ্ধেকই সরিয়া পড়িল, কিন্তু, তবু তাঁর উৎসাহের অন্ত নাই, খেলিতে খেলিতে অকস্মাৎ একটী সংঘর্ষ তাঁহার হইল রসময় বাবুর সঙ্গে। দেউলীর সে রসময় বাবু আর নাই, রসময় বাবু তখন বৃদ্ধ হইয়াছেন। এ দশ বছরে তাঁহার প্রায় সব কয়টি চুলই সাদা হইয়া গিয়াছে। বাটলীওয়ালা ভাবিলেন এক ধাক্কা দিলেই হয়তো এ বৃদ্ধ ধরাশায়ী হইবে।

এই ভাবিয়া বাটলীওয়ালা আসিলেন রসময় বাবুর কাছে। তিনি তখন প্রতিপক্ষের একজনের সঙ্গে বল কাড়াকাড়ি লইয়া ব্যস্ত, অকস্মাৎ বাটলিওয়ালা তাঁহার সমস্ত শক্তি লইয়া

আসিয়া পড়িলেন রসময় বাবুর উপর। কিন্তু, একি! রসময় বাবু এক পা-ও নড়িলেন না, মৃদু হাসিয়া একবার পেছনে চাহিলেন মাত্র, তাহার পরই বল লইয়া আবার ছুটিতে সুরু করিলেন। এদিকে বাটলিওয়ালার অবস্থা তো কাহিল। তিনি সেই যে 'রোসময় দা' বলিয়া বারান্দার উপরে উঠিয়া পড়িলেন আর নামিলেন না। শুধু সেই দিনই নয়, ফুটবল খেলার সখ তাঁহার চিরদিনের জন্যই মিটিয়া গেল। কোমর 'ম্যাসেজ' করাইবার জন্য প্রতিদিনই তাঁহাকে একবার করিয়া হাসপাতালে যাইতে হইত। অমাবস্যা-পূর্ণিমার কথাটা অবশ্য তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করিতে সাহস করি নাই, কারণ, এতবড় এক জন কমিউনিষ্ট নেতা, এসব *Superstition* মানেন কিনা কে জানে?

বাটলিওয়ালা সাহেব আগে রসময় বাবুকে 'রোসময় বাবু' বলিয়াই সম্বোধন করিতেন। কিছুদিন যাবৎ সকলেই লক্ষ্য করিতেছিলেন যে, তিনি আর 'রোসময় বাবু' ডাকেন না, ডাকেন 'রোসময়দা'! কেহ কেহ বলিয়াছেন, সেই যে খেলার মাঠে সংঘর্ষের সময় বাটলিওয়ালা সাহেব 'রোসময় দা' বলিয়া বারান্দায় উঠিয়া পড়িয়াছিলেন, সেই হইতে তিনি ঐ ডাকই বহাল রাখিয়া আসিতেছেন। একথা সত্য কিনা এবং ঠিক সেই দিন হইতেই সম্বোধন-বাণীটা পরিবর্তিত হইয়াছিল কিনা বলিতে পারি না, কিন্তু, ঐ বৃদ্ধের কোমরের ধাক্কা যাঁহারা খাইয়াছেন তাঁহারা একবাক্যে স্বীকার করিয়াছেন যে, রসময় বাবুর কোমরের মারে সব কিছুই সম্ভব!

রসময় বাবুর কথা বলিতে বলিতে বাটলিওয়ালার কথা আসিয়া পড়িল, তা পড়ুক, তবু তাহার সম্বন্ধে আরো দু'-একটা কথা না বলিয়া এ প্রসঙ্গ শেষ করা যায় না।

এই বাটলিওয়ালা মানুষটি ছিলেন খুব মিশুক। অল্প কয়েক দিনের মধ্যেই তাঁহার সঙ্গে আমাদের খাতির জমিয়া গেল, খেলার মাঠ হইতে আরম্ভ করিয়া গানের আসর কোনটাতেই তাঁহাকে ছাড়া আমাদের চলিত না। কিন্তু, তবু ওঁর সঙ্গে কথা বলিতে আমাদের কেমন যেন একটু বাধ বাধ ঠেকিত। তিনি ছিলেন বোম্বাই প্রদেশের অধিবাসী। তাই, কথাবার্তা তাঁহার সঙ্গে বলিতে হইত ইংরেজীতে। ইংরেজী কথা খাইতে-বসিতে সব সময়ই কি আর বলা যায়? আমরা তো ইংরেজী কথা বলিতাম কেবল সুপারিণ্টেণ্ডেণ্টকে অথবা কোন অফিসারকে গালিগালাজ করিবার সময়। ইংরেজীতে অথবা হিন্দিতে গালি দিতে যতটা আরাম পাওয়া যাইত, বাংলায় ততটা পাওয়া যাইত না। কিন্তু বাটলিওয়ালার সঙ্গে তো আর রাগের কথা নয়, হাসি-গল্পের কথা। এত ইংরাজী কথা কোথায় পাওয়া যাইবে? অবশ্য শ্রীযুক্ত চক্র-বর্ত্তীর মত হইলে আর কোন চিন্তা ছিল না।

তিনি নাকি ইংরাজী ভাষাকে এত সহজ করিয়া আনিয়াছিলেন যে, সাহেব-সুবা কাহাকে পরোয়াই করিতেন না। তবে একটা কথা তিনি বলিতেন, 'আমি যখন সুপারের

সঙ্গে ইংরেজী বলব আপনারা কেউ উপস্থিত থাকবেন না, দেখবেন কেমন ইংরেজীর তুবড়ি ছুটাই।'

একদিন নাকি চক্রবর্ত্তী মহাশয়ের একটি আলমারি দেখিয়া কোন জেলের জেল-সুপার একেবারে অবাক্ হইয়া গিয়াছিলেন আলমারিটি আগাগোড়া কাঠের, কিন্তু, দেখিলে বুঝিবার সাধ্য ছিলনা যে, উহা কাঠের। বিস্ময়াবিষ্ট চিত্তে সাহেব—চক্রবর্ত্তী মহাশয়কে জিজ্ঞাসা করিলেন, '*A marvellous thing! But what is it made of, Babu?*' চক্রবর্ত্তী মহাশয় একবার একটু ঢোক গিলিলেন, একবার চাহিয়া দেখিলেন বন্ধুবান্ধব কেহ ধারেকাছে আছে কিনা, তাহার পরেই ফস করিয়া বলিয়া বসিলেন, '*Always wood, Sir, always wood*।'

চক্রবর্ত্তী মহাশয়ের ইংরাজী সাহেব অনেক শুনিয়াছিলেন, অর্থ আন্দাজ করিয়া লইতে আর তাঁহার দেরি হয় নাই। কিন্তু, বাটলিওয়ালার ক্ষেত্রে তো আর '*Always wood*' চলিবে না, ওখানে চাই '*Always English!*' মালুবাবু তো একদিন চটিয়াই গেলেন, ওর সঙ্গেই বাটলিওয়ালার খাতির ছিল সবচেয়ে বেশি। সেইজন্য মালুবাবুর আবার বিপদও ছিল বেশি। ইংরেজী কথা আর কত বলা চলে? একদিন দেখিলাম হলঘরের বারান্দায় একপাশ দিয়া মালুবাবু হন্তদন্ত হইয়া ছুটিয়া চলিয়াছেন, সামনে দাঁড়াইয়া তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করিতে যাইব, কোথায় যাইতেছেন, কিন্তু, তাহার কি আর উপায় আছে?

'সরুন, সরুন, শীগ্‌গির সরুন, ঐ আবার বাটলিওয়ালা এসে পড়ল'—বলিয়া হন-হন করিয়া তিনি ছুটিয়া চলিয়া গেলেন। পেছনে পেছনে তাঁহার ঘরে গিয়া হাজির হইলাম, মালুবাবু বলিলেন, 'বাঁচা গেল মশাই! বাটলিওয়ালা ধরে ফেললেই আবার এক ঘণ্টা *Translation* করিয়ে ছেড়ে দিত, *Translation* করতে করতে প্রাণ ওষ্ঠাগত হোয়ে গেল, মশাই! কাহাতক আর পারা যায়?'

বলিলাম,—'সেকি ব্যাপার!'

—'তা নয়, তো কি!' মালুবাবু জবাব দিলেন, 'আমাদের তো ইংরেজী বলা নয়, শুধু *Translation* করে যাওয়া!'।

উনত্রিশ

রসময় বাবুর খেলার কথা বলিলাম। কিন্তু কতটুকু আর বলিতে পারিয়াছি। আর শুধু তাঁহার কথাই বা কেন? এমনি অনেক প্রথিতনামা খেলোয়াড় দেউলীর মাঠে নামিয়াছেন যাঁহাদের কীর্ত্তিতে দেউলীর খেলার মাঠ আজিও অক্ষয় হইয়া আছে। এবার আর একজন খেলোয়াড়ের কথা বলিতেছি। তাঁহাকে আপনারা (অবশ্য খেলোয়াড় হিসাবে নয়) চেনেন না এমন কথা বলিতে পারি না। তিনি 'মিলিটারী টাইপের' লোক! তাই তার ফুটবল খেলাটা-ও মিলিটারী ধরণের। হিজলী জেল হইতে দেউলীতে পদার্পণ করিয়াই তিনি দেখেন

যে, ফুটবল খেলা জোর চলিতেছে! দেউলী আসিয়াই তিনি প্রথমে এক জোড়া 'ফুটবল বুট' 'রিকিউজিসন' করিয়া পাঠাইলেন। দেউলীতে তখন-ও ফুটবল বুটের প্রচলন হয় নাই, তাই, ধন্য-ধন্য রব পড়িয়া গেল। আমরা সকলেই ভাবিলাম, এতদিনে একজন খেলোয়াড় আসিয়াছেন বটে!

শ্রীযুক্ত জ্যোতিশ্চন্দ্র জোয়ারদার ফুটবল খেলিতেছেন কথাটা আজ হয়তো অসম্ভব মনে হইতে পারে, কিন্তু, সেদিন সত্যই তাহা সম্ভব ছিল, কারণ, হারাণের কথায় 'জেলখানা যে কারাগার' সেখানে সবই সম্ভব। খেলার আগে জ্যোতিষ বাবুর একটু পরিচয় আবশ্যক। তাঁহার সঙ্গে যাঁহাদের জানাশুনা আছে তাঁহারা সকলেই জানেন যে, উনি একটু *serious type* এর লোক; তাই খাওয়া-দাওয়া হইতে সুরু করিয়া খেলাধূলা পর্য্যন্ত ওঁর সব কাজেই একটা *seriousness*-এর স্পর্শ থাকিত। হিজলী হইতে দেউলী আসিবার দিনই তাঁহার সঙ্গে অনেক কথা হইল। কথা তাঁহার সঙ্গে সুরু হইলে আর তাহার শেষ থাকে না তাই এমন কোন বিষয় নাই যাহা সেদিন আলোচিত হইল না।

কথাবার্ত্তায় একটা জিনিষ লক্ষ্য করিলাম যে, তিনি যাহা বলেন তাহার পনের আনাই বলেন ইংরেজীতে অথচ একথা তাঁহার খেয়ালই থাকিত না। তিনি ভাবিতেন যে, তিনি পরিষ্কার বাংলা-ই বলিয়া যাইতেছেন। একদিন কথাটা তাঁহাকে খোলাখুলি বলিয়াই ফেলিলাম। বলিলাম, কি

ব্যাপার ! কথাবার্ত্তায়ই হউক আর বক্তৃতাতেই হউক আপনি যে হরদম ইংরেজী বলিয়া যান। এ কথার তখনই ঘোর প্রতিবাদ করিয়া তিনি বলিলেন, '*No no, that is not correct*'-বুঝিতে আর কাহারও বাকি রহিল না যে, সত্যই তিনি বাংলা বলেন, ইংরেজী শব্দ মোটে ব্যবহারই করেন না ! কিন্তু, সে কথা পরে হইবে। এখন যাহা বলিতেছিলাম তাহাই বলি, ওঁর খেলার কথাই সুরু করা যাক্।

হিজলী জেলে থাকিতে জ্যোতিষবাবুর একটি 'ফুটবল টিম' ছিল, নাম তার 'মারাক্কু' টিম্। 'মারাক্কু' শব্দের ধাতুগত অর্থ কি তাহা নিশ্চয়ই গবেষণার বিষয়, কিন্তু, 'মারাক্কু' টিমের খেলা যাহারা দেখিয়াছেন, তাঁহাদের এ শব্দটির অর্থ হৃদয়ঙ্গম করিতে বেগ পাইতে হয় নাই।

এই 'মারাক্কু'-র গোড়াপত্তন দেউলীতেও হইয়া গেল এবং তাহারই উদ্বোধনী খেলায় একটি নির্ব্বাচিত দলের বিরুদ্ধে জ্যোতিষবাবু তাঁহার 'মারাক্কু' দল লইয়া খেলিতে নামিলেন। উঃ সেকি খেলা ! যাঁহারা সে দলের বিরুদ্ধে খেলিতে নামিয়া ছিলেন তাঁহাদের কি দশা হইয়াছিল জানিনা, যাহারা দর্শক হিসাবে সেদিন খেলা দেখিতে গিয়াছিলেন, খেলা শেষ হওয়ার পরেও অনেকক্ষণ পর্য্যন্ত তাঁহাদের '*heart palpitation*' থামে নাই, একথা বেশ মনে আছে।

হ্যাফপ্যাণ্ট্, বুট্, ও ইউনিফর্ম পড়িয়া জ্যোতিষবাবু খেলিতে নামিয়াছেন। তাঁহার কাছে ভিড়িবে সাধ্য কার !

বল, মানুষ, মাটি এক সঙ্গেই তিনি উড়াইয়া ফেলিতেছেন। তবে, একথা ঠিক্ই, একটা বৈশিষ্ট্য তাঁহার খেলার মধ্যে ছিল। তাহা হইতেছে *impartiality* বা পক্ষপাতহীনতা। তাঁহার সম্মুখে যে পড়িবে, সে শত্রুই হউক আর মিত্রই হউক, তাহার আর রক্ষা ছিল না। একটি *incident* এর কথা বলিতেছি। জ্যোতিষবাবু খেলিতেছেন, *left-half*। হঠাৎ দেখা গেল তাঁহার ডানদিক বরাবর তিনি ছুটিয়া চলিয়াছেন। বেশ কিছু দূরে তাহারই দলের *right-half* ভদ্রলোক এক বলের জন্য ছুটিতেছেন, জ্যোতিষ বাবু হুড়মুড় করিয়া তাঁহাকে চার্জ্জ করিয়া বসিলেন। সে-বেচারা জ্যোতিষবাবুকে দেখিয়া আগেই চীৎকার করিতেছিলেন, '*Leave it, Leave it,*' কিন্তু, তিনি ওসব ওজর আপত্তি শুনিতে যাইবেন কেন, তাহাকে একেবারে ভূতলশায়ী করিয়া ফেলিলেন। সে-বেচারী পরে উঠিল বটে, কিন্তু, খেলিবার জন্য নয়, কোন প্রকারে খোঁড়াইতে খোঁড়াইতে মাঠ হইতে ক্যাম্পে ফিরিবার জন্য।

এই প্রসঙ্গে আরো একজনের খেলার কথা না বলিলে, খেলার মাঠের কাহিনীটি অসম্পূর্ণই থাকিয়া যাইবে। তিনি শ্রীযুক্ত পঞ্চানন চক্রবর্ত্তী। পঞ্চানন বাবু খেলিতে পারিতেন না বলিলে ভুল বলা হইবে। খেলিতে তিনি পারিতেন, কিন্তু তাঁহার খেলার যে-দিকটা সকলের দৃষ্টি আকর্ষণ করিত তাহা তাঁহার বল লইয়া অগ্রগতির কৌশল। অন্য খেলোয়াড়রা যেমন বল পাইলেই অগ্রগতির জন্য ফাঁকা

জায়গা খুঁজিতেন, পঞ্চাননবাবু তাহা খুঁজিতেন না, তিনি খুঁজিতেন লোকের ভিড়! যত ভিড় তত তাঁর উৎসাহ। ফাঁক কিংবা ফাঁকি কোনদিনই তাঁহার ধাতে সহিত না বলিয়াই হয়তো প্রতিপক্ষের লোককে ফাঁকি দিতে তাঁহার বিবেকে বাধিত। তিনি চাহিতেন প্রতিপক্ষের লোককে বলপ্রয়োগে পরাজিত করিয়া বিরুদ্ধ দলের এলাকায় প্রবেশ করিতে। তাই পঞ্চাননবাবু একবার ছুটিতে সুরু করিলে তাঁহাকে থামানো এক কঠিন ব্যাপার। কারণ কেহই তাঁহার কাছে আগাইতে ভরসা পাইত না, সকলেই নিজে *safe distance*-এ থাকিয়া অন্যকে কেবলই বলিত, চার্জ্জ! চার্জ্জ! এক ভদ্রলোক তো একদিন অসাধ্য সাধন করিতে গিয়া অর্থাৎ পঞ্চাননবাবুকে চার্জ্জ করিতে গিয়া সেই যে গোঁ-গোঁ করিয়া মাটিতে পড়িলেন দুপুর রাত্রি পর্য্যন্ত আর তাঁহার সংজ্ঞাই ফিরিয়া আসিল না। শুধু খেলার মাঠেই নয়, বহু রাত্রিতে বহু খেলোয়াড়ই স্বপ্নের ঘোরে পঞ্চাননবাবুর মূর্ত্তি দেখিয়া '*Charge*! *Charge*!' বলিয়া চিৎকার করিয়া উঠিয়াছেন।

ইহার পরেই লক্ষ্যণীয় ছিল সন্তোষদার খেলা। সন্তোষদা ফুটবল মাঠে বড় একটা নামিতেন না, কিন্তু যেদিন নামিতেন সেদিন সকলকেই বুঝাইয়া ছাড়িয়া দিতেন, খেলার মাঠে কে নামিয়াছে। ঐ বিরাট দেহ লইয়া সন্তোষদা যখন একবার দৌড় সুরু করিতেন তখন ইচ্ছা করিলেও সহজে থামিতে পারিতেন না, আর একবার যখন থামিতেন তখন ইচ্ছা

করিলেও সময় মত *Stand* লইতে পারিতেন না। কিন্তু তবু 'প্রাচীনকালে একদিন' ফুটবল খেলিয়াছেন এই ভরসায় শুধু বিশেষ কোন স্থানের নহে, সমস্ত মাঠের দায়িত্বই সন্তোষদা লইয়া বসিতেন।

তিনি যেদিন খেলিতে নামিতেন সেদিন জায়গা বদল করিতে-করিতে ফরওয়ার্ড লাইন হইতে একেবারে গোল পর্য্যন্ত আসিয়া তবে থামিতেন। খেলার মাঠে নামিয়া তিনি ভাবিলেন, তিনি ফরওয়ার্ড না খেলায় হয়-তো তাঁহার দল গোল করিতে পারিতেছে না তাই ফরওয়ার্ড খেলা তিনি সুরু করিলেন। তাহার পরে আবার দেখিলেন যে, রক্ষণভাগের উপর ভীষণ চাপ পড়িয়াছে, সন্তোষদা ভাবিলেন, পড়িবেই তো তিনি যে সেদিকে নাই। এই ভাবে সমস্ত মাঠটির দায়িত্ব একা তিনি স্কন্ধে বহন করিতেন!

একদিনের একটি ঘটনার কথা আজও মনে আছে। সন্তোষদার দল ভালই খেলিতেছিল বটে, কিন্তু, অকস্মাৎ তাহার দল একটি গোল খাইয়া বসিল। সন্তোষদার দায়িত্ব আরো বাড়িয়া গেল। গোলটি শোধ না করিলে চলিবে কেন! তিনি শ্রীমন্ত ভট্টাচার্য্যকে ব্যাক খেলিতে আদেশ দিয়া নিজে আগাইয়া গেলেন গোল পরিশোধ করিবার জন্য। শ্রীমন্ত তরুণ খেলোয়াড়। বয়স ১৭।১৮ বৎসরের বেশি হইবে না। ভাল খেলিতে না পারিলেও সন্তোষদার দলের মধ্যে ও রকম খেলোয়াড় আর একটি-ও ছিল না। খেলা জোর চলিতেছে,

শ্রীমন্ত ব্যাকে ভালই খেলিতেছে। সন্তোষদা কেবলই তাহাকে উৎসাহ দিতেছেন, আর একটু এমনি খেলিতে পারিলেই গোলটি পরিশোধ করিয়া তিনি স্বস্থানে ফিরিয়া আসিবেন। কিন্তু হিতে বিপরীত হইল। গোল তো শোধ করা হইল না, বরং সন্তোষদার দল ইতিমধ্যে আর একটি গোল খাইয়া বসিল, এবং সে-গোলটিও হইল শ্রীমন্ত ভট্টাচার্য্যের একটা *miskick* এর ফলে।

বেচারার বরাৎ নেহাৎ খারাপ তাহা না হইলে এতক্ষণ ভাল খেলিবার পরে এরকম দুর্দ্দৈব তাহার অদৃষ্টে লেখা থাকিবে কেন! গোলটি হইবামাত্র সন্তোষদা একেবারে দিশাহারা হইয়া গেলেন। তিনি দেখিলেন শ্রীমন্তের জন্যই গোল হইয়াছে তাই শ্রীমন্তের কাছে আসিয়া ওকে এক—করিলেন। শ্রীমন্ত বেচারা তো একেবারে হতভম্ব হইয়া গেল। খেলায় তো কত ভাল-ভাল খেলোয়াড়দেরই *miss* হইয়া থাকে, তার জন্য গালমন্দ পর্য্যন্ত সহ্য করা যায় কিন্তু, বলা নহে, কওয়া নহে, এত লোকজনের মধ্যে একেবারে মাঠের মধ্যেই—! সন্তোষদার কিন্তু সেদিকে লক্ষ্য ছিল না। তিনি ভাবিয়াছিলেন শ্রীমন্তকে শাসন করিব, ইহাতে আর এত বিচার-বিবেচনার কি আছে!

খেলার মাঠে সন্তোষদার আর একটি ঘটনাও একেবারে অক্ষয় হইয়া আছে। দেউলী মাঠে তাহা সন্তোষদার বিরাট পতন, বা '*Santosh da's great fall*' বলিয়া অভিহিত

হইত। যে তাহা না দেখিয়াছে তাহাকে বুঝান শক্ত, কি অদ্ভুত সে পতন, কি বিস্ময়কর, কি অভূতপূর্ব্ব! বড় বড় সাম্রাজ্যের উত্থান-পতনের ইতিহাস আপনারা পাঠ করিয়াছেন, বড় বড় ব্যক্তির উত্থান-পতন আপনারা লক্ষ্য করিয়াছেন, পাহাড় পর্ব্বত হইতে বিরাট প্রস্তরখণ্ড খসিয়া পড়িতেও হয় তো আপনারা দেখিয়াছেন কিন্তু, সন্তোষদার সে পতন সে শুধু সন্তোষদার পক্ষেই সম্ভব। ঘটনাটি বলি। খেলার মাঠে সন্তোষদা অনেক বারই 'ব্যালেন্স' হারাইয়া ফেলিতেন, কিই-বা করিবেন, অত বড় শরীর তো!

তাই দু'-চারবার শুকনা মাঠেও ভূপতিত হওয়া ছিল সন্তোষদার পক্ষে নেহাৎ সাধারণ ঘটনা। কিন্তু, সেদিন ইহার সামান্য কিছু ব্যতিক্রম হইল।

সন্তোষদা সেদিন এত সাবধানে খেলিতেছিলেন যে, তাঁহার খেলা দেখিয়া সকলেরই ধারণা জন্মিয়াছিল যে, তিনি প্রতিজ্ঞা করিয়া নামিয়াছিলেন যে, সেদিন তিনি কিছুতেই আছাড় খাইবেন না। কিন্তু, মানুষ ভাবে এক, হয় আর। খেলিতে খেলিতে একবার তিনি ব্যালেন্স হারাইয়া নিজেকে রক্ষা করিবার জন্য প্রতিপক্ষের একটি খেলোয়াড়কে ধরিয়া টাল সামলাইতে চাহিলেন। কিন্তু, একে তো সে বিরুদ্ধ দলের, তাহার উপর সে তখন খেলায় ব্যস্ত, সে সন্তোষদার জন্য অপেক্ষা করিতে যাইবে কেন? নিশ্চিত অবলম্বন যখন সরিয়া গেল তখন সন্তোষদা যেন অকূলে পড়িলেন। তিনি তখন দুই

হাত শূন্যে মেলিয়া সম্মুখের দিকে টলিতে টলিতে অগ্রসর হইতে লাগিলেন, সে এক দৃশ্য! যেমন ভীষণ, তেমনি করুণ! রেফারি বাঁশি থামাইল, খেলোয়াড়রা থমাইল খেলা—সন্তোষদা তখনও পড়িতেছেন। লাইনস্‌ম্যানদ্বয় সন্তোষদার দিকে ছুটিয়া গেলেন, সন্তোষদা তখনও পড়িতেছেন! দর্শকের দল দাঁড়াইয়া ছিলেন, তাঁহার মাথায় হাত দিয়া বসিয়া পড়িলেন, সন্তোষদা তখনও পড়িতেছেন! অবশেষে সত্য সত্যই সন্তোষদা পড়িলেন—তাঁহার সঙ্কল্প ব্যর্থ হইল।

অবশ্য ইহাতে সন্তোষদার যে-ক্ষতিই হউক না কেন, হাঁফ ছাড়িয়া সবাই বাঁচিল, কারণ, এ পতন অপেক্ষা পতন রোধের চেষ্টা আরো ভয়াবহ! রবীন্দ্রনাথের 'কাদম্বিনী' একদিন মরিয়া প্রমাণ করিয়াছিল ছিল যে সে মরে নাই, আর আজ দেউলীর সন্তোষদা পড়িয়া প্রমাণ করিলেন যে, তিনি পড়েন নাই।

ত্রিশ

দেউলী খেলার মাঠে অনেক '*Star player*' এর বর্ণনা দিয়াছি। আরো দু'-একজনের বর্ণনা যদি না দেই তাহা হইলে তাহাদের প্রতি সত্যই অবিচার করা হইবে। ফণীবাবুর কথা আগে একবার বলিয়াছি, কিন্তু তাহাতে খেলার মাঠের ফণীবাবুর পরিচয় সম্পূর্ণ হইয়া ওঠে নাই।

কোহিনূর বাবুর নেতৃত্বে দেউলীতে এক ধরণের ফুটবল খেলার প্রচলন হইয়াছিল, তাহার নাম: ১৫ মিনিটের খেলা। সাধারণতঃ কোন 'ম্যাচ' কিংবা নিয়মিত কোন খেলা শেষ হইলে সুরু হইত এই খেলা। খেলায় যাহাদের

উৎসাহ অত্যধিক অথচ জ্ঞান সামান্যই তাঁহারাই ছিলেন এই পনের মিনিটের খেলার প্রধান খেলোয়াড়। ভাল-ভাল খেলোয়াড়ও দু-একজন যে নামিতেন না তাহা নয়, কিন্তু তাঁহারা নামিতেন হৈ-চৈ করিবার জন্য, খেলিবার জন্য নয়। এই দলের নেতা শ্রীযুক্ত কোহিনূর ঘোষ কিন্তু থাকিতেন মাঠের বাহিরে-বাহিরে। বাহির হইতেই তিনি যেমন-যেমন উপদেশ দিয়া যাইতেন তাঁহার শিষ্য-সামন্তেরা ঠিক্ সেই-সেই ভাবে সে উপদেশ পালন করিতে যথাসাধ্য চেষ্টা করিতেন এবং তাঁহাদের সেই আপ্রাণ চেষ্টার ফলে এ-খেলাটি হইত পরম উপভোগ্য।

১৫ মিনিটের সেই খেলায় ফণীবাবুর একটি ঘটনার কথা উল্লেখ করিতেছি তাহা হইতেই এই খেলাটি এবং ইহার নেতা শ্রীযুক্ত কোহিনূর ঘোষের সম্যক পরিচয় পাওয়া যাইবে। সেদিনের খেলায় যোগেশবাবুর একান্ত দুর্ভাগ্য যে, তিনিও খেলিতে নামিয়াছেন। যোগেশ বাবু দেউলী জেলের একজন সুবিখ্যাত খেলোয়াড়, দেউলীতে সুধীরবাবুর পরেই যোগেশবাবু স্থান। তিনি যখন ১৫ মিনিটের খেলায় খেলিতে নামিলেন, খেলোয়াড়রা তখন প্রমাদ গণিল। ইহাকে উহাকে ফাঁক দিয়া অগ্রসর হইতেছেন, কিছুতেই কাহারও ধরা ছোঁয়ার মধ্যে আসিতেছেন না। একবার হইয়াছে কি, মাঠের মধ্যভাগ হইতে বল লইয়া তিনি প্রতিপক্ষের গোলের দিকে অগ্রসর হইতেছেন। ফণীবাবু ছিলেন যোগেশবাবুর বিরুদ্ধ পক্ষ,

তিনি নিরুপায় হইয়া একবার কোহিনূরবাবুর দিকে চাহিলেন, ভাবটা এই যে, গোল তো হয়-হয়, কোহিনূরদা, এবার করি কি? ফণীবাবুর নীরব আবেদনের মর্ম্ম বুঝিতে কোহিনূর বাবুর বিলম্ব হইল না, তিনি হুকুম করিয়া বসিলেন, '*Charge!*' আর যায় কোথায়!

যোগেশবাবু বল লইয়া ফণীবাবুকে পাশ কাটাইতে যাইবেন অমনি ফণীবাবুর কাছে আসিল কোহিনূরবাবুর বজ্রকণ্ঠ, '*charge!*' ফণীবাবু মাথাটি সম্মুখ দিকে আগাইয়া দিয়া, হাত দুইটি শূন্যে নিক্ষেপ করিয়া *start* লইয়া ফেলিলেন; যোগেশ বাবুকে ধরিতে হইবে তো! শুধু *start* নেওয়াই নয়, ঘাড় বাঁকা করিয়া একেবারে *charge*-ও লইয়া ফেলিলেন। কিন্তু, ফণীবাবুর অত বড় শরীর, আদেশ পাইলে কি হইবে, আদেশ তামিল করিতে একটু সময় লাগে! তাই ফণীবাবুর '*start*' লওয়া হইতে সুরু করিয়া '*charge*' লওয়া এই সময়টুকুর মধ্যে যোগেশবাবু গোল দিয়া ফেলিয়াছেন। গোল দিয়া তিনি ফিরিয়া আসিতেছেন এমন সময় ফণীবাবুর সঙ্গে লাগিল তাঁহার প্রচণ্ড সংঘর্ষ, যোগেশবাবু ধরাশায়ী হইলেন। খেলার মাঠে মেজাজ খারাপ করিতে যোগেশবাবুকে বড় একটা কেউ দেখে নাই, কিন্তু সেদিন যোগেশবাবুর মত লোকও চটিয়া লাল হইয়া গেলেন, বলিলেন, 'একি ব্যাপার ফণীবাবু?'

ফণীবাবু ধীরে-ধীরে ভূমি হইতে উঠিলেন, ধীর সংযত কণ্ঠে যোগেশবাবুকে বলিলেন, 'যোগেশবাবু, আপনি না পাকা

খেলোয়াড়! আপনি তো জানেন যে, *start* লওয়াও যেমন আমার ইচ্ছাধীন নয়, একবার *start* নিলে থামাও আমার ইচ্ছাধীন নয়, তবে জেনে শুনেও, আমি *start* নিয়েছি দেখেও আমার গতিপথের সামনে আপনি কেন পড়লেন? কেন আপনি সরে গেলেন না? আমার অপরাধ, আমি আপনাকে *charge* করেছি তবে একটু দেরিতে, আর আপনার অপরাধ আমি *charge* করবার পূর্ব্বেই আপনি গোল দিয়ে ফেলেছেন এবং আমাকে *sure-charged* দেখেও আপনি আমার পথ ছাড়েন নি। অপরাধের ওজন কার বেশি, যোগেশবাবু?"

যোগেশবাবু এবার আর হাসি রাখিতে পারিলেন না, তুই হাতে ফণীবাবুকে জড়াইয়া ধরিলেন। সেদিনের মত ১৫ মিনিটের খেলা শেষ হইয়া গেল। খেলার শেষে আর যেই যা বলুক না কেন, কোহিনূরবাবু আসিয়া ফণীবাবুর সঙ্গে *hand-shake* করিলেন, বলিলেন, 'সাবাস ফণী, সবই ঠিক হয়েছিল তবে *timing*-এ একটু গোলমাল হোয়ে গেছে, *Practice* করলে এই *timing*-টুকুও ঠিক হোয়ে যাবে।' এমনি ভাবে সেদিনের খেলা শেষ হইয়া গেল।

এইতো গেল দেউলীর *Star Player*-দের কয়েকজনের পরিচয়, সকলের পরিচয় দেওয়া সম্ভবপর নহে বলিয়া এইখানেই এ বিবরণী শেষ করিতে হইল। ইহার পরে আরো তু'-চারজনের কথা বলিতে হয় যাহারা দেউলীর মানদণ্ডে ঠিক *Star*-এর

পর্য্যায়ে পড়েন না। শ্রীযুক্ত সুধীর আইচ ও শ্রীযোগেশ চক্রবর্ত্তীর কথা ইতিপূর্ব্বে বলিয়াছি। ইহার পরেই নাম করিতে হয় শ্রীঅমূল্য মুখার্জ্জী ও শ্রীঅমলেন্দু দাসগুপ্তের। অমূল্যবাবু ছিলেন দেউলীর প্রথম বৎসরের নাম করা 'ব্যাক'। আর অমলেন্দু-বাবু ছিলেন প্রথম বৎসরের একজন নামজাদা 'ফরওয়ার্ড'। ফরওয়ার্ড খেলায় যে গুণাবলীর প্রয়োজন হয় তাহার সবগুলিই অমলবাবুর দখলে ছিল। বল আয়ত্তে আনা, দ্রুতগতিতে অগ্রসর হওয়া এবং সুন্দরভাবে বল বিতরণ এ সব গুণই ছিল, কিন্তু কোথায় যেন তাঁহার একটু গরমিল ছিল যাহার ফলে এ সমস্তের যোগফল প্রায়ই শূন্যতায় মিলাইয়া যাইত! সুধীরবাবু অমলবাবুর খেলা সম্পর্কে একদিন মন্তব্য করিয়াছিলেন যে, ভদ্রলোকের সবই আছে অথচ কিছুই নাই। সাধারণ যোগ অঙ্কের খাতায় যাহা ১+১+১=৩ অমলবাবুর খেলার খাতায় তাহাই নূতন রূপে দেখা দিয়া যেন হইয়া যাইত ১+১+১=০ ইহা সত্যই অমলবাবুর একটি বৈশিষ্ট্য। তাঁহার নির্ব্বিকার নির্ব্বিকল্প খেলার জন্য দেউলীর দার্শনিক মহল তাঁহাকে একটি দার্শনিক খেতাবে অভিহিত করিয়াছিলেন। অমলবাবুকে তাঁহারা নাম দিয়াছিলেন, 'সাংখ্যের পুরুষ।'

গোল দেওয়ার ব্যাপারে অমলবাবুর লক্ষ্য ছিল অব্যর্থ এই হিসাবে যে, ঠিক্ কি করিয়া গোলপোষ্ট দুইটির বাহির দিয়া মারিতে হয় তাহা তিনি যেমন জানিতেন অপর কেহ তেমন জানিতেন তো না-ই, জানা সম্ভব-ও ছিল না।

বীরেনদা তো একদিন বলিয়াই বসিলেন যে, 'অমল তুমি আজ সত্যই '*hat trick*' করিয়াছ। লোকে করে গোল-এর '*hat trick*,' তুমি করিয়াছ '*no goal*'-এর। তবে *hat trick* যে করিয়াছ তাহা ঠিক!'

শুধু তাই নয়, বীরেন-দা আর একদিন অমল বাবুকে ডাকিয়া বলিলেন, 'অমল আজ তোমার খেলা আছে শুনিলাম, যাহাতে সত্যই আজ তুমি একাধিক গোল দিতে পার তাহার ব্যবস্থা করিয়া রাখিয়াছি।' জিজ্ঞাসু নয়নে অমলবাবু চাহিলেন বীরেনদার মুখের দিকে।

বীরেনদা বলিলেন, 'হ্যাঁ, সত্যি কথাই বলছি, শোন, কি বন্দোবস্ত করেছি। তুমি যেদিকে খেলবে তার উল্টো দিকের গোল-পোষ্টটা মাটিতে পোতা থাকবে না। দু'জন লোক দাঁড়িয়ে থাকবে ঐ গোল পোষ্টটা ঘাড়ে করে, তারপর তুমি গোলে বল মারা মাত্র তারা দু'জন দৌড়ে গিয়ে সেই বলের বরাবর দাঁড়াবে এবং সেই খানে গোলপোষ্টটা রাখবে, কার সাধ্য তোমার সে গোল *disallow* করে, *Scorer* বানিয়ে এবার তোমাকে ছাড়বই আমি।'

বীরেনদা এ কথাগুলি একান্ত রসিকতার ছলে বলিলেও সেদিন হয় তো অমলবাবুর কানের ভিতর দিয়া তাহা মরমে পশিল, গভীর আত্মগ্লানিতে বেদনা-পাণ্ডুর হইয়া উঠিল তাঁহার মুখমণ্ডল। তিনি কিছু বলিলেন না, ধীরে-ধীরে খেলার মাঠের দিকে চলিয়া গেলেন এবং সেদিন সত্যই একটি

অঘটন ঘটিল, খেলার মাঠে নামিয়াই অমলবাবু একটি গোল দিয়া ফেলিলেন। বীরেনদাকে সেদিন কষ্ট করিতে হয় নাই; গোলপোষ্ট মাটিতেই যথাস্থানে ছিল।

এই প্রসঙ্গে আরো দুইজন খেলোয়াড়ের কথা মনে পড়িতেছে, তাঁহারা হইতেছেন শ্রীযুক্ত মহেন্দ্র রায় ও শ্রীযুক্ত অন্নদা মজুমদার। মহেন্দ্রবাবুকে সবাই আমরা 'রায় মশাই' বলিয়া ডাকিতাম আর অন্নদাবাবুর 'ক্যাপ্টেন' নাম তো সর্ব্বজন বিদিত। দুইজনেই ব্যাক খেলিতেন এবং দুইজনেই 'বুট' পায়ে দিয়া খেলিতেন। এই ব্যাকজোড়া যখন একপক্ষে খেলিতেন তখন সাধ্য কি যে তাঁহাদের সামনে কেহ অগ্রসর হয়।

মহেন্দ্রবাবু ভালোই খেলিতেন, তবে তাঁহাকে লইয়া মুস্কিল ছিল এই যে, তাঁহার বিরুদ্ধে রেফারী যদি একাধিকবার বাঁশি বাজাইতেন তাহা হইলেই মুস্কিল। চোখ দুইটি তখন তাঁহার রক্ত জবার মত লাল হইয়া উঠিত, সেই চোখ দুইটি ঘুরাইয়া রেফারীর দিকে যখন তিনি চাহিতেন তখন বাহিরে দর্শক মণ্ডলীর-ই হৃৎকম্প উপস্থিত হইত রেফারী বেচারীর তো কথাই নাই! কিন্তু তাহার পরেও যদি আবার রেফারীর বাঁশি বাজিত তখন মহেন্দ্রবাবু আর খেলিতেন না, হাত দুইটি কোমরের উপর রাখিয়া মাঠের মধ্যে তিনি অপরাহ্ণ ভ্রমণ সুরু করিয়া দিতেন—সেদিনের মত শুধু তাঁহার নয়, তিনি যে দলে খেলিতেন সেই দলের খেলাও শেষ হইয়া যাইত।

এমনি ভাবে খেলায় দিনগুলি ভাল-মন্দে কাটিয়া যাইতেছে, কিন্তু, একদিন সত্য-সত্যই বিপদ আসিয়া একেবারে আমার দরজায় ঘা মারিল। সেদিন বাছাই করা দুইটি দলের একটি প্রদর্শনী খেলা হইবে, সুধীরবাবু দলবল লইয়া আসিয়া আমার কাছে হাজির হইলেন, বলিলেন,—

'আজ আপনাকে আমার দলের গোল-কিপার খেলতে হবে।'

আকাশ হইতে পড়িলাম, একে তো প্রদর্শনী খেলা, তাহাতে আবার গোল-কিপার! বলিলাম 'সে কি ক'রে হবে, গোল-কিপার খেলব আমি?'

"হ্যাঁ কাল পনের মিনিটের খেলায় আপনার খেলা দেখেছি, আপনি পারেন, আপনাকে খেলতেই হবে?"

ইহার পরে আর কথা চলে না। নির্দ্ধারিত সময়ে খেলার মাঠে হাজির হইলাম। সে ভীষণ দিনটির কথা মনে হইলে আজও বুকের ভিতরটা ঢিপ-ঢিপ করিয়া ওঠে। খেলা সুরু হওয়ার আগে সুধীরবাবু আসিয়া আশ্বাস দিয়া গেলেন, 'কোন ভয় নেই, আমি ব্যাকে খেলছি, *freely* খেলবেন আপনি।' খেলা সুরু হইয়া গেল। সুরুতেই এক পেনাল্টি! ভাবিলাম, ভগবান্, এত লাঞ্ছনাও তুমি কপালে লিখিয়া ছিলে, একটা বল পর্য্যন্ত ধরিলাম না, প্রথমেই পেনাল্‌টি! কিন্তু, উপায় কি? দাঁড়াইয়া রহিলাম, সুধীরবাবু বলিলেন, 'কোন ভয় নেই, *freely* খেলুন।' কথাগুলি আমি না শুনিলেও দেহের প্রতিটি

অঙ্গ-প্রত্যঙ্গই যে শুনিয়াছিল তাহা ঠিক্, কারণ কাঁপুনির ব্যাপারে চূড়ান্ত *freedom*-ই উহারা উপভোগ করিয়াছিল। প্রতিপক্ষের অমূল্যবাবু 'পেনাল্‌টি কিক্' করিবেন, গোল অব্যর্থ। রেফারী বাঁশি বাজাইবার সঙ্গে-সঙ্গে অমূল্যবাবু গোল লক্ষ্য করিয়া তীব্র একটি 'সট' করিলেন সঙ্গে সঙ্গেই একটা যেন প্রচণ্ড আঘাত অনুভব করিলাম এবং তাহার সঙ্গে-সঙ্গে শুনিলাম হাততালির শব্দ। শুনিলাম, আমি নাকি 'পেনালটি *save* করিয়া ফেলিয়াছি!' অমূল্যবাবুর বরাত খারাপ। তিনি গোল লক্ষ্য না করিয়া লক্ষ্য করিয়াছিলেন আমাকে, তাই সে যাত্রা বাঁচিয়া গেলাম। অমূল্যবাবুরও তেমন দোষ নাই। আর কিছু পারি আর না পারি, দেহের আয়তন দিয়া গোলের অনেকখানি জায়গা যে আটকাইয়া রাখিতে পারিতাম তাহা ঠিক্। বাকি যেটুকু থাকিত তাহার মধ্য দিয়া গোল করা কঠিন বৈকি।

প্রথমার্দ্ধ শেষ হইয়া গেল। ভাবিলাম, দ্বিতীয়ার্দ্ধটা কোন রকমে শেষ করিতে পারিলেই হয়, তাহার পরে আর গোলকিপার খেলা নয়। দ্বিতীয়ার্দ্ধেও কয়েকটি বল আসিল এবং আমার হাতে-পায়ে লাগিয়া ফিরিয়া-ফিরিয়া যাইতে লাগিল বাহির হইতে উৎসাহীর দল চীৎকার করিয়া উঠিল, 'সাবাস নিকুঞ্জবাবু!' কিন্তু এইখানেই শেষ নয়। কিছুক্ষণ পরে যাহা ঘটিল তাহা আরো অভূতপূর্ব্ব। প্রতি-পক্ষের যোগেশবাবু বল লইয়া ছুটিয়া আসিতেছেন একে-একে সব খেলোয়াড়কে

কাটাইয়া গোলের দিকে তিনি অগ্রসর হইতেছেন, এবার বুঝি গোল না হইয়া যায় না। শেষকালে আর কেহ রহিল না, কেবল যোগেশবাবু আর আমি। এমন সময় এক ঘটনা ঘটিল, যে কোণ হইতে যোগেশবাবু আসিতেছেন সেই কোণের দিকে ছুটিতে গিয়া হঠাৎ আমি ব্যালেন্স হারাইয়া পড়িয়া গেলাম, এদিকে যোগেশবাবু ততক্ষণ গোলে 'সট' মারিয়া বসিয়াছেন, আমার লুণ্ঠিত দেহের একাংশে লাগিয়া বলটি গোলের বাহিরে চলিয়া গেল। কি হইল বুঝিতে না বুঝিতেই চারিদিকে শুধু হাততালিই নয়, একেবারে আমাকে *hand shake* করিবার ধূম পড়িয়া গেল!

খেলা শেষ হইলে লোকজন আসিয়া ভিড় করিয়া দাঁড়াইল। সুধীরবাবু বলিলেন, 'ভালো তো আপনি খেলিয়াছেনই, শেষকালে যে *body throw* করিয়া গোলটি বাঁচাইয়াছেন সেটা সত্যই *marvellous!*' এবার সত্যই লজ্জা পাইলাম, ভাবিলাম কার বা *body* আর কে বা করে *throw*!

একত্রিশ

দেখিতে-দেখিতে পূজা আসিয়া পড়িল। আর মাত্র মাস খানেক বাকি। কথাবার্ত্তা চলিতে লাগিল : দেউলী বন্দী-শিবিরে পূজার আয়োজন করা সম্ভব কিনা। বাঙ্গালী আমরা, আর সবই হয় তো ভুলিয়া থাকিতে পারি, কিন্তু, পূজার দিনে পূজার দিন কয়টিকে ভুলিয়া থাকা মুস্কিল। তাহা ছাড়া বাঙলা হইতে বহু দূরে নির্ব্বাসনে বসিয়া যদি দুর্গোৎসবের আয়োজন করিতে পারি তাহা হইলে দূরে ফেলিয়া আসা বাংলা দেশের সঙ্গে একটা যোগসূত্রও স্থাপন করা যাইবে।

যাহা অসম্ভব তাহাকে সম্ভব করিয়া তুলিতে রাজবন্দীদের

উত্তম উদ্দাম হইয়া উঠিত। তাই আলাপ আলোচনায় যতই মনে হইতে লাগিল একাজে বাধাটা অনতিক্রম্য ততই আমাদের জেদ-ও চাপিতে লাগিল, যে-করিয়াই হউক পূজা করিতেই হইবে। প্রথম বাঁধার প্রাচীর হইল সরকারকে রাজী করানো। সরকার আদেশ না দিলেতো সবই পণ্ড হইয়া যাইবে। কিন্তু, সর্ব্বাপেক্ষা যাহা আশ্চর্য্যের তাহা হইল এই যে, দরখাস্ত করা মাত্র জেল-সুপার লিখিয়া পাঠাইলেন, নিজেদের খরচে ডেটেনিউরা যদি পূজা করিতে চায় তবে সরকার আপত্তি করিবেন না। সংবাদ পাওয়ামাত্র জেলের মধ্যে 'হৈ-হৈ পড়িয়া গেল—আদেশ আসিয়া গিয়াছে—এবার পূজার আয়োজন। বীরেন দা (শ্রীযুক্ত বীরেন্দ্র চট্টোপাধ্যায়) ছিলেন এ ব্যপারে অতিমাত্রায় উৎসাহী ব্যক্তি। তিনি বলিলেন, হৈ হৈ তো কচ্ছ, কিন্তু প্রতিমা ?' এক বন্ধু বলিয়া উঠিলেন, 'এ রাজ্যে মানুষ যখন আছে তখন কুম্ভকার নিশ্চয়ই পাওয়া যাইবে। ডাক গিসাকে।' গিসা কয়েদি নয়, বাইরের লোক আমাদের ভাঙ্গীর (মেথরের) কাজ করে। সে এই দেউলী গ্রামেরই অধিবাসী। তাই গিসারই ডাক পড়িল প্রথম। গিসা তো আসিল, কিন্তু কুম্ভকার যে কি চিজ তাহা বুঝাইতে বীরেন-দা হইতে সুরু করিয়া পঞ্চাননবাবু পর্য্যন্ত সকলেই গলদঘর্ম্ম হইয়া গেলেন। রান্নাঘর হইতে অনেক হাঁড়ি কলসী বাহির করিয়া, অনেক সরা মালশা ভাঙ্গিয়া গিসাকে কোন রকমে কুম্ভকার পর্য্যন্ত বুঝান হইল। গিসা

এবার বলিল কুম্ভকার যে শুধু এরাজ্যে আছে তাই নয়, নাম করা বিদেশী কুমারই আছে, এই বলিয়া কবে সে কুম্ভকার কি মূর্ত্তি গড়িয়া কোথায় কোথায় বকশিস পাইয়াছে তাহার ফিরিস্তি দিতে লাগিল। গিসার সঙ্গে কথা হইয়া গেল, আগামী কাল সে ঐ খ্যাতনামা কুমারকে জেল গেটে আনিয়া হাজির করিবে।

পরের দিন কথামত সেই কুমার আসিয়া হাজির। তাহাকে লইয়া হইল আর এক মুস্কিল। ও দেশে দুর্গাপূজার প্রচলন নাই তাই দুর্গা প্রতিমা যে কি রকম তাহা কেহ জানে না। গিসাকে কুমার বুঝাইতেই গলদঘর্ম্ম হইতে হইয়াছিল কুমারকে দুর্গা প্রতিমা বুঝানো কি যে সে ব্যাপার! অনেক কষ্ট করিয়া, অনেক বুদ্ধি খরচ করিয়া, অনেক অঙ্গভঙ্গী করিয়া যখন আমরা মনে করিয়াছি এইবার ও ঠিক বুঝিতে পারিয়াছে দুর্গা প্রতিমার স্বরূপ, তখন সে তাহার বিরাট শিখাটি দোলাইয়া বলিল, 'হ্যাঁ হ্যাঁ, অব সমঝ লিয়া, রামচন্দ্র কা মূর্ত্তি বানানা হ্যায়।" "তোমার মাথা হ্যায়"—বলিয়া রাগিয়া টোনা বাবু সটান ভিতরে চলিয়া গেলেন। কিন্তু পঞ্চাননবাবু আর বীরেন দা নাছোড়বান্দা! তাঁহারা উহাকে দুর্গা প্রতিমা বুঝাইয়া ছাড়িবেনই। দ্বিতীয় বার অনেক কিছু বুঝাইয়া তাহাকে প্রশ্ন করা হইল সে ঠিক বুঝিতে পারিয়াছে কিনা আমরা কি চাহিতেছি। এবার সে ঘাড় নাড়িল, বলিল, 'হ্যাঁ হ্যাঁ অব সমঝ লিয়া, হনুমানজীকা মূর্ত্তি বানানা হ্যায়!' নাঃ, আমাদের

সকল চেষ্টাই ব্যর্থ হইয়া গেল। দেখা গেল সে বেচারী রাম হইতে হনুমান পর্য্যন্ত, আর হনুমান হইতে রাম পর্য্যন্তই যাহা কিছু বুঝে, ইহা ছাড়া আর কিছু বুঝে না। বীরেন দা বলিলেন, 'আচ্ছা এক কাজ করা যাক, প্রথমে দেখা যাক্ ও কি রকম কারিগর তারপরে ছবিটবি দেখাইয়া আর একবার চেষ্টা করা যাইবে।' এই বলিয়া বীরেন দা কোথাকার এক বিজ্ঞাপনের পৃষ্ঠা হইতে একটি গণেশের ছবি লইয়া আসিলেন, জিজ্ঞাসা করিলেন মাটি দিয়া এই মূর্ত্তিটি সে গড়াইতে পারিবে কিনা! ও তো হাসিয়াই খুন! উহার ভাবটা হইল এই যে, যে-কারিগর এত হনুমানের মূর্ত্তি গড়াইয়াছে সে আর এই সামান্য মূর্ত্তিটা গড়াইতে পারিবে না? কথা ঠিক্ হইয়া গেল। দিন তিনেক পরে গণেশের মূর্ত্তিটি সঙ্গে করিয়া সে আবার আসিবে!

কারিগর চলিয়া গেলে জেলের মধ্যে একটা হাসির ধুম পড়িয়া গেল। সকলেই বলিল, 'হ্যাঁ কারিগরই বটে।' বীরেনদার সঙ্গে তো কোন কথাই বলা যায় না। কিছু বলিলেই তিনি বলেন, 'হ্যাঁ, হ্যাঁ, অব সমঝ লিয়া।' এত হৈ-চৈ, এত হাসির রোলের মধ্যে আর একটি লোককে কিন্তু এতক্ষণ চোখেই পড়ে নাই, সে আমাদের হারাণ। হৈ হল্লা একটু কমিলে হারাণ আসিয়া কাছে দাঁড়াইল। দেখিলাম রাগে তাহার সমস্ত শরীর কাঁপিতেছে। জিজ্ঞাসা করিলাম, 'কি হয়েছে হারাণ?' হারাণ বলিল, 'হবে আবার কি বাবু

কোথাকার জঙ্গলী ভূত, দুর্গা প্রতিমা দেখে নি?' এই বলিয়া হাত দুইটি তাহার তিনবার কপালে ছোঁয়াইল, বলিল 'কেবল রামচন্দর আর হনুমান, আর ব্যাটা নিজে যেমন হনুমান তেমন তো!' অনেক কষ্টে হারাণকে শান্ত করিলাম, বলিলাম, 'এটা বাংলা দেশ নয়, দুর্গা পূজা এখানে হয় না, তাই—' কথাটা শেষ হইল না। হারাণ বলিল, 'নাই বা হল বাংলা দেশ, তাই বলে মা-দুর্গার নাম জানেনা, দুর্গা প্রতিমা দেখে নি, এ কখনও হয়?' সে দিনের মত দুর্গোৎসবের আয়োজন আমাদের সেইখানেই শেষ হইল। সকলেরই এ ধারণা বদ্ধমূল হইয়া গেল যে, এখানকার কারিগর দিয়া কিছুই হইবে না। প্রতিমার জন্য অন্য কোন ব্যবস্থা করিতে হইবে। কেবল বীরেনদা বলিলেন, 'দেখাই যাক্ না, কোথাকার জল কোথায় গড়ায়।'

দিন দুই পরে সেই কারিগর দিগ্‌গজ আবার জেলগেটে আসিয়া হাজির হইল। হাতে তাহার অনেক যত্নে বাঁধা পুটুলি। খবর শুনিয়া জেলগেটে ভীড় জমিয়া গেল। কারিগর ধীরে ধীরে পুটলিটি নামাইল এবং আরো ধীরে-ধীরে উহার বাঁধন খুলিতে সুরু করিল। নেকড়ার পর নেকড়া জড়ান। শেষ যেন আর কিছুতেই হইতে চায় না। রুদ্ধ নিশ্বাসে আমরা দাঁড়াইয়া রহিলাম। অবশেষে পুটলীর ভিতর হইতে মূর্ত্তি বাহির হইয়া আসিল। কিন্তু, ও হরি গণেশ কৈ! সকলে সবিস্ময়ে দেখিল যে, গোলগাল মোটাসোটা

একটি ইঁদুরের মূর্ত্তি পোটলা হইতে বাহির হইয়া আসিয়াছে! বীরেনদা বলিলেন, 'ই কোন হ্যায় ভাই!' কারিগর দৃঢ় সংযত কণ্ঠে বলিল, 'কেঁও, গণেশ!' হারাণ এবার চুপ করিয়া থাকিতে পারিল না, চীৎকার করিয়া উঠিল, 'ব্যাটা ভূত!' কারিগর কিন্তু দমিবার পাত্র নয়, সে জোর করিয়াই বলিতে লাগিল, ছবিতে যে গণেশের মূর্ত্তি তাহাকে দেখান হইয়াছিল, এ মূর্ত্তিটিও অবিকল তাহারই অনুরূপ। ছবিটি বীরেনদার হাতেই ছিল। কারিগরকে ছবিটি দেখাইয়া বলিলেন, 'আব মিলাও তো!' সে ছবিটি ভাল করিয়া নিরীক্ষণ করিল, পরে তাহারা স্বভাব-সুলভ কণ্ঠে বলিল, 'হ্যাঁ, হ্যাঁ, অব সমঝ লিয়া। তস্‌বীর কা গণেশ খাঁড়া হ্যায়, আউর ই গণেশ জমিপর লেট গিয়া।' এই বলিয়া ইঁদুরটিকে দাঁড় করাইয়া সে বলিল, 'অব দেখিয়ে।' এবার আর হাসি রোখা গেল না। হাসিতে হাসিতে এ ওর গায়ে গড়াইয়া পড়িতে লাগিল। এত হৈ-চৈ শুনিয়া সে-বেচারা বেশ ভড়কাইয়া গেল। অনেক দুঃখে সে উচ্চারণ করিল দুটি কথা, 'নেই হুয়া?' হারাণ রাগে গরগর করিতে লাগিল। বীরেনদা এবার কুমারকে ভাল করিয়া বুঝাইয়া বলিলেন যে, তাহার দ্বারা এ কাজ হইবে না। গণেশের মূর্ত্তি যখন ইঁদুরে পরিণত হইয়াছে তখন দুর্গামূর্ত্তি আবার কিসে পরিণত হইবে কে জানে। কারিগর দিগ্‌গজ কিন্তু কিছুতেই দমিবার পাত্র নহে। সে বারে-বারেই বলিতে লাগিল যে, কত কঠিন মূর্ত্তি সে তৈরি করিয়াছে আর এ মূর্ত্তি

সে পারিবে না। জোর দিয়াই সে আবার বলিল, 'ম্যয় জরুর স্যাকুঙ্গা।' হারাণ তখনো দাঁড়াইয়াছিল, বলিল, 'সেকুঙ্গা না ছাই, তুমি কেন, তোমার বাপ, দাদা, চৌদ্দপুরুষ কেউ সেকুঙ্গা না।'

প্রতিমা-গড়নের কাজটা শেষ পর্য্যন্ত নিজেদেরই লইতে হইল। বীরেনদা বলিলেন, 'কুছ পরওয়া নেই, নিজেদেরই সব কাজ করিতে হইবে। কুমারের কাজও নিজেরাই করিব তাহাতে আর যাই হউক না কেন, গণেশের মূর্ত্তি আর ইঁদুরের মূর্ত্তিতে পরিণত হইবে না।' মূর্ত্তিগঠনের ভার পড়িল প্রধানত পঞ্চাননবাবু, টোনাবাবু, ফণীবাবু, পুষ্পবাবু, জীবনবাবু ও সুধীরবাবুর (বসু) উপর। সুধীরবাবুর কথাটা এই প্রসঙ্গে বলা প্রয়োজন। শিল্পী হিসাবে সুধীরবাবুর বাহিরেই নাম ছিল। তিনি ভার লইলেন দেব-দেবীর মুখ-গঠন করিবার দায়িত্ব। বাকী সকলে মিলিয়া লাগিয়া গেলেন প্রতিমার অন্য সব অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ গঠনের কাজে। কাজ সুরু হইয়া গেল, বাঁশ আসিল, দড়ি আসিল, খড় আসিল, মাটি তো আসিলই। সারা দিন ভরিয়া চলিল প্রতিমা গঠনের কাজ।

এই প্রসঙ্গে সাধারণ কয়েদিদের অনেকের মধ্যেই মনে হয় হারাণ ও পাঁচুর কথা। হারাণের এ ব্যাপারে উৎসাহ যত বেশী ছিল জ্ঞানগম্য ছিল তত কম। হারাণ বলিল, 'আমি হাতেনাতে কিছু করতে পারব না বাবু, তবে বলে দিতে

দিতে পারব, কোন জায়গাটা হচ্চে না, আর কোন জায়গাটা হচ্চে।' জিজ্ঞাসা করিলাম, 'আচ্ছা যে-জায়গাটা হচ্ছে না, সে জায়গাটা কি রকম হবে, তা তুমি বলতে পারবে তো হারাণ?' ঘাড় নাড়িয়া হারাণ বলিল, 'তা কখনো হয়? তা হলে তো নিজেই আমি মূর্ত্তি তৈরী করতে পারতাম।' পাঁচু কিন্তু ছিল ভিন্ন প্রকৃতির। পাঁচু শুধু হাতেনাতে অনেক কিছু যে করিতে পারিত তাই নয়, পাঁচুর এ ব্যাপারে ধারণাও ছিল যথেষ্ট। কিন্তু তবু পাঁচুকে লইয়া শেষ পর্য্যন্ত মুস্কিল বাঁধিয়া গেল।

'কেবল' বাবুর কাছে পাঁচু কমিউনিজমের শিক্ষা গ্রহণ করিতেছিল, প্রতিমা তো দূরের কথা, পাঁচু ভগবানই তখন মানে না। তাই পাঁচুকে যতবারই ডাকিয়া পাঠান হইত, পাঁচু একটা না একটা ওজর দেখাইত, আসিতে চাহিত না। শেষকালে ফণীবাবু কথাটা ফাঁস করিয়া দিলেন, তিনি বলিলেন, পাঁচু বলিতেছে মূর্ত্তি সে গড়িতে পারিবে যদি ইহা পূজার প্রতিমা না হয়। কমিউনিষ্ট হইয়া পূজার প্রতিমা সে কি করিয়া গড়িবে? তাঁহাকে বুঝাইলেন, বলিলেন, 'তুই এক কাজ কর পাঁচু, মূর্ত্তি গড়াতে থাকবি আর বারে বারে মনে মনে বলবি, আমি তোমাকে মানিনা, তোমার কার্ত্তিক গণেশকে মানি না, তোমার লক্ষ্মী সরস্বতীকে মানি না, তোমার অসুর সিংহকে মানি না, মহাদেবকে মানি না, কাউকে না।' কিন্তু তাহাতেও পাঁচুর মন গলিল না, সে বলিল 'তা কি

কখনও হয়, মানুষের মন যে দুর্ব্বল বাবু!' শেষকালে বীরেনদার কথায় পাঁচু মাথা পাতিল। তিনি বলিলেন, 'পাঁচু, তুমি তো জান, প্রতিমার প্রাণ-প্রতিষ্ঠা যতক্ষণ না হয় ততক্ষণ আর সে প্রতিমা দেবত্ব প্রাপ্ত হয় না, তাই তোমার আর ভয়টা কিসের? তোমার কাজ তো প্রাণ-প্রতিষ্ঠার পূর্ব্ব পর্য্যন্ত। তখন পর্য্যন্ত তো এ প্রতিমা *No God*!' মোক্ষম যুক্তি! পাঁচু এবার হার মানিল। ইহার পরে পাঁচুর উৎসাহ ও উদ্যম আর সকলের কর্ম্মপ্রেরণাকেই ছাপাইয়া উঠিল।

সকলের উৎসাহ, উদ্দীপনা ও কর্ম্ম-প্রচেষ্টায় শেষপর্য্যন্ত প্রতিমাগঠন কার্য্য শেষ হইল এবং বলিতে দ্বিধা নাই যে, সে-প্রতিমা বাহিরের নামকরা কারিগরদের সমকক্ষ না হইলেও যে কোন সাধারণ কারিগর নির্ম্মিত প্রতিমার যে সমপর্য্যায়ের সে-বিষয়ে কোন সন্দেহ ছিল না। হারাণ তো প্রতিমার দিকে একদৃষ্টে তাকাইয়াই রহিল, বলিল, 'না বাবু, বাইরে আপনারা অনেকেই এ কাজ নিশ্চয় করেছেন, তা না হোলে কখনো এরকম প্রতিমা গড়া যায়? এ প্রতিমা যে আমাদের নিতাই কারিগরকেও হার মানিয়েছে!' ফণীবাবু বলিলেন, 'বল কি হারাণ, আমরা যদি বাইরে প্রতিমার কাজই করতাম তা হোলে সরকার আমাদের জেলে পুরে রাখবে কেন?' হারাণ অত জটিল যুক্তির কথা বোঝে না। সে শুধু বলিতে লাগিল, 'আগে যদি একাজে আমাদের

হাত না থাকে তবে আমরা কি করিয়া এমন প্রতিমা গড়াইয়া ফেলিলাম!

কথাটা বাহির পর্য্যন্তও হয় তো রাষ্ট্র হইয়া গিয়াছিল। কেননা, পরের দিন ভোর বেলা দেখি দেউলীর সেই কারিগর দিগ্‌গজ-ও আসিয়া হাজির। অনেকক্ষণ ধরিয়া প্রতিমাটির খুঁটিনাটি নিরীক্ষণ করিয়া সে বলিল, 'হ্যাঁ, হ্যাঁ, অব্ সমঝ্‌লিয়া।' হারাণ তো উহাকে দেখিয়াই রাগিয়া গিয়াছিল, ওর কথা শুনিয়া চটিয়া একেবারে লাল হইয়া গেল, বলিল, 'তোম্ তো তোম্, তোম্ ছাড়া তোমার বাবাও সমঝ্‌লিয়া না।' হারাণের হিন্দী শুনিয়া সকলেই হো-হো করিয়া হাসিয়া উঠিল। কারিগরদিগ্‌গজ কি বুঝিয়াছিল কে জানে, সে-ও এই হাসিতে যোগ দিল। হারাণ রাগে গর-গর করিতেছিল, বেশি কথা বলিতে পারিল না, কেবল 'বেটা, ভূত!' এই বলিয়া সে দ্রুতপদে সেখান হইতে চলিয়া গেল।

এমনি ভাবে প্রচুর আনন্দ পরিবেশেনের মধ্য দিয়া পূজার দিন কয়টি আমাদের পার হইয়া গেল। উৎসবের কোন অঙ্গই বাদ পড়িল না, খাওয়াদাওয়া হইতে সুরু করিয়া গান বাজনা, নাটক এমন কি যাত্রা পর্য্যন্ত! এই আনন্দ উৎসবের মধ্যে সাধারণ কয়েদিদের উৎসাহই ছিল সব চেয়ে বেশি! জেলের মধ্যে পূজা এবং তাহাতে এত আনন্দ, এ ছিল ওদের কল্পনার বাইরে।

পূজার এ আনন্দমুখর দিনগুলির মধ্যে একটি বিষাদের ছবির কথাও আজ মনে পড়িতেছে। সাধারণ কয়েদিদের সকলে যখন আনন্দে অধীর হইয়া দিন রাত্রির প্রতিটি মূহূর্ত্তকে সজীব করিয়া তুলিতেছিল তখন সকলের অলক্ষ্যে, একান্ত সঙ্গোপনে কাল কাটাইতেছিল আমাদেরই বহু পরিচিত কয়েদি 'হাপড়'। হাপড় বাঙালী না বিহারী ঠিক্ বুঝা যাইত না, কথাবার্ত্তা যদিও বাঙলায় বলে তবে উচ্চারণ অনেকটা বিহারীর মত। কয়েদিদের পোষাক-পরিচ্ছদ দেখিয়া তো আর বুঝিবার যো থাকে না যে, কে বাঙালী আর কে বিহারী, কয়েদখানায় তো সবই সমান, সব একদর। হাপড় ছিল দুর্দ্ধর্ষ ডাকাত, খুন-খারাবি যে কত সে করিয়াছে তাহার ইয়ত্তা নাই। বাড়ী, ঘর, সংসার তাহার আছে কিনা কেউ জানিত না, সে কোন দিন ওসব কথা তুলিতই না। তাহার কথাবার্ত্তা, চালচলতি, হাবভাব দেখিয়া কেহ ভুলেও ধারণা করিত না যে, স্নেহ-প্রীতি, মায়া-মমতা এই সব মনুষ্যোচিত গুণগুলির কোন একটাও তাহার মধ্যে আছে। তাহার অতীত জীবনের নিষ্ঠুর কার্য্যকলাপের বর্ণনা সে যেরূপ অনায়াসে দিয়া যাইত তাহাতে একথাই সকলের মনে বদ্ধমূল হইয়াছিল যে, এ ব্যক্তিটির হৃদয় বলিয়া কিছু নাই।

জেলের মধ্যে নানা কাজ কর্ম্মেই হাপড়ের উৎসাহ প্রচুর, কিন্তু, ওকে লইয়া মুস্কিল হইত এই যে, যে-কাজের ভারই তাহাকে দেওয়া হউক না কেন সে তাহা পণ্ড করিবেই।

এক গ্লাস জল আনিতে হাপড়কে বলিলে কাঁচের গ্লাসটি সে নির্ঘাত ভাঙ্গিয়া আসিবে, কাহাকেও ডাকিয়া আনিতে বলিলে সে যদি আসিতে না চায় ধরিয়াই তাহাকে লইয়া আসিবে, এই ছিল তাহার স্বভাব। তাই কাজের কথা হাপড়কে খুব সতর্কতার সহিত বলিতে হইত। পূজার সময়ও হাপড়কে বড় একটা কাজের ভার আমরা দিতাম না ; কিন্তু, ওর স্বভাবটা ছিল এই রকম যে, কাজের ভার দেওয়া পর্য্যন্ত সে আর অপেক্ষা করিত না, ইঙ্গিত পাইবা মাত্রই ছুটিত। এ-হেন হাপড়কেও পূজার দিনগুলিতে বড় একটা দেখা গেল না !

বিজয়া দশমীর পরে যখন কোলা-কুলির ধূম পড়িয়া গিয়াছে তখন অকস্মাৎ কে যেন বলিয়া উঠিল, 'হাপড় কোথায় ? হাপড়কে দেখছিনা কেন ?' তাইতো ! হাপড় ! হাপড় ! চারিদিকে হাপড়ের খোঁজ পড়িয়া গেল। কিন্তু, হাপড়ের কোন সাড়াশব্দ পাওয়া গেল না। হারাণকে ডাকিয়া জিজ্ঞাসা করিলাম, 'ব্যাপার কি হারাণ, হাপড়কে দেখছি না কেন ? প্রশ্নটা শুনিবামাত্র হারাণের হাস্যোজ্জ্বল মুখখানি যেন কাল হইয়া উঠিল ; মুখ নীচু করিয়া সে শুধু বলিল, 'ও আসবে না, বাবু।' 'কেনরে ?' 'সে অনেক কথা বাবু' বলিল হারাণ। ইহার পরে আর কোন প্রশ্ন চলে না। হারাণকে লইয়া সটান যাত্রা করিলাম হাপড়ের উদ্দেশে।

সাধারণ কয়েদখানার ভিতরে অন্ধকার এক কোণে চুপ করিয়া বসিয়াছিল হাপড়। হাপড়কে অনেকবারই তো

দেখিয়াছি কিন্তু এ যেন সে মূর্ত্তিই নয়। এ নির্ব্বাক নিস্তব্ধ বিষণ্ণ মূর্ত্তির সঙ্গে চির প্রফুল্ল সে হাপড়ের কোন তুলনাই হয় না। কাছে গিয়া দাঁড়াইলাম আমি আর হারাণ। হাপড় আমাদিগকে লক্ষ্য করিল কি না কে জানে, কিন্তু আমরা বেশ লক্ষ্য করিলাম হাপড়ের দুই গণ্ড ভরিয়া অশ্রুধারা বহিয়া চলিয়াছে। আশ্চর্য্য! স্নেহ-প্রেম, দয়া-মায়া বলিয়া যাহার কিছু নাই, এই আনন্দ উৎসবের মধ্যে তাহার চোখে জল আসে কেন? কেন এই উৎসবমুখর মুহূর্ত্তগুলির অন্তরালে সে খোঁজে নিঃসঙ্গ একটি স্তব্ধ মুহূর্ত্ত?

হাপড়ের সে-ধ্যান আর ভাঙ্গাইলাম না, যেমন নীরবে আসিয়াছিলাম তেমনি চলিয়া গেলাম। ইহার পরেও হাপড়ের কাছে একথা কোনদিন তুলি নাই। জীবনের যে অধ্যায়টি তাহার রহস্যাবৃত, যে অধ্যায়টি আছে সবার অগোচরে সে অধ্যায়টিকে সকলের সামনে টানিয়া আনিয়া লাভ কি?

বত্রিশ

জেলখানার মুহূর্ত্তগুলি অনেকদিন ধরিয়া নির্ব্বিঘ্নে ও নিরাপদে কাটিতে থাকিলে জেল-কর্ত্তৃপক্ষ চিন্তিত হইয়া পড়েন। তখন তাহাদের প্রতিনিয়ত চিন্তা এই থাকে, কি করিয়া এমন কোন ঘটনা ঘটানো যায় যাহার ফলে রাজবন্দীরা মনে করিতে পারে যে, নির্ব্বিঘ্নে জীবনযাত্রা নির্ব্বাহের জন্য জেলখানা নয়। তাই কখনও বা প্রত্যক্ষে আর কখনও বা পরোক্ষে থাকিয়া এমন সব ঘটনার সৃষ্টি জেল-কর্ত্তৃপক্ষ করিতেন যাহাতে সত্যই মনে হইত জেলখানা—জেলখানাই।

দেউলীতে বেশ কিছুদিনের নিশ্চিন্ত জীবন-যাত্রা এবং শেষ পর্য্যন্ত আনন্দ পরিবেশনের মধ্য দিয়া পূজার দিনগুলি কাটাইয়া দেওয়ায় দেউলীর জেল-কর্তৃপক্ষ প্রমাদ গণিলেন। তাঁহারা হয়তো ভাবিলেন, সর্ব্বনাশ! রাজবন্দীরা এমনি বিভিন্ন দিনে বিচিত্র আনন্দ পরিবেশনের মধ্য দিয়া যদি ভুলিয়াই থাকিতে পারে যে, তাঁহারা বন্দী তাহা হইলে তো তাঁহাদের বন্দী করিয়া রাখিবার পেছনে যে-উদ্দেশ্য সে-উদ্দেশ্যই ব্যর্থ হইবে। জেলের সাধারণ কয়েদীদিগকে যেমন অশন-বসন হইতে আরম্ভ করিয়া প্রতিদিনের জীবন-যাত্রার সব কিছুতেই স্মরণ করাইয়া দেওয়া হয়, তাহারা মানুষ নয়, তাহারা শুধু কয়েদী, তেমনি রাজবন্দীদেরও মাঝে-মাঝে মনে করাইয়া দেওয়া দরকার যে, রাজবন্দীরা আর যাহাই হউন না কেন আসলে তাঁহারা বন্দী। এই মনে করাইয়া দেওয়ার ব্যাপারে আবার জেলের উর্দ্ধতন কর্তৃপক্ষ অপেক্ষা চুনোপুটিদের চিন্তা ও উৎসাহই ছিল বেশি। রাজবন্দীদের শাসনে রাখিবার সর্ব্ববিধ দায়িত্ব যেন তাঁহাদেরই। কিন্তু, হইলে কি হইবে অনেক চেষ্টা চরিত্র করিয়াও রাজবন্দীদের সঙ্গে প্রত্যক্ষ সংঘর্ষে আসিবার কোন সুযোগই তাঁহারা খুঁজিয়া পাইলেন না।

অবশেষে হরিপদবাবু সে সুযোগ তাঁহাদের করিয়া দিলেন। পূজার ঠিক্ কতদিন পরে মনে নাই, পূজার পরেই শ্রীযুক্ত হরিপদ বাগচী যে অসুস্থ হইয়া পড়িলেন সে-কথাটা বেশ মনে আছে। দেউলীর চিকিৎসার কথা পূর্বে বলিয়াছি, জ্বর হইলে

'কুইনাইন মিক্‌শ্চার' ও পেটের গোলমাল হইলে 'কারমিনেটিভ মিক্‌শ্চার' ইহার বাহিরে কোন ঔষধপত্র সেউলীর হাসপাতালে বহুদিন পর্য্যন্ত ছিল না। হরিপদবাবুর তলপেটের ডানদিকে ভীষণ বেদনা আরম্ভ হইয়া গেল, ডাক্তারের কাছে খবর যাওয়া মাত্র 'কারমিনেটিভ মিক্‌শ্চার' আসিয়া পড়িল, কিন্তু, কারমিনেটিভ মিক্‌শ্চারে হরিপদবাবুর কিছুই হইল না। আবার খবর গেল, একটি ঔষধের শিশি হাতে করিয়া ডাক্তার ভিতরে আসিলেন। কিছুক্ষণ দাঁড়াইয়া কি দেখিলেন কে জানে, যেমন নীরবে তিনি আসিয়াছিলেন তেমনি নীরবে চলিয়া গেলেন। বেশ বুঝা গেল ডাক্তার কিছুই বুঝিতে পারেন নাই। না বলিলেও বুঝিতে পারিয়াছিলাম যে, হাতে করিয়া যে শিশিটি তিনি আনিয়াছিলেন তাহা কুইনাইন মিক্‌শ্চারের শিশি। কারণ হাসপাতালে দুইটি মাত্র প্রধান ঔষধই আছে। তাই একটিতে কাজ হয় নাই শুনিয়া আর একটি অব্যর্থ ঔষধ সঙ্গে করিয়া তিনি আনিয়াছিলেন।

পরের দিন হরিপদবাবু একেবারে শয্যাশায়ী হইয়া পড়িলেন। বুঝা গেল এ সাধারণ পেট ব্যথা নয়, রোগ অত্যন্ত কঠিন। পঞ্চাননবাবু তো *declare*-ই করিয়া বসিলেন, '*Surely it is a case of appendicitis*' এ্যাপেণ্ডিসাইটিস্ না হইয়া যায় না। পঞ্চাননবাবু এই রোগে ভুগিয়াছেন, এ্যাপেণ্ডিসাইটিস অপারেশন করাইয়াছেন, সুতরাং তাঁহার কথা একেবারে ফেলা যায় না। এ্যাপেণ্ডি-

সাইটিস্ তো না হয় বোঝা গেল, এখন উপায়? কলিকাতার জেলে কিংবা বাংলা দেশের জেলে থাকিলে ভাবনার তেমন কিছু থাকিত না—অনায়াসেই মেডিকেল কলেজে বদলী করাইয়া *operation* করান যাইত। কিন্তু এখানে? *operation*-এর প্রয়োজন যদি হইয়াই পড়ে তবে উপায় কি? নিকটতম বড় হাসপাতাল তো ৭০ মাইল দূরে, আজমীরে। সেখানকার ব্যবস্থাই বা কি রকম কে জানে? তাহা ছাড়া *appendicitis*-এর মত 'মেজর অপারেশন' করিবার মত খ্যাতনামা কোন সার্জন সেখানে আছেন কিনা তাহাও জানা ছিল না। রোগীকে একাই সেখানে যাইতে হইবে। না হইবে তাঁহার কোন সেবা-শুশ্রূষা, না পাওয়া যাইবে ভালমন্দ কোন সংবাদ। এই সব চিন্তা আমাদের সকলকেই ভাবাইয়া তুলিল। পঞ্চাননবাবু বলিলেন, আজমীর পর্য্যন্ত যদি যাইতে হয় তবে তাহার চেয়ে বরং কলিকাতা মেডিকেল কলেজে যাওয়াই ভাল। যাওয়া ভালো নিশ্চয়ই। কিন্তু, প্রথম কথা হইতেছে এই যে, কর্তৃপক্ষকে রাজি করান যাইবে কিনা, আর দ্বিতীয় কথা রোগী তিনদিনের ট্রেণ ভ্রমণের কষ্ট সহ্য করিতে পারিবেন কিনা।

সন্ধ্যাবেলা গেলেন হরিপদবাবুর ব্যাপার লইয়া জেল সুপারের সঙ্গে আলাপ-আলোচনা করিতে। দুই ঘণ্টা পরে একান্ত বিমর্ষচিত্তে তিনি ফিরিয়া আসিলেন, বলিলেন, 'না হে, কিছুই হোল না। মেডিকেল কলেজে পাঠাবার

ব্যবস্থা করতে সুপারের হয়তো তেমন আপত্তি ছিল না কিন্তু, 'পারিষদ দল' আছেন যে। তাঁরা তৎক্ষণাৎ সার্কুলার বার কোরে বলে দিলেন, না সে হতে পারে না স্যার! দেউলীর রোগীকে আজমীর পাঠাবার ক্ষমতাই আপনার আছে, কলকাতা পাঠাতে হলে সেন্ট্রাল গবর্ণমেন্টের অর্ডার ছাড়া আপনি পারেন না।'

ঠিক্ এমনটি যে হইবে তাহা আমরা জানিতাম। দেউলী জেল-কর্তৃপক্ষের মধ্যে যাঁহারা আধা-সাহেব তাঁহারা যে এমনি একটা সুযোগের অপেক্ষায় ছিলেন তাহা কাহারও অজানা ছিল না। হৃদয় বলিয়া যে ইঁহাদের কিছু নাই। একজন বন্দীর মৃত্যু ইঁহাদের কাছে সামান্য একটা ঘটনা মাত্র, ইহার বেশি কিছু নয়। তাঁহারা এ সুযোগ ছাড়িবেন কেন?

এদিকে আবার এই ব্যাপার লইয়া কর্তৃপক্ষের বিরুদ্ধে সংগ্রাম ঘোষণাও করা যায় না। কারণ, সে-সংগ্রামের ফল ফলিতে যতদিন সময় লাগিবে ততদিন রোগী তো আর বসিয়া থাকিতে পারে না। অগত্যা হরিপদবাবুকে আজমীর হাসপাতালে পাঠানই ঠিক হইল।

পরের দিনই সকাল বেলা ম্লান হাসি হাসিয়া হরিপদ বাবু আমাদের সকলের নিকট হইতে বিদায় লইলেন। এ হাসির অর্থ সেদিন আমরা সকলেই যে না বুঝিয়াছিলাম এমন কথা বলিতে পারি না। প্রথম কথা এপেণ্ডিসাইটিস্ *operation*

আজ অনেকটা নিরাপদ হইয়াছে বটে, কিন্তু, সে যুগে কলিকাতায় মেডিকেল কলেজে সর্ব্বশ্রেষ্ঠ সার্জ্জনের হাতেও তা নিরাপদ ছিল না, আর এ তো আজমীর হাসপাতাল! তাহা ছাড়া আত্মীয় পরিজনহীন, বন্ধুবান্ধবহীন পরিবেশে তিনি যাইতেছেন একা একটী সাংঘাতিক রোগ লইয়া, বলিতে চাহিলে কাহাকে কিছু বলিতে পারিবেন না, সংবাদ দিতে চাহিলে কাহাকেও সংবাদ দিতে পারিবেন না। বাবা-মা, হয়তো জানিতেও পারিবেন না যে, তাঁহাদেরই হরিপদ একদিন —এমনি সব চিন্তা শুধু হরিপদবাবুরই নয়, আমাদের সকলের মনকেই ব্যথাতুর করিয়া তুলিয়াছিল।

যাওয়ার ঠিক পূর্ব্ব মুহূর্ত্তটিতে হরিপদ বাবুর বিছানার পাশে আসিয়া দাঁড়াইলাম। হরিপদবাবু আমার মুখের দিকে চাহিয়া বলিলেন, 'আমি আবার আসছি।' কথাটা শুনিয়া চমকিয়া উঠিলাম। ঠিক এ কথাটার জন্য যেন প্রস্তুত ছিলাম না। বুঝিতে আর বাকি রহিল না, কোন্ কথাটি আজ হরিপদ বাবুর সমস্ত চিন্তাকে আশ্রয় করিয়াছে।

হরিপদবাবু চলিয়া গেলেন। সমস্ত জেলখানাটিকে ঘিরিয়া ফেলিল একটি বিষাদের ছায়া। কারণ, এতো কেবল কোন রোগীর চিকিৎসার্থে কিছুদিনের জন্য অন্যত্র যাওয়া নয়। এ যাওয়ায় ফিরিয়া আসা বা না আসা লইয়াই ছিল প্রশ্ন, তাই সকলের মনেই একটা দুর্ভাবনার কাল ছায়া, অনিশ্চয়তার মেঘভার। তাহা ছাড়া, এত বড় যে একটা বিপদের সম্মুখীন হইতে

হরিপদ বাবু চলিয়াছেন যে-বিপদ জীবন-মৃত্যুর সঙ্গমস্থলে, অথচ তাহার বিন্দু-বিসর্গও তখন পর্য্যন্ত জানেন না তাঁহার আত্মীয় পরিজন কেউ! সংবাদ অবশ্য জেল-কর্ত্তৃপক্ষ দিয়াছেন, কিন্তু জেল-কর্ত্তৃপক্ষের খবর দেওয়ার বহু নমুনাই আমরা জানি, তাই নিশ্চয় করিয়া জানিতাম যে, হরিপদ বাবুর খবর তখনও তাঁহার বাড়ীতে পৌঁছে নাই। এমনও দেখিয়াছি, অসুস্থ হইয়া বন্দী হাসপাতালে গিয়াছে, বন্দীর মৃত্যু ঘটিয়াছে; তাহার পরে তাঁহার বাবা-মার কাছে সংবাদ গেল বন্দী চিকিৎসার জন্য হাসপাতালে রওনা হইয়াছেন। হরিপদ বাবুর ক্ষেত্রেও যে সংবাদ প্রেরণে জেল কর্ত্তৃপক্ষের এ বৈশিষ্ট্য বজায় থাকিবে তাহা জানিতাম।

প্রায় দুই সপ্তাহ পার হইয়া গিয়াছে, হরিপদবাবুর সংবাদ ইহার মধ্যে মাত্র দুইবার আমরা পাইয়াছি, প্রথমবার হরিপদ বাবুর পৌঁছ সংবাদ। দ্বিতীয়বার হরিপদবাবুর *operation* এর সংবাদ।

নির্ব্বিঘ্নে *operation* হইয়া গিয়াছে শুনিয়া সকলেই যেন স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেলিয়া বাঁচিলাম। সকলেই এক বাক্যে স্বীকার করিলেন, হরিপদবাবুর একটা বড়রকমের ফাঁড়া কাটিয়া গেল। হরিপদবাবুর আজমীর যাত্রার পরে সমস্ত জেলটি ঘিরিয়া যে বিষাদের ছায়া ঘন হইয়া উঠিয়াছিল, তাহাও ধীরে-ধীরে সরিয়া যাইতে লাগিল। দৈনন্দিন কাজকর্ম্মে সকলেই মনোনিবেশ করিতে সুরু করিলেন—

দেউলীর জীবন যাত্রা আবার সহজ, স্বাভাবিক হইয়া আসিল।

সেদিন খেলার পরে সকলে মিলিয়া জটলা করিতেছি, হৈ-হল্লার অন্ত নাই। সন্ধ্যা হয়-হয়, এমন সময় দেখি অফিস হইতে সন্তোষদা প্রত্যাবর্ত্তন করিতেছেন। একি! এমন মূর্ত্তি তো তাঁহার কোন দিন দেখি নাই! দুঃখের একটি ঘন কালো পর্দ্দা যেন তাঁহার সারা দেহখানিকে ঘিরিয়া ফেলিয়াছে। ধীরে-ধীরে তিনি আমাদের কাছে আসিয়া দাঁড়াইলেন, চোখ দুটি তাঁর অশ্রুসজল। তাঁহাকে দেখিয়া সবাই চমকিয়া উঠিলাম! আবার কোন্ দুঃসংবাদ বহন করিয়া আনিলেন তিনি? সন্তোষদা কোন কথা বলিলেন না, কাগজের একটি টুকরা দিলেন আমাদের হাতে—খুলিয়া দেখিলাম—কি আর দেখিব! যাহা ঘটিবার তাহা ঘটিয়াছে, গত কল্য সন্ধ্যায় হরিপদবাবু আমাদের মায়া ত্যাগ করিয়া চলিয়া গিয়াছেন।

সংবাদটি সংক্ষিপ্ত, সরকার আর এই সামান্য ব্যাপারে কত বাক্য-ব্যয়ই বা করিতে পারেন! স্বদেশ-স্বজন হইতে বহুদূরে অজানা একস্থানে অজানা পরিবেশে মৃত্যু বরণ করিলেন দেশেরই এক অচেনা সন্তান। সে কথা আজ কেউ মনেও করিবে না, কেউ জানিবেও না। ইতিহাসে তাহা লেখা থাকিবে না, ইতিবৃত্তে তাহার স্থান হইবে না। কিন্তু তবু যদি কোনদিন তাঁহার কোন কৌতূহলী বন্ধু, তাঁহার কোন

স্নেহসিক্ত পরিজন আজমীর-দেউলীর সেই তীর্থদর্শনে যান তাহা হইলে, তিনি হয়তো শুনিতে পাইবেন কোন নিস্তব্ধ সন্ধ্যায় দেউলীর নিঃসঙ্গ প্রান্তরে কোন দেহ-হীন আত্মা, কোন কণ্ঠহীন বাণী কেবলই বলিয়া বলিয়া যাইতেছে—'আমি আবার আসিব, আমি আবার আসিব।'

বর্ণানুক্রমিক নাম-সূচী

জেলখানা। সে কেমন জায়গা? চার দেয়ালের খাঁচি দিয়ে ছাঁটা জেলখানার সেই এক ফালি আকাশ নিয়ে দিন-মাস-বছর কী করে কাটায় লোকরা? [illegible] সরল [illegible] হারাণ: 'জেলখানা তো কারাগার বাবু, কারাগার। সেখানে কি মানুষ থাকে?'

কিন্তু থাকে, থাকতে হয়। খুন না করে, ঘর না পুড়িয়ে, কোন টাকা না বানিয়ে তবু খামোকা কত লোককে থাকতে হয়। এই জেলে-হারাণের একটি কথাতেই সেখানকার ভয়ংকরত্ব সম্পূর্ণ ব্যক্ত হয়েছে: "জেলখানা হচ্ছে কারাগার।"

এই পৃথিবীতেই আছে, তবু সে এক স্বতন্ত্র জগৎ, বন্দীশালার পাষাণ প্রাচীরে দৃষ্টি যেখানে আহত হয়ে ফিরে আসে। এই কারাগারের নির্জন নির্মমতা আরো কতগুণ বেশী অসহ্য লাগে তাঁদের কাছে—যাঁদের বুদ্ধি আছে, হৃদয় আছে, আছে আকাশবিহারী কল্পনা।

এই রুটিন-বাঁধা দিনযাত্রাকে তবু উপভোগ্য করে তুলতে না পারলে প্রাণ শুকিয়ে যায়। [illegible] রাজবন্দীর এই [illegible] কাহিনী থেকে [illegible] অপরিমেয় [illegible] কৌতুক হাস্যের ব্যথাসিক্ত আনন্দ দিয়ে কী ভাবে তাঁরা সহনীয় করে তুলেছিলেন।

জেলজীবনের অনেক কাহিনী লেখা হয়েছে বাংলায়। কিন্তু, হাস্যরসসমুজ্জ্বল এ ধরণের অভিনব রচনা বাংলাতেও বেশী নেই।